বাজারের যুগে মিডিয়া

বাজারের যুগে মিডিয়া

সম্পাদনা

সুদীপ্ত শর্মা

জামশেদুল করিম

বাজারের যুগে মিডিয়া

সহযোগিতায়

সালাহউদ্দীন

শফিকুল আলম

রনি দত্ত

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক মামুন অর রশিদ আদর্শ ৩৮ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ মোবাইল ০১১৯১-২৩২৭৭২
গ্রন্থস্বত্ব কমিউনিয়া
নিবন্ধ-স্বত্ব লেখক
প্রচ্ছদ সমীর বাউল
অক্ষর বিন্যাস আদর্শ কম্পিউটারস
মুদ্রণ চিত্রকল্প ১৭৯/৩ ফকিরের পুল, ঢাকা ১০০০
মূল্য ২০০ টাকা

Bazarer Juge Media (A Collection of Essays)
Edited by Sudipta Sharma & Zamshedul Karim
Published by Mamun Or Rashid of Adarsha
38 Banglabazar Dhaka 1100 Bangladesh
adarshabd@gmail.com
www. adarshabd.wordpress.com
First Edition February 2011
Price Tk. 200 :: US $ 10

ISBN 978-984-8875-18-6

উৎসর্গ

ড. এ্যান্ডরু অলক কুমার দেওয়ারী স্যার-কে

সরলতা, উদারতা ও দায়িত্ববোধের
নতুন সংজ্ঞা দিয়ে যিনি
আমাদের ছেড়ে হঠাৎ করেই
চলে গেছেন

সূচি

প্রাক-বয়ান ॥ ০৯-১১ ॥
দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া
© সেলিম রেজা নিউটন ॥ ১৩-৬০ ॥
সোয়াইন ফ্লু : 'রাংতায় মোড়া যুগের অসুখ'
© কাবেরী গায়েন ॥ ৬১-৮৪ ॥
গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা : ওয়াচারদের ওয়াচ কেন জরুরি
© রোবায়েত ফেরদৌস ॥ ৮৫-৮৯ ॥
অশ্লীল সাহিত্য থেকে নীলছবি : পর্নোগ্রাফির বিবর্তন ও জেন্ডারপ্রসঙ্গ
© ফাহমিদুল হক ॥ ৯০-১০৬ ॥
বাংলা সিনেমার 'শ্লীলতা' বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক পণ্যের আর্থ-রাজনৈতিক তাৎপর্য
© আ. আল মামুন ॥ ১০৭-১১০ ॥
জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ কি খ্যাপা বিজ্ঞানী, বিন লাদেন, নাকি ভিনগ্রহের প্রাণী?
© সেলিম রেজা নিউটন ॥ ১১১-১২৩ ॥
মিডিয়া ও মানুষের অভিযোজন : প্রসঙ্গ বাংলা বণ্ডগ
© সুদীপ্ত শর্মা ॥ ১২৪-১৩৮ ॥
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক : নিও লিবারাল যুগের সম্পর্কের নেটওয়ার্ক
© বাধন অধিকারী ॥ ১৩৯-১৪৭ ॥
রবার্ট ডবিণ্ডউ ম্যাকচেজনি-র সাক্ষাৎকার
মিডিয়া পুঁজিবাদ, রাষ্ট্র এবং একবিংশ শতকের মিডিয়া গণতন্ত্রের লড়াই
ভাষান্ড়র : সুদীপ্ত শর্মা ও এনায়েতুর রহমান ॥ ১৪৮-১৬১ ॥
Free Media, Democracy and democratisation : experiences from developing countries
© Mohammad Sahid Ullah ॥ **162-173** ॥
Winners and losers when the TV-monopoly was dissolved in Sweden
© Lars- Åke Engblom ॥ **174-181** ॥
লেখক পরিচিতি ॥ ১৮১-১৮৩ ॥

প্রাক-বয়ান

মিডিয়ার প্রকৃত চরিত্র এবং এর বিভিন্ন আচরণের কার্যকারণ ও প্রভাব বিশেণ্ডষণ করতে বিশ্বজুড়ে কম আলোচনা সমালোচনা গবেষণা সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম হয়নি। সেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপ-আমেরিকায় যখন থেকে মিডিয়া গণমানুষকে পিছনে ফেলে বাজারের তকমা গায়ে লাগাতে শুর" করল তখন থেকেই চলছে এ কর্মযজ্ঞ। যা এখনো চলছে একই গতিতে; নতুন নতুন মাত্রা নিয়ে। উদ্দেশ্য, মানুষকে মিডিয়ার এসব দিক সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং এর মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানটিকে তার গণমুখী নীতিতে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু কাজের কাজ কতটুকু হয়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। খুব দূরে না গিয়ে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোর কাছ থেকেই যখন মিডিয়ার বিভিন্ন আচরণের কার্যকারণ খোঁজার বদলে কেবল প্রশংসার বাণী শুনতে হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই এত এত কর্মযজ্ঞের সফলতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। এমনকি সংবাদপত্র তার আদর্শিক জায়গা পুরোপুরি পাল্টে ফেলে 'বিজ্ঞাপনপত্রে' পরিণত হলেও যখন এ মানুষগুলো এর পেছনে সদযুক্তি খুঁজে পান তখন আমরা হতাশ না হয়ে পারি না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তাহলে কেন এত আলোচনা সমালোচনা গবেষণা? কার জন্য এত চুলচেরা বিশেণ্ডষণ? মানুষের কাছে যদি তা পৌঁছানোই না গেল তবে কী লাভ এসব করে? প্রকৃতপক্ষে, মিডিয়াকে প্রতিনিয়ত কাঁটাছেঁড়া করা হলেও মূলত যাদের জন্য এত আয়োজন সেই মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার মতো কর্মোদ্যাগ খুব বেশি হয়নি। অন্ড় ত আমাদের দেশে। যদিও মিডিয়াকে চোখে চোখে রাখার মতো এ কাজটাও জর"রি। কেননা যে মালিক একবার টাকার গন্ধ পেয়েছে স্বাভাবিকভাবেই সে নিজ থেকে কখনো তার চরিত্র পাল্টাবে না। মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরাও যে একা এ কাজে সুবিধে করতে পারবে না তা বলা যায়। তাই কেবল দর্শক-শ্রোতারাই সফলভাবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা পড়ানোর এ কাজটি করতে পারে। সমাজের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিডিয়াকে ফিরিয়ে আনতে পারে তার গণমুখী নীতিতে। কারণ যে মানুষকে নিয়ে মিডিয়া ব্যবসা করে তারা যদি একবার মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে তার চরিত্র পাল্টাতে বাধ্য।

সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মিডিয়া যুগে যুগে অন্যতম প্রধান হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করে এসেছে। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র থেকে শুর" করে মহাত্মা গান্ধী, লেনিন পর্যন্ড় দেখলে বিষয়টি ভালোভাবেই বুঝা যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করেছেন। ফলও পেয়েছেন হাতে হাতে। বর্তমান শোষণমূলক জটিল বিশ্বব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে কাক্ষিত সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রেও মিডিয়া রাখতে পারে অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু আমরা দেখছি বর্তমান বাজারি মিডিয়া এ ভূমিকা পালন থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। এ মিডিয়া পুরো সমাজের অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের কথা না ভেবে কর্পোরেট পুঁজির তাঁবেদারিই করে চলছে প্রতিনিয়ত। দেশের তেল-গ্যাস-বন্দর-বিদ্যুৎসহ যাবতীয় জাতীয় সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব না নিয়ে কর্পোরেট সংস্কৃতির বিস্ড়ার ঘটিয়ে একটি ভোগবাদী খাদক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ মিডিয়ার প্রধান লক্ষ্য। আবার এই বাজারের যুগে কম পুঁজি নিয়ে নতুন কোন মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার সম্ভাবনাও সাবজিরোতে নেমে এসেছে। তাই বিকল্প থাকে একটাই। সেটা হলো বর্তমান মিডিয়া ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এজন্যই মিডিয়াকে সবসময় চোখে চোখে রাখা জর"রি হয়ে পড়েছে। আমাদের দেখতে হবে মিডিয়া কখন কোন কাজ কেন করে। শুধুই কি সামাজিক দায়িত্ববোধ, নাকি অন্যকিছু। কোনটি সাংবাদিকতা আর কোনটা সাংবাদিকতার নামে অন্যকিছু। তবে এ সংক্রান্ড় আলোচনা শুধু গুটিকয়েক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা জর"রি। কেননা পরিবর্তন আনার প্রশ্নে মূল ভূমিকা যেহেতু সাধারণ মানুষকেই পালন করতে হবে সেহেতু মিডিয়ার চরিত্র সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন সবার আগে। মিডিয়ার কোনো আচরণকে অতি সরলীকরণ না করে তার পিছনের কার্যকারণগুলো সবাইকে জানানোর জন্য অ্যাক্টিভিস্ট, একাডেমিশিয়ান, স্বেচ্ছাসেবক ও নাগরিক সমাজকে নিয়মিত আওয়াজ তুলতে হবে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, মিডিয়া শ্রমিক তথা সাংবাদিকদেরও সমাজে তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা জর"রি। আর এসব করতে পারলে ভেতর-বাহিরে যে চাপ সৃষ্টি হবে তাতে মিডিয়া তার চরিত্র পাল্টাতে বাধ্য হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। যা হবে কাক্ষিত সমাজ বিনির্মাণের পথে সবচেয়ে বড় একটি পদক্ষেপ।

এ চিন্ড়া থেকেই প্রথম কাজ হিসেবে আমরা *কমিউনিয়ার*[১] বন্ধুরা একুশে বইমেলাকে সামনে রেখে লেখা সংগ্রহের কাজ শুর" করি। এজন্য দারস্থ হয়েছি সেসব শিক্ষক ও বন্ধুদের, যাদের লেখা পড়ে কিংবা কথা শুনে আমরা একটু

[১] সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন

একটু করে মিডিয়াকে চিনতে শিখছি। আমরা চেষ্টা করেছি তাদের সবাইকে এক মলাটের ভিতর জড়ো করতে। প্রথমে কাজটি যত সহজ মনে হয়েছিল, তা যে ততটা সহজ নয় কাজে নামার পর তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। প্রায় দেড় বছর আগে বইটির পরিকল্পনা করা হলেও তা এখন আলোর মুখ দেখছে। শেষপর্যন্ড় আমরা যে পুরোপুরি সফল সে দাবি করব না। তবে সবমিলিয়ে আমরা অনেকাংশেই সন্তুষ্ট।

গ্রন্থভুক্ত নিবন্ধগুলোতে নিবন্ধকাররা বর্তমান বাজারি মিডিয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি এর সম্ভাবনা এবং পাঠক-দর্শক-শ্রোতা ও সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিবন্ধগুলোর মধ্যে ফাহমিদুল হক-এর "অশণ্টীল সাহিত্য থেকে নীলছবি : পর্নোগ্রাফির বিবর্তন ও জেন্ডারপ্রসঙ্গ" শীর্ষক লেখাটি *মিডিয়াওয়াচ* পত্রিকায় এবং সেলিম রেজা নিউটন-এর "জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ কি খ্যাপা বিজ্ঞানী, বিন লাদেন, নাকি ভিনগ্রহের প্রাণী?" শীর্ষক লেখাটি *বিডিনিউজ*-এ (*www.bdnews24.com*) ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি লেখার অংশ বিশেষ বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হলেও নিবন্ধকাররা এই বইয়ের জন্য সেগুলোকে নতুন করে তৈরি করে দিয়েছেন।

অনেকেই এক কথাতে লেখা পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। তাঁদের লেখা দীর্ঘদিন ফেলে রাখতে বাধ্য হওয়ায় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আলাদাভাবে সুইডিশ প্রফেসর লার্স-ওকে-র কথা বলতে হয়। এই বৃদ্ধ বয়সেও যিনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে ঘুরে ভালোভাবে জিরোবার সময়টুকুও পান না, তিনিও এক কথাতে লেখা পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। সুইডিশ তথা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মিডিয়া সম্পর্কে ধারণা পেতে নিবন্ধটি পাঠকদের সাহায্য করবে। অনেকেই ব্যস্ড়তার জন্য কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ড় লেখা দিতে পারেননি। ভবিষ্যতে তাদেরকে আমরা পাশে পাব সে প্রত্যাশা থাকল।

সুদীপ্ত শর্মা
ফেব্রুয়ারি ২০১১

দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া

সেলিম রেজা নিউটন

কৈফিয়ত ও কৃতজ্ঞতা

এখানে যে-আলোচনার অনুলিপি পেশ করছি, আয়োজকদের দিক থেকে তার নির্ধারিত বিষয় ছিল : "অর্থনৈতিক ও ব্যবসা বিষয়ক সাংবাদিকতার গুরুত্ব"। এটা ছিল রাজশাহীতে কর্মরত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ-কর্মসূচির একটি অধিবেশন। আয়োজক ছিলেন: রাজশাহীর সেন্টার ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিসিডি বাংলাদেশ : http://www.ccdbd.org/)। এটি আয়োজিত হয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থ-সাহায্যে। এই আলোচনা করা হয়েছিল ২৬শে জুলাই ২০০৭ তারিখে, বাংলাদেশে 'অক্টোবর মহাসংকট' (নিউটন, ২০০৮চ) পরবর্তী মহা-জরুরি অবস্থায়—এটা মনে রাখলে অনেক কথার বিশেষ তাৎপর্য বোঝা যাবে বলে আমার ধারণা।

আমি আমার মোবাইল ফোনে (সিম্ফনি এক্স-হানড্রেড) বর্তমান আলোচনা রেকর্ড করেছিলাম। তাতে যে 'ওয়েভ সাউন্ড' ফাইলটা দাঁড়ায় সেটা মোট দুই ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৫২ সেকেন্ডের। প্রশিক্ষণ-অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ একে একে তাঁদের পরিচয় দেন এবং কে কীভাবে সাংবাদিকতায় এলেন তা সংক্ষেপে, পালাক্রমে তুলে ধরেন। ততক্ষণে ২২ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড পার হয়েছে। এরপর আয়োজকদের পক্ষ থেকে জনাব এস. এম. মহিউদ্দিন উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে ধন্যবাদসূচক কিছু কথাবার্তা বলেন, তারপর আমাকে আহবান জানান আমার আলোচনা শুরু করার জন্য। আমার আলোচনা শুরু হয় ২৩ মিনিট ০৬ সেকেন্ড থেকে। শেষ হয় ২ ঘন্টা ১৯ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে। অর্থাৎ, মোট ০১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটের মতো আলোচনা আমার। আমার আলোচনার মধ্যে মধ্যে সাংবাদিকবৃন্দ যা দু-চারটা কথা বলেছেন আমাকে প্রশ্ন করার উসিলায়, তাও এই সময়কালের অন্তর্ভূক্ত। আমার আলোচনা শেষ হওয়ার পর, ২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড থেকে শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই পর্বে সাংবাদিকরা যেসব প্রশ্ন করেন সেসবের উত্তর কোথাও-বা পাদটীকা আকারে, কোথা কোথাও আলোচনার মূল বয়ানের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

ল্যাপটপে আলোচনার অডিও শুনে শুনে প্রস্তুত করেছি পুরো আলোচনাটির হুবহু সময়াঙ্কিত-অনুলিপি। সর্বত্রই প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে ৩য় বন্ধনীর ভেতরে অডিও-ফাইলের সময়াঙ্ক দেখানো হয়েছে '[ঘণ্টা:মিনিট:সেকেন্ড]' আকারে।

অনুলিপি প্রণয়নের পর পুরো টেক্সটটাকে সামগ্রিকভাবে ঘষামাজা করেছি। ঘষামাজা বলতে প্রধানত বাহুল্য শব্দ-বাক্য-বাক্যাংশ বাদ দিয়েছি। কারণ এগুলো নেহাতই কথার বোঝা, বাক্যের মেদ। কোথাও-বা পুনরুক্তি-মাত্র। দিব্যি বাদ দেওয়া যায়। এসবের বাইরে কোথাও কোথাও সামান্য এদিক-ওদিক (আগের শব্দ পরে, পরেরটা আগে

ইত্যাদি) করেছি। কিছু কিছু জায়গায় মামুলি দুই-একটা শব্দ যোগ-বিয়োগ করতে হয়েছে সাবলীলভাবে পড়ার স্বার্থে। এ সব পরিমার্জনা চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করিনি, অক্ষরবিন্যাস পাছে চিহ্ন-কণ্টকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু, সর্বত্রই মুখের কথার বৈশিষ্ট্য যথাসাধ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। মূল বক্তৃতাকে অবিকৃতভাবে হাজির করার বিশেষ তাগিদে পারত-পক্ষে শব্দ-বাক্য-বিন্যাসে হাত দিইনি। আপনি-তুমির গুরুচণ্ডালিও মেরামত করতে যাইনি। চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের ক্ষেত্রেও না।

কথার মাঝখানে ফোন আসার কারণে বা অন্য কোনো কারণে কথার পুনরাবৃত্তির ফলে বাক্য ভাঙা-ভাঙা হয়ে পড়লে সেটাকে মেরামত করে দিয়েছি বাক্যের সামান্যতম অর্থগত কমবেশি না-করেই, না-বলা কোনো শব্দ নতুন করে যোগ না-করেই। কিন্তু এসব পরিমার্জনা কোনো সম্পাদনাচিহ্ন দিয়ে প্রদর্শন করিনি। তবে অন্যত্র যেকোনো না-বলা কথা কোথাও যোগ করতে হলে সর্বদাই তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে তা দিয়েছি। কোথাও কোথাও নিতান্ত বাহুল্য বা বিক্ষিপ্ত মনে হওয়ায় অনেক কথা বাদ দিয়েছি। সেক্ষেত্রে, ত্রিবিন্দু (...) দিয়ে বাদ দেওয়া কথাগুলো প্রতিস্থাপন করেছি। আমার এবং সাংবাদিকদের পরস্পর-বলা কথার পিঠের কথাগুলো একটু ছোট হরফে বাঁয়ের মার্জিন একটু ডানে চাপিয়ে, মানে ইন্ডেন্ট করে, দেখিয়েছি। সেখানে 'সরন' মানে বুঝতে হবে 'সেলিম রেজা নিউটন'। আলোচনায় ব্যবহৃত ইংরেজি কথাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা করে দিয়েছি। ট্রেনিংয়ের বদলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'প্রশিক্ষণ' করেছি, 'ইন জেনারেল'কে 'সাধারণ অর্থে' করেছি; 'হিউজ চেঞ্জ'কে 'বিপুল পরিবর্তন' করেছি; 'ইন্সপায়ার'কে 'অনুপ্রাণিত' করেছি; 'এসেনশিয়াল আইটেম'কে 'অত্যাবশ্যক জিনিস' করেছি, 'ইন্টারভিউ'কে 'সাক্ষাৎকার' করেছি, 'সাপণ্ডাই'কে 'সরবরাহ' করেছি, 'অথোরিটি'কে 'কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ' করেছি, 'ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড রিপোর্টিং'কে 'অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং' করেছি—এরকম আরো অনেক।

কৃতজ্ঞতা জানাই এই সুযোগে সিসিডি বাংলাদেশের প্রতি, এর কর্ণধার, আমার স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র, জনাব গোলাম মোর্তুজার প্রতি। আমার আরেক প্রিয় (প্রাক্তন) ছাত্র, এনটিভি-র সাংবাদিক, জনাব আরাফাত আলী সিদ্দীক প্রথমে একটি অনুলিপি প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে। সেটা ছিল হাতে লেখা। সেটাকে মূল অডিওর সাথে মেলাতে গিয়ে দেখি তার চেয়ে নিজে শুনে শুনে সরাসরি কম্পিউটারে লিখেই ফেলি। এই পাগলামি করতে গিয়ে আমার প্রচুর সময় ও শ্রম বৃথা গেছে। আরাফাতের পরিশ্রমের প্রতি উপযুক্ত বিবেচনাও দেখাতে পারিনি। তার চেয়ে আরাফাতের অনুলিপিটা কম্পোজ করে নিয়ে তারপর মূল অডিও শুনে শুনে সেটাকে প্রয়োজনমতো পরিমার্জনা করে নিলেই হতো। আরাফাতের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থীও বটে।

২২ জানুয়ারি ২০১১
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্রপাত

> **মহিউদ্দিনঃ** আজকে আমাদের মাঝে বিশেষজ্ঞ-আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন, আমি আগেই বলেছি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ [ও সাংবাদিকতা] বিভাগের শিক্ষক, বিশিষ্ট গণমাধ্যম-গবেষক, এবং আপনারা তাঁকে অনেকেই চেনেন, উনি দীর্ঘ দিন ধরে লেখালেখির সাথে জড়িত আছেন, সেলিম রেজা নিউটন স্যার। আমি স্যারকে আজকে তাঁর প্রশিক্ষণ-সেশন শুর করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। [০০:২৩:০৫]

বিশেষজ্ঞতার ধারণা

মহিউদ্দিন যা বললেন, সব কথা ঠিক না। প্রথম কথা হলো, আমি 'বিশেষজ্ঞ' নই। দ্বিতীয় কথা, দীর্ঘ দিন ধরে লেখালেখি করি, এটাও ঠিক না। লেখালেখি করা বলতে যেটা বোঝায়, সে রকম কোনো লেখালেখি আমার করার এ যাবৎ কালে তেমন রেকর্ড নাই। টুকটাক টুকটাক লেখালেখি করা হয়। আর, 'অনেকেই [আমাকে] চেনেন'—এটাও ঠিক না। এখানকার বেশিরভাগই আমাকে সম্ভবত চেনেন না। আমিও সবার মুখের সঙ্গে পরিচিত নই। অনেকের সাথে টুকটাক পরিচিত। অল্প-সামান্য। [০০:২৩: ৫২]

আর, এখানে আলোচনা করতে আমি খুব একটা জুত পাচ্ছি না। সকাল থেকে বৃষ্টি-বাদল, দেরিটেরি মিলে আমি তো ধরে নিলাম, এখানে তেমন কিছু আজকে হবে-টবে না। আমার বেশ সন্দেহই দেখা দিয়েছিল মনের মধ্যে, এখানে আদৌ কোনো আলোচনা আজকে হবে কিনা। এ সমস্ড় মিলে আমি যে রকম মানসিক অবস্থায় আজকে আছি, আমার দিক থেকে খুব কথা বলার আকাঙ্ক্ষা নাই। এ রকম একটা দাঁড়াচ্ছে অবস্থা। আমি আসলে নিশ্চিত না, যে আলোচনাটা আজকে এখানে করার কথা সেটাতে আসলেই সিসিডি [সেন্টার ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট] বা আমরা কতটুকু আগ্রহী। [০০:২৪:৪৪]

সাংবাদিকতার শিক্ষকতা করছি অনেক দিন ধরেই। প্রায় বারো-তেরো বছর ধরে। কিন্তু, বিশেষজ্ঞতার কোনো ব্যাপার নাই এখানে। এ জন্য যে, বিশেষজ্ঞতার ধারণাটাই একটা আপত্তিকর ধারণা।[১] এই জন্য আপত্তিকর যে,

[১] হাতেকলমের শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে কেউ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতেই পারেন। তাতে করে মুচি, সুইপার, দর্জি, ছুতার, কামার, কুমার, তাঁতি, গৃহপরিচারিকা ইত্যাদি ধরনের মানুষজনের মধ্যে অনেককেই অত্যন্ড় ন্যায্যভাবে 'বিশেষজ্ঞ' নামের মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু সেটা করি না আমরা। 'বিশেষজ্ঞ' বলতে আমরা বই-খাতা-কাগজ-কলম-অক্ষর-প্রবন্ধ-অভিন্দর্ভের জগতের মানুষদের কথাই বুঝে থাকি। এই জগতের অনেককেও ন্যায্যত, তাঁদের বিশেষ কারিগরি জ্ঞানের কারণে, 'বিশেষজ্ঞ' বিবেচনা করার কারণ থাকতে পারে। সুপ্রাচীন সংস্কৃত বা ল্যাটিন বা গ্রিক ভাষার পিতগণ এরকম বিশেষজ্ঞের দৃষ্টান্ড় হতে পারেন। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা অথবা গণিতের ক্ষেত্রেও এরকম 'বিশেষজ্ঞ' আছেন। কিন্তু, পরিবার সমাজ

সারা দুনিয়ার লোক (বা সারা দেশের লোক) বিশেষভাবে কেউ কিছু জানেন না, আর অল্প কিছু লোক হচ্ছেন 'এক্সপার্ট' বা 'বিশেষজ্ঞ'—এই ধারণাটাই আমাদেরকে অনেক মুশকিলে ফেলে দেয়। নানান দিক থেকে মুশকিলে ফেলে দেয়। তখন বাকিদের কিছু করণীয় থাকে না। বাকিদের কোনো কর্তব্য থাকে না। বাকিদের কাজ হয় অনুসরণ করা। শোনা। তাই না? এবং তাঁরা ধরেই নেন, তাঁদের কিছু করার নাই। তাঁদের কিছু বলার নাই। 'বিশেষজ্ঞ'রা যা বলবেন, তাঁরা সেটা শুনবেন এবং সেই অনুসারে তাঁরা চলবেন। [০০:২৫:৪৮]

এটা হচ্ছে সেই ধারণা, যে ধারণা অল্প কিছু বিশেষজ্ঞের হাতে আমাদেরকে, গোটা সমাজকে, সঁপে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করে। তখন আপনি দেখবেন, রাজনীতিতে বেশ কিছু 'বিশেষজ্ঞ' আছেন। অর্থনীতি বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ' আছেন। সাংবাদিকতা বিষযে 'বিশেষজ্ঞ' আছেন। সব বিষয়েরই 'বিশেষজ্ঞ' আছেন। ওনারাই টেলিভিশনে কথা বলবেন। ওনারাই পত্রিকায় লেখালেখি করবেন। ওনারাই দেশের বাজেট বানাবেন। দেশ চালাবেন। সংবিধান বানাবেন। [শাসন করবেন।] [০০:২৬:৩৩]

বারো-তেরো কোটি লোক। তাঁদের কোনো কর্তব্য থাকবে না। নিজের নিজের কাজটুকু করে যাওয়া ছাড়া। আর, একশ বিশ-তিরিশ জন লোক, খুব বেশি করে ধরলেও বারো-তেরো শো-র বেশি হবে না সারা দেশে, এঁরা হবেন 'বিশেষজ্ঞ'। এটা স্পষ্ট রকমের অগণতান্ত্রিক মনোভঙ্গি। যদিও এটা সারা পৃথিবীতেই খুব পরিচিত, চালু একটা মনোভঙ্গি। চালু এবং পরিচিত 'বিশেষজ্ঞ'দের দ্বারা অবশ্যই। 'বিশেষজ্ঞ'রাই এটা চালু করেছেন। [০০:২৬:৫১]

'বিশেষজ্ঞ'দের প্রতিষ্ঠানও আছে। যেমন ধরেন, সাংবাদিকতা বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ-প্রতিষ্ঠান' হলো সিএনএন। বিবিসি। তাঁরা যেটা করেন, সেটা হলো 'সাংবাদিকতা'। *সোনালী সংবাদ* (বা আমাদের যেকোনো পত্রিকা) তাঁদের মতো ক'রে কাজ না-ক'রে যদি অন্য কোনো কিছু করেন, তাহলে সেটা সাংবাদিকতা না। কেননা সেটা 'বিশেষজ্ঞ'দের স্বীকৃত রীতি-অনুশীলনের মধ্যে পড়ে না। তবে, কথা হলো যে, *সোনালী সংবাদ* বা অন্যরা *রীতি* লঙ্ঘন করেন না। এ রকম নমুনা আমার দেখা নাই। জানা নাই। আমরা, আমাদের পত্রপত্রিকা 'বিশেষজ্ঞ'দের কথাবার্তা মেনেই চলি। [০০:২৭:৪৫]

সংস্কৃতি রাজনীতি শ্রেণী মিডিয়া রাষ্ট্র ধর্ম নীতিনৈতিকতা মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্র মূলত সাধারণ জ্ঞানের, বা আক্কেল জ্ঞানের, তথা কা জ্ঞানের জায়গা।

মুখস্ড় আলোচনা

শুধু মহিউদ্দিনের কথার সূত্র ধরেই কথাগুলো বলছি, তা না। ওঁর কথার সূত্র ধরে সুবিধা হলো কথাগুলো তুলতে। কোনো এক দিক থেকে তুলতে হয় তো! ধরেন, কিছু আলোচনা থাকে আমাদের মুখস্ড় আলোচনা। মানে, আমরা জানি আমরা কী বলব। আর, যাঁরা শোনেন তাঁরাও জানেন ঐ দিক থেকে কী আসছে। ঠিক না? এই মুখস্ড় আলোচনাই আমাদের চলে। ধরেন আপনি টক শো যদি খোলেন—আপনি জানেন ওখানে কী আলাপ হবে। তা-ও আপনি দেখতে চাইবেন কে কীভাবে বলল—এর মধ্যে একটু চাঞ্চল্যকর বা একটু চাটনি-সালাদ টাইপের কোনো জিনিস আসলো কিনা। সামান্য কোনো ব্যতিক্রম ঘটল কিনা—এই আশাতে থাকা, আর পারফরমেন্স দেখা। কে কী-রকমভাবে কথা বলেন। কে কীভাবে হাজির করেন। ঝগড়াঝাঁটি হয় কিনা। কেউ কোনো কড়া কথা বলল কিনা। এইগুলোই আমাদের আগ্রহ যতটুকু যা জাগায়। আমরা তো জানিই, পত্রিকার কলামে কী লেখা হবে। কে কী লিখবেন। বেশ ভালোই জানি। [০০:২৮:৫২]

অর্থনীতির গুর"ত্ব কি আমরা বুঝি না?

তো, এখানে আজকে আমরা এক সাথে হলাম অর্থনৈতিক এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিকতার গুর"ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করার জন্য। একই সঙ্গে, এই ধরনের সাংবাদিকতার ইস্যুগুলো কী, এর আওতার মধ্যে কী পড়ে। এই তো? তো এখন আমার জন্য কিন্তু ধাঁধা এইটা যে: অর্থনীতির গুর"ত্ব কি আমরা বুঝি না? মানে যাঁরা আমরা এখানে হাজির আছি? দেশের জন্য বা আমার জন্য অর্থনীতি কেন জর"রি, অর্থনীতির বিষয়আশয় গুর"ত্বপূর্ণ কেন, এগুলো কি আমরা জানি না? নিশ্চয়ই জানি। এটা না-জানার কোনো সুযোগ আমার মনে হয় না আছে। আমরা যাঁরা এখানে হাজির আছি, আমরা সবাই নিজের নিজের মতো করে বুঝি, অর্থনীতি কেন গুর"ত্বপূর্ণ। সবাই বোঝেন। অর্থনীতি গুর"ত্বপূর্ণ না—এটা যদি কেউ বোঝাতে চান, তাহলে বরঞ্চ শোনার অবকাশ ঘটে। [০০:২৯:৫৭]

এখানে আমি এবং আপনারা যে হাজির আছেন আজকে, এর পেছনে আমাদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত আছে। ঠিক না? এই যে আমাদের একজন রিপোর্টার বললেন,[২] রিপোর্টিং করতে করতে আবার তাঁকে বিজ্ঞাপনের কাজও করতে হতো। নিশ্চয়ই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না যে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজ

[২] বর্তমান আলোচকের কথা শুর"র আগে প্রশিক্ষণশালায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ পালাক্রমে নিজেদের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন— সে কথা এখানে বলা হচ্ছে।

তাঁকে করতে হবে। অর্থনৈতিক প্রয়োজন থেকেই এ ধরনের জায়গাটায় আসা, তাই না? [এখানে উপস্থিত] আমাদের সবারই এ রকম ব্যক্তিগত কর্ম-যোগাযোগগুলো হচ্ছে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক। একেবারে আদিতে হয়ত শখ-টখ থাকতে পারে। যেটাকে আমরা বলি 'বাস্ড়ব বুদ্ধি', মানে সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যবহার বুদ্ধি, সেটা সম্পর্কে আমাদের অল্প বয়স পর্যন্ড় তেমন সচেতনতা না-থাকার কারণে হয়ত আমরা শখ বা অন্য কোনো আগ্রহের কথা ভাবতে পারি, বলতে পারি। কিন্তু অচিরেই আমরা আবিষ্কার করি যে, এটা একটা অর্থনৈতিক ঘটনা—সাংবাদিকতা করা, করতে চাওয়া। [০০:৩১:০০]

প্রশিক্ষণের ধাঁধা

তো, এখন আমাকে আপনারা কি কেউ বলবেন যে, অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের গুর"ত্ব বোঝেন না? এ রকম কেউ কি বলবেন? নিশ্চয়ই না? নাকি? [০০:৩১:১১]

তাহলে আলাপটা কী নিয়ে? একটা হলো যে, হ্যাঁ, অর্থনৈতিক রিপোর্ট কেমন করতে হয়, সেটা নিয়ে যদি কোনো কারিগরি কথা হয়, হতে পারে। কিন্তু, সেটা তো এই সেশনের[৩] কথা না, অন্য সেশনের কথা। রিপোর্টিং আপনারা যাঁরা করেন, তাঁরা ভালোই জানেন যে, রিপোর্টিংয়ে কারিগরি দিক বলতে তেমন কিছু নাই। একটাই কারিগরি দিক আছে—যাবতীয় রিপোর্টিংয়ের কথা বলছি—সেটা হলো, অল্প কথায় লিখতে হয়। তাই না? এ ছাড়া কারিগরি দিক আর কি রিপোটিঙের? আপনাদের কী মনে হয়? অন্য কোনো কারিগরি দিক আপনারা জানেন কি যে, অমুক বিশেষ কারিগরি ট্রেনিং ছাড়া রিপোর্টিং করা যাবে না? আজকে আপনাদের কথা শুনেও আমার সে রকম কিছু মনে হলো না কিন্তু। রিপোর্ট ছাপানোর ব্যাপারটাতে যেয়ে আপনাদের প্রথম [দিকের] অভিজ্ঞতাগুলো (অনেকেরই) থেকে দেখা গেল, সেখানে কিন্তু বিশেষ কোনো কারিগরি ট্রেনিংয়ের দরকার পড়েনি। [০০:৩২:১১]

তাহলে ট্রেনিং কী নিয়ে? সাংবাদিকতা বিভাগ কী নিয়ে? এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক স্ড়রের ধাঁধা। আমার জন্য। আপনাদের জন্য কী, তা আমি জানি না। এখন ধরেন যে, এ সমস্ড় কথা তোলার এখতিয়ার আমার আছে কিনা সাংবাদিকতার শিক্ষক হিসেবে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। কারণ, সাংবাদিকতার শিক্ষক হিসেবে তো আমার শুর"ই করা উচিত এই আলাপ দিয়ে যে, "এখানে অনেক কিছু[৪] শেখার আছে। আমরা 'বিশেষজ্ঞ-শিক্ষক'। আমরা শিখিয়ে থাকি। এবং আমরা

[৩] অর্থাৎ, এই অধিবেশনের কথা নয়।

[৪] অর্থাৎ, অনেক রকম কারিগরি ব্যাপারস্যাপার শেখার আছে।

ছাড়া বাকিরা সাংবাদিকতা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না।" তারপর সেই 'ধ্রুপদী' বিতর্ক: সাংবাদিকরা বেশি সাংবাদিকতা জানেন? নাকি সাংবাদিকতার বিদ্যাধর পণ্ডিতেরা[৫] সাংবাদিকতা বেশি জানেন? (আমি এ পর্যন্ত যা বললাম, আপনারা আপত্তি থাকলে একটু বলবেন কিন্তু। তা ছাড়া আমি ধরে নেব, আমি যা বলছি সেগুলো সব গ্রহণযোগ্য কথা।) [০০:৩৩:৩৬]

বিশেষজ্ঞতার মুশকিল

তার মানে দেখেন, আমি কিন্তু বিশেষজ্ঞতার ধারণাটাকেই খারিজ করছি। শুধু আমাদের বেলায়ই না, পুরো বিশ্বপরিসরে। আপনি যখনই এগারো জন বিশেষজ্ঞের হাতে বাংলাদেশ শাসন করার ক্ষমতা দেবেন, পরিচালনা করার ক্ষমতা দেবেন তখনই মুশকিল হবে। ধরেন আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলী[৬]। এগারো জন। এখন তাঁরা যত মহান ব্যক্তিই হোন, বা তাঁরা যত দক্ষ লোকই হোন, এগারো জন যখন দেশ চালানোর জন্য 'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে বিবেচিত হবেন, এগারো কোটি লোকের কাজটা কী থাকে তখন? এটা কিন্তু সহজে বোধগম্য না। কিংবা আপনি যখন এমপি-কে দেশ চালানোর দায়িত্ব দেবেন, তখন বাকি বারো কোটি লোকের কাজটা কী? তাই না? [০০:৩৫:২২]

এঁদের কাজ হলো ভেঁড়ার পালের মতো অনুসরণ করা। এখন এত লোকের পক্ষে (আপনি আন্ড্ররিকভাবেও যদি চান) তো ভেঁড়ার পাল হওয়া আসলে খুব কঠিন একটা ব্যাপার। তবু সেটাকে যদি সম্ভব করে তোলা হয়, তাহলে দেশের অবস্থা যা হওয়ার কথা, আমাদের দেশের অবস্থা ঐরকমই। এবং বাকি দেশগুলোরও পৃথিবীতে অবস্থা কমবেশি এরকমই। কারণ বিশেষজ্ঞতা আছে সারা দুনিয়া জুড়ে। [০০:৩৫:৪৫]

[৫] আমাদের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এঁদেরকে আমরা 'অ্যাকাডেমিশিয়ান' বলে থাকি। অ্যাকাডেমিতে যাঁরা *সেয়ানা* হয়ে ওঠেন তাঁদেরকে অবশ্য আপনি *অ্যাকাডেমি-সেয়ান*ও বলতে পারেন। এমনকি চাইলে কেউ *অ্যাকাডেমি-শিয়াল* নামেও ডাকতে পারেন—কেননা আমাদের কাগজ-পত্রের (মানে, কাগজের এবং পাতার) চেনাশোনা ঝোপজঙ্গলে শিয়ালের চেয়ে সেয়ানা আর কে?

[৬] মহা-জরুরি অবস্থা জারি করার মাধ্যমে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখে বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহন-করা তিন-উদ্দিন-এর সুশীল সামরিক জরুরি জমানার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের কথা বলা হচ্ছে (এ সম্পর্কে আমার পর্যালোচনার জন্য দেখুন: নিউটন, ২০০৮ক; এবং নিউটন, ২০০৯খ)। সেই সময়কার পরিস্থিতি "অক্টোবর-মহাসংকট, হাসিনা-খালেদা ইত্যাদি-প্রভৃতি পার হয়ে নোবেল-বিজয়ী সুদখোর-মহাজন-ব্যবসায়ীদের 'অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ'-এ ফখরুদ্দিন-মইনউদ্দিন-ইয়াজউদ্দিনদের ১১ জানুয়ারির ঝড় বইয়ে" দিয়েছিল (নিউটন, ২০০৮চ)।

আমার জীবন যদি আমি নিজে পরিচালনা করতে না পারি, এবং আমার পক্ষ থেকে যদি কোনো 'বিশেষজ্ঞ' এই শর্তে দায়িত্ব নেন যে, আমার জীবনটা উনি পরিচালনা করে দেবেন, আমার কাজ শুধু উনার কথা শুনে চলা, তাহলে আমার জীবন ঝরঝরা হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ নাই। ঠিক না? আপনি সহজেই দেখতে পাবেন, পাঁচ-ছয় বছরের একটা ছোট বাচ্চার জীবনও কেমন করে পরিচালনা করা উচিত, সেই দায়িত্ব যদি আমি নিয়ে নিই ওর মা হিসেবে, বাবা হিসেবে, তাহলেই কিন্তু ওর জীবন মোটামুটি দফা-রফা হয়ে যাবে। শিশুটি হাড়ে হাড়ে টের পাবেন, কত ধানে কত চাল। ভালো লাগবে না তাঁর। [০০:৩৬:২৪]

স্বাধীনতার স্বাভাবিক স্পৃহা

এটা হচ্ছে স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি যে, আমরা নিজেদের জীবন নিজেরা পরিচালনা করতে চাই। এটা আমাদের জন্মসূত্রে আকাঙ্ক্ষা ছিল। আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের এখনও আছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটাকে আমরা এরই মধ্যে কীভাবে কীভাবে যেন হারিয়ে ফেলেছি, বা এটার কথা আর মনে নাই। ধরেন, সাংবাদিকতা করতে আসার পরে আপনার নিশ্চয়ই আর খুব বেশি খেয়াল নাই যে, আসলে আপনি 'কিছু একটা' করতে এসেছিলেন হয়ত। হয়ত আপনার নিজের কিছু করার ছিল। নিজের অনুভূতি ছিল। কিছু কর্তব্য হয়ত বোধ করেছিলেন। একেবারে আদিতে। যদি করেও থাকেন, এখন আর তা নিয়ে কিছু করার নাই। এখন যা আছে তার নাম অভ্যাস—আমার পত্রিকা এ রকম, আমার পত্রিকার চাওয়া এ রকম, এটা-এটা এভাবে-এভাবে করতে হয়—সেটা যিনি আমার বস্ আছেন, তাঁর বুঝ অনুসারে। তাঁকে আমি যে-নামেই ডাকি না কেন, বস্ তো বস্-ই। বস্-কে কোথাও 'স্যার' বলে ডাকতে হয়, পা ঠুকে স্যালুট করতে হয়। আবার, কোথাও বস্দেরকে 'ভাই' বলে ডাকাও চলে। এক সাথে আড্ডা মারাও চলে। কিন্তু, তিনি যে বস্, চাকরি করা অবস্থায় সেটা কিন্তু ভালোমতোই টের পাওয়া যায়। [০০:৩৭:৩৪]

তার মানে, আমাদের স্বাধীনতার ঐ স্পৃহা, বা আপনি যে নামেই ডাকেন, সৃজনশীলতার ঐ স্পৃহা, কিংবা নিজের জীবন নিজেই পরিচালনা করার যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, এগুলো কীভাবে কীভাবে যেন হারিয়ে গেল। নষ্ট হয়ে গেল। দূরে সরে গেল। এবার আমি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার' হই। আপনি 'সাংবাদিক' হন। আরেক জন 'ডাক্তার' হোন। আমরা এবার গরুর গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি। এটা চলতে থাকবে। মনে হয় যেন প্রাকৃতিক নিয়মে এটা চলতে থাকবে। কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে না। [০০:৩৮:০৯]

গরুর আনুগত্যের ইতিহাস

কীভাবে সম্ভব হলো এটা? আপনাদের কী ধারণা? এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারল? এটা কিন্তু খুব ক-ঠি-ন কাজ। একটা মানুষ। তাঁর নিজের মতো করে তিনি আর চলবেন না। তিনি শুধু তাঁর 'পারিপার্শ্বিকতার আইন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন। 'পারিপার্শ্বিকতা' ভদ্র ভাষায় বললাম। অভদ্র ভাষায় যদি বলি, তাহলে বলতে হয়, তিনি কতকগুলো অথরিটি কর্তৃত্ব কর্তৃপক্ষ বস্ গুরু মহাজন বিশেষজ্ঞ নেতা হুজুর পুরুত ঠাকুরের দ্বারা অনাদিকাল থেকে জারিকৃত আইনকানুনের অধীনে থেকে পরিচালিত হন। আমাদের কাজ পরিচালিত হওয়া, আর 'বিশেষজ্ঞ'দের কাজ পরিচালনা করা—এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা হাজির হয়ে গেলাম কীভাবে? [০০:৩৮:৫১]

আমি বিষয়টা খেয়াল করেছি। খেয়াল করার চেষ্টা করেছি। ঠিক কিনা জানি না। সেটা হলো, আমি গরু দেখলাম। গরু। যাঁরা একটু বোকাসোকা ধরনের বা খুব বেশি অনুগত টাইপের, তাঁদেরকে আমরা 'গরু' বলি। তাই না? 'গরু' বলে গালি দিই—বন্ধুর মতো করে দুষ্টুমি করেও বলতে পারি, আবার শত্রুর মতো খোঁচা মেরেও বলতে পারি। তো, গরু কী? গরু হচ্ছে সেই প্রাণী, যে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। হাল ছেড়ে দিয়েছে। ও বুঝে গেছে ওর জীবনে আর কত দূর কী করার আছে, না-আছে। মানে সে আর এটা নিয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য করবে না। এটা তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।[৭] [০০:৩৯:৪০]

এ রকম একটা প্রাণীর ক্ষেত্রেও আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এই প্রাণীর বাচ্চাটা (মায়ের পেট থেকে যে বাছুরটা হয়) মোটামুটি বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তার পিতামাতার মতো ঐ রকম সিদ্ধান্তগ্রহণ করে না। সব কিছু সে মেনে নেবে, তার কিছু করার নাই—এ রকম সিদ্ধান্তে সে পৌঁছায় না। সে তিড়িংবিড়িং করতে থাকে এবং অসম্ভব একটা অস্থির প্রাণী হিসেবে তাকে দেখতে পাই আমরা। তার দৌড়াদৌড়ি দেখার মতো। হাঁটে না বললেই চলে। দিকবিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে সে। বোঝা যায়, সে খুব বেশি নিয়মকানুন দ্বারা অভ্যস্ত হয়নি। [০০:৪০:১৪]

৭ পরাভূত গরুর আসলে বোঝা হয়ে যায়, দাসত্ব ছাড়া পথ নাই। আর এই বোঝা বা জ্ঞানই তার সারা বাকি জীবন ধরে টেনে নিয়ে বেড়ানোর 'বোঝা' হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের বেলায়ও এরকম হয়। আমাদেরকে শেখানো জ্ঞান যখন আমাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে বসে, তখন আমরা দাসত্ব করতে থাকি।

তার মানে, যে প্রাণীটা (যে প্রজাতিটা) পূর্ণ বয়েসে সম্পূর্ণ বশীভূত, অনুগত, হাল ছেড়ে দেওয়া একটা প্রাণী, তারও সন্তানাদি জন্মসূত্রে স্বাধীন। তাকে[৮] বশ মানাতেও দেখবেন সময় লাগে। অনেক সময় লাগে। অনেক লাঠিপেটা করতে হয়। অনেক চাবুক মারতে হয়। দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয়। অনেক কিছু করতে হয়। তার পরে সে বড় হতে হতে টের পায় যে, ঘটনা তার আয়ত্তের বাইরে। এই তো! খুব কম সময় লাগে না। সামান্য গরুর বেলাতেই। গরুর আনুগত্যের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের[৯]—চরম আনুগত্যের ইতিহাস। তার পরও, এখনও, গরুর প্রতিটা বাচ্চাকে নতুন করে বশ মানানোর প্রজেক্ট হাতে নিতে হয়। [০০:৪১:০৪]

প্রশিক্ষণ ও আনুগত্য

এর নাম হচ্ছে 'প্রশিক্ষণ'—সাধারণত। ট্রেনিংয়ের একটা গোড়ার জায়গা হচ্ছে এইটা যে, আপনাকে প্রশিক্ষকের মর্জি-মোতাবেক কিছু জিনিস বুঝতে হবে। মেনে নিতে হবে। এখন, প্রশিক্ষণ যাঁরা দেবেন, তাঁরা [তো আর] 'খারাপ' কোনো ট্রেনিং দেবেন না! আমরা যে বাছুরটাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করি, বশ মানাই যে, সেটা তো মঙ্গলের জন্য! আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাই না? মানুষের মঙ্গলের জন্য। নিশ্চয়ই এতে গরু-সমাজেরও মঙ্গল নিহিত। এটাই আমাদের ধারণা। এটা যদি আমরা ধরে না-নিতাম। যদি ভাবতাম এতে ওদের মঙ্গল নাই, বা আমাদের মঙ্গল নাই, তাহলে এই প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকত না। [০০:৪১:৪২]

তো, প্রশিক্ষণ লাগে—এই যে আস্তে আস্তে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলাম অনেক কিছুতে, এর জন্য প্রশিক্ষণ লাগে। কত স্বপ্ন-কল্পনা-আশা ইত্যাদিকে অবাস্তব বলে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু অর্থনৈতিক চাপ—সেটাই থেকে গেল বাকি। প্রধান জিনিস হয়ে উঠল সেটাই। এটাই আমাদেরকে নিজের নিজের পেশায় ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা বাপ বাপ করে হাঁটছি, দৌড়াচ্ছি, বসছি। সব কিছুই কমবেশি করতে বাধ্য হচ্ছি। যাঁরা পারছি না, যাঁরা করছি না, তাঁরা 'পিছিয়ে' পড়ছি। তাঁরা আমরা ভুগছি। এবং তাঁরা 'অযোগ্য' বলে বিবেচিত হচ্ছি। ঠিক না? [০০:৪২:১৬]

আচ্ছা। এখন ধরেন, প্রশিক্ষণের কোনো ভালো দিক আছে কিনা সেটা নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে। সব প্রশিক্ষণই কি আর এ রকম খারাপ! প্রশিক্ষণ ছাড়া আমাদের কেমন করে চলবে? প্রশিক্ষণ ছাড়া কেমন করে চলবে সে আলাপটা

৮ অর্থাৎ, শিশু-সন্তানকে।

৯ মাইক্রোসফট এনকার্টা এনসাইক্লোপেডিয়ার তথ্য মোতাবেক, বনের গরুকে বন্দী করে 'গৃহপালন' করা শুরু হয় অন্তত সাড়ে আট হাজার বছর আগে (এনকার্টা, ২০০৪)

অত বড় করে তোলার সুযোগ মনে হয় এখানে নাই। তবু, আমি নিশ্চিত না, যদি আপনারা নেহায়েতই তোলেন সে রকম প্রশ্ন, তখন না-হয় দুই-একটা কথা আমরা বলতেই পারব, বিনিময় করতে পারব। অবশ্য 'বিশেষজ্ঞ-মতামত' দিতে পারব না। আমি যেহেতু 'বিশেষজ্ঞ' না। [০০:৪২:৪৪]

বিশেষজ্ঞ-পরম্পরা

আমি যেহেতু 'বিশেষজ্ঞ' নই, 'বিশেষজ্ঞ'রা কী রকম 'বিশেষজ্ঞ' সেটা আমি ভালো করে বুঝিও না। কারণ, 'বিশেষজ্ঞ' না-হলে আপনি 'বিশেষজ্ঞ' চিনবেনও না। ঠিক না? আপনি নিজে যদি 'বিশেষজ্ঞ' না-হন, তাহলে আরেক জন যে 'বিশেষজ্ঞ' সেটা কেমন করে বুঝবেন? ধরেন, সক্রেটিস খুউব বড় জ্ঞানী লোক। আমি সেটা কীভাবে বুঝলাম? আমি তো সক্রেটিসের মানের জ্ঞানী লোক না! (এটা তো বলাই আছে!) আর, আমি যদি তাঁর মাপের জ্ঞানী লোক হই, তাহলে তো আমিও সক্রেটিস! তখন সক্রেটিস যে একটা 'আলাদা' জিনিস, সেটা তো থাকে না আর! অথচ আমাকে যদি বুঝতে হয় যে, সক্রেটিস সত্যি বিশেষ রকমের জ্ঞানী এই পৃথিবীতে, তাহলে তো আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জ্ঞানের সাথে বোঝাপড়া সারতে হবে। তার মানে আমাকেও সক্রেটিস-ধরনের মানুষ হতে হবে। তবু, আমরা সবাই জানি সারা দুনিয়ার লোক যে, সক্রেটিস পেণ্ঢটো এঁরা হচ্ছেন জ্ঞানী। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, জেনারেল মতিন এঁরা হচ্ছেন জ্ঞানী।[১০] [০০:৪৩:৩৪]

কেমন করে বুঝলাম? তার মানে, কোনো-না-কোনো-ভাবে আমরা ধরে নিয়েছি ঘটনা এ রকমই যে, পৃথিবীতে কিছু লোক আছেন, আলাদা জাতের, তাঁরা 'জ্ঞানী', তাঁরা 'বিশেষজ্ঞ'। কারা তাঁরা? তাঁদের কথা আমরা শুনে আসছি—ছোটবেলা থেকে, নানানভাবে। ফটো দেখে আসছি। তাঁদের গান শুনে আসছি। তাঁদের লেখা পড়ে আসছি। তাঁদের নাম শুনে আসছি। এঁরাই সারা দুনিয়াতে কমবেশি 'জ্ঞানী'। এঁদের কথা খুব বেশি করে বলা হয়। বিবিসি-সিএনএন ইত্যাদিতে খুব বেশি করে শোনা যায় এঁদের নাম। [০০:৪৪:০৩]

আর, বিবিসি-ই যেহেতু 'সাংবাদিকতা', 'সাংবাদিকতা' মানেই যেহেতু সিএনএন, সুতরাং, এখন আমার কাজ হচ্ছে প্রথমেই ভয় পেয়ে যাওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া: "আমি তো ভাই বিবিসি তেমন দেখি নি! বিবিসি তো আমি চিনি না! ঐসব দেশে জন্মগ্রহণ করি নাই! ফলে, 'সাংবাদিকতা' তো আমি জানি না!"[১১] [০০:৪৪:২০]

[১০] এক-এগারো আমলের সবচেয়ে আগ্রাসী, রূঢ়, বেসামাল এবং এমনকি শাসক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর এলিট-বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক সবচাইতে বেশি সমালোচিত দুই তত্ত্বাবধায়ক-উপদেষ্টা, এক সময় যাঁদেরকে উপদেষ্টা-পরিষদ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়।

[১১] এভাবে, শাসক-মহাজনদের বিশেষজ্ঞ-প্রণালীতে আমাদের 'জানা' আর 'না-জানা' নির্ধারিত

এ রকম করে আরো এগুনো যায় চাইলে। কারা জানেন 'সাংবাদিকতা' তাহলে? সাংবাদিকতা বিভাগ জানেন। আমাদের সাংবাদিকতা বিভাগের যাঁরা শিক্ষক, তাঁরা [আবার] জানেন যে, আরো ভালো 'সাংবাদিকতা' কারা জানেন। আরো ভালো 'সাংবাদিকতা' জানেন মার্কিন মুলুকের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, অথবা বৃটিশরা, বা ইউরোপীয়রা। যতক্ষণ ওঁরা এখানে না-আসেন, ততক্ষণ আমরাই সবচে ভালো জানি। ওনারা চলে আসলে আমরা আবার চুপসে যাই, [মিনমিন করি]: "আমরা তো জানি না তেমন!" এই তো পরম্পরা। এই হচ্ছে, সাধারণ অর্থে প্রশিক্ষণ! [০০:৪৪:৪৮]

দুই রকমের শেখা, স্কুল এবং দুষ্টুমি

[ব্যক্তি-মানুষের নিজের স্বাভাবিক তাড়না থেকে শেখা, আর অভিভাবক বিদ্যালয় কর্তৃত্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জোর করে শেখানো, অথবা পরিস্থিতি ও জীবিকার কারণে শিখতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।]

এখন ধরেন, আমি নিজে থেকে কোনো জিনিস জানতে চাই। পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমাদের কৌতূহল আছে। কী হচ্ছে আশেপাশে? পৃথিবীটা কী রকম? আমি কে? আমি কী রকম? আশেপাশের ঘটনাগুলো কী, কেন, কী রকম, কীভাবে চলে? এরকম কেন? অন্যরকম না কেন? এগুলো তো স্বাভাবিক কৌতূহল মানুষের। এখন ধরেন যেকোনো কারণেই হোক, এ রকম কোনো কৌতূহল থেকেই হোক, অথবা বিশেষ কোনো আগ্রহ থেকেই হোক, আমরা ঠিক করি যে, অমুক জিনিসটা শিখতে চাই। কথার কথা—আমি গান শিখতে চাই, আমি ছবি আঁকা শিখতে চাই, আমি সাইকেল চালানো শিখতে চাই, বা সাঁতার শিখতে চাই। বা, আমি যেমন হাঁটা শিখতে চেয়েছি. তাই না? কেউ আমাকে কিন্তু জোর করে ট্রেনিং দেয়নি যে, তোমাকে হাঁটা শিখতেই হবে। আমি নিজে একদম, মানে, চরম উদ্যমের সঙ্গে হাঁটা শিখেছি। শিখতেই হবে। না-শিখলে হবেই না। পড়ে যাচ্ছি। ব্যথা পাচ্ছি। কন্টিনিউয়াসলি। প্রতিদিন। কত বার। ভালো ব্যথাও পাচ্ছি। তবু আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করছি। এইটা হচ্ছে অন্য ট্রেনিং। এইটা আমার জন্য আমার ট্রেনিং। আমি জানতে চাই। আমি শিখতে চাই। আমার দরকার। যেকোনো কারণেই হোক। আমি টের পেয়েছি যে, আমাকে এটা জানতে হবে, আমাকে এটা বুঝতে হবে, আমাকে এটা শিখতে হবে। [০০:৪৬:১৩]

এই রকম, নিজের তাগিদ থেকে, সে তাগিদের কারণ যা-ই ঘটুক, আমরা কোনো জিনিস শিখতে গেলাম কোথাও [সেটা এক ধরনের শেখা]। কিন্তু, এই

হতে থাকে জীবনের ঘাটে ঘাটে।

জন্যেই কি আমরা স্কুলে গেছিলাম? না। অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা এই জন্য ভর্তি হয়েছিলাম? না। আজকে কি আমরা এখানে [ও রকম কোনো তাড়না থেকে এসেছি?] আসলেই কি আমাদের মাথার মধ্যে কোনো, মানে, সাংঘাতিক কোনো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, ইকনোমিক এবং ট্রেড রিপোর্টিংটা কী সেটা না-বুঝলে হচ্ছেই না; সুতরাং, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে? কোথায় কী করা যায়, কোথায় কী করা যায়—তখন শুনলাম, এখানে হচ্ছে কিছু একটা, আর তখনই দৌড়ায় চলে আসলাম, "নাহ্, একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, এটা মিস করাই যাবে না" এরকম কি না। [এ রকম কি অবস্থাটা? এ রকম তো না!] [০০:৪৬:৫৩]

তার মানে, বিদ্যমান ট্রেনিংগুলোকে সাধারণভাবে প্রশ্নের সামনে হাজির করা যায়। তাই না? তার পর উত্তর কী পাওয়া যাচ্ছে, না-যাচ্ছে, সেটা পরে। একটা একটা করে [কেস ধরে ধরে] দেখতে হবে। গণ এবং ঢালাও [এবং মুখস্ড়] কোনো উত্তর নাই। [০০:৪৭:১১]

তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেল: [সমাজ-] জগতে কোনো প্রশ্নেরই কোনো ঢালাও উত্তর নাই। 'সূর্য কোন দিকে ওঠে?', 'পূর্ব দিকে ওঠে।'—এ রকমটা ছাড়া। তাই না? ওগুলো আমাদের আয়ত্তের বাইরের ঘটনা। মানবিক [বা সামাজিক] কোনো বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্নেরই কোনো এক কথায় উত্তর নাই। এমন কোনো উত্তর নাই, যে উত্তর সবার জন্য প্রযোজ্য। [০০:৪৭:৩৬]

তাহলে, অর্থনৈতিক ও ব্যবসা বিষয়ক রিপোর্টিঙের গুর"ত্ব কী? এর প্রয়োজন কী? এটা যদি প্রশ্ন হয়, তবে এর উত্তর কী? একটা জিনিস আমরা বুঝলাম যে, এর এক কথায় কোনো উত্তর নাই। কিংবা এমন কোনো উত্তর নাই, যে উত্তরের সঙ্গে আমরা সবাই একমত হব—যদি-না একমত হওয়ার জন্য আমরা ইতোমধ্যে *প্রশিক্ষিত* হয়ে থাকি যে, "না, আমরা ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষিত, সহজেই একমত হতে পারি"। [চট করে একমত হতে পারাটা কিন্তু শিখতে হয়।] এটার জন্য যদি আমরা ইতোমধ্যেই [সেরকম] প্রশিক্ষিত হয়ে থাকি, তাহলে আমরা আবার সহজেই একমত হতে পারব। আর, অতখানি প্রশিক্ষণ যদি আমরা এ জীবনে না-পেয়ে থাকি, আমরা যদি ভেবে উঠতে পারি যে, না, আমরা আসলে অতখানি প্রশিক্ষিত না, আমরা অভিনয় করছি, কেননা এইটা না-করে উপায় নাই [তাহলেই পুরো পরিস্থিতি আলাদা দাঁড়াবে]। [০০:৪৮:২৮]

আমার তা-ই মনে হয়। গর"র বাচ্চাকে প্রশিক্ষণ দিতেই অত দিন লাগে। ঐ কয়েক হাজার বছর ধরে তার পিতৃপুর"ষ-মাতৃপুর"ষ-মাতৃনারীরা সবাই চূড়ান্ড় দাসত্ব করার পরেও, তাহলে মানুষের বাচ্চাকে এত সহজে ট্রেইন্ড্ আপ করে তোলা সহজ না। সুতরাং, আমরা সম্ভবত অভিনয় করছি, রোল পেণ্ড

করছি যে, এরকমটা এরকমটা না-করলে, এরকমটা এরকমটা না-বললে, আমি যেখানে আছি সেই জায়গাটার সাথে মানানসই হয় না। [০০:৪৮:৫৯]

> (এই পর্যায়ে একজন সাংবাদিক উঠে দাঁড়ান। আলোচক 'বলবেন কিছু?' জিজ্ঞেস করলে তিনি শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের 'আনুষ্ঠানিক', 'অনানুষ্ঠানিক' এবং 'উপ-আনুষ্ঠানিক' ইত্যাদি প্রকারভেদের বিবরণ দেন এবং মানুষের নিজে-নিজে শেখার ব্যাপারটিকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা অনানুষ্ঠানিক ট্রেনিং হিসেবে অভিহিত করা যায় কিনা সে-সম্পর্কে জানতে চান। উত্তরে আলোচক বলেন,) [০০:৪৯:৩৬]

হ্যাঁ, আমি বললাম তো। সেটাকে তো ট্রেনিং বললামও এবং বললাম সেই ট্রেনিংয়ের পেছনে আমার নিজের তাগিদ কাজ করছে। আমার নিজের তাড়না কাজ করছে। ব্যাপক, অদম্য তাড়না। মানবিক তাড়না। প্রয়োজন। এবং সম্পূর্ণ বুঝেসুঝে যে আমি ঐ তাড়নাটা অর্জন করেছি, তা-ও না। এটার মধ্যে আমার প্রজাতিগত স্পৃহা কাজ করছে। প্রজাতিগত কী-জানি-একটা আমি ভেতর থেকে টের পাচ্ছি যে, আমাকে এটা করতে হবে। তো, আমি বললাম যে, শুধু প্রজাতিগতভাবে টের আমি আমি পাই বা না-পাই, যেকোনোভাবেই টের পাই না কেন, যদি আমি মনে করি যে, আমার কোনো জিনিস শেখার জন্য তাড়না আছে, তাহলে সেইটা এক ধরনের শিক্ষা। [এই ধরনের শিক্ষায় আমার আকাঙ্ক্ষাই আসল ঘটনা। অন্য কেউ যদি শেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেন, তো সেটা আমার কাজে আদৌ লাগবে, যদি আমার তাড়নাটা থাকে। যদি আমার গরজ না-থাকে, তাহলে মহা ওস্ড়াদের পালণ্ঢায় পড়েও শেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালেই এটা বুঝবেন। মানুষ অন্যকে যান্ত্রিক অনুকরণ করে শেখে না। শেখাটা মানুষের অন্ড়র্জাত ব্যাপার। ওস্ড়াদকে দেখে, তাঁর সাথে কাজ করতে করতে যে সাগরেদ নিজেই ওস্ড়াদ হয়ে ওঠেন, তিনি কী করেন? তিনি কিন্তু ওস্ড়াদের নকল করেন না। গুর"কে তিনি আত্মস্থ করেন। এমনকি ওস্ড়াদের কাজ ও কর্মপদ্ধতিকে তিনি নিজের মতো করে কমবেশি করেন, বদলান, উন্নত করেন আরো। অথচ ঐ ওস্ড়াদেরই অন্য সাগরেদরা নিচু স্ড়রের মিস্ত্রিই থেকে যান। কারণ, তাঁরা শিখছিলেন বাধ্য হয়ে। প্রাণের আনন্দে না।] [০০:৫০:১৩]

আমি আপনার তিন রকমের [আনুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার] মধ্যে গেলাম না, হ্যাঁ? ঐ তিন রকম করে দেখলে পরে কোনো বিশেষ সুবিধা হয় কিনা, আমি নিশ্চিত নই। ধরেন যে এইটা, মানে ঐ যে ভাগ করলেন তিন রকম ভাবে, আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে, এই বিভক্তি [তৈরি] করার পদ্ধতিটাই, এ ক্ষেত্রে, একটা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, ঠিক না? এটা একটা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি। সম্ভবত কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই এ ধরনের পদ্ধতির উদ্ভব। এটা আমার সন্দেহ, এই মুহূর্তে। আমি জানি না, ঘটনাটা আপনার ক্ষেত্রে কী। আপনি কি নিজে নিজে ভাবলেন? নাকি কোনো

না-কোনোভাবে আপনি কোনো জায়গা থেকে এ রকম শুনেছেন বা দেখেছেন? [০০:৫০:৪৯][১২]

আচ্ছা। আমি আপাতত ভাগ করলাম অন্য জায়গা থেকে। একটা হলো যে, নিজের তাড়নায় শিক্ষা। আমি শিখতে চাই। যেকোনো কারণেই হোক। আন্ড়রিকভাবে। এটা আমার আগ্রহ। আরেকটা হলো যে, আমার আগ্রহ না, হ্যাঁ? এটা কেমন কেমন করে যেন আমাকে রাজি করানো হয়েছে, বা আমি রাজি হয়েছি যে, এটা করতে হবে। যেমন, স্কুলে যাওয়ার সময় প্রথম প্রথম একটু বাপ-মা'রা হালকা পামপট্টি মারেন, অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন একটুখানি যে, স্কুলে যাওয়া খুব ভালো, ওখানে গেলে খেলাধুলা হবে, অনেক বন্ধুবান্ধব পাওয়া যাবে। নানানরকমভাবে বাবা-মা'রা একটু ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করেন যে, ওখানে যেতে হবে। কিন্তু, ওখানে আমরা যেতে-না-যেতেই, ঐ বয়সেই, আমরা সক্রেটিসের চাইতেও বেশি জ্ঞান অর্জন করে ফেলি এবং এই পরম সত্য শিখে ফেলি যে, স্কুল খুব সুবিধার জায়গা না, এইটা ভালো লাগে না। [০০:৫১:৫১]

স্কুল ভালো লাগে, আসলেই স্কুল ভালো লাগে, এ রকম বাচ্চা আমি খুব একটা চিনি না। আপনারা চেনেন কিনা আমি জানি না। অথবা আপনাদের কারো ছোটবেলায় (স্কুল যে-কারণে তৈরি করা হয়েছে ঠিক সেই কারণে) স্কুল ভালো লেগেছে, আমার মনে হয় না। এখন, আমাদের অন্য কারণ ঘটে যায়। এখানেই হচ্ছে মানুষের মজাটা। মানুষ ঐখানে যেয়ে তার নিজের মতো করে ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। তার যেটা ভালো লাগে, সে সব আয়োজন সে ওরই মধ্যে করার চেষ্টা করে। তখন হয়ত স্কুলে যাওয়ার পথে কাচারি-মাঠের মধ্যে সাপখেলা দেখাচ্ছে। সেইটা ভালো লাগে। স্কুলে না-গেলে তো আর ঐ পর্যন্ড় যাওয়া যাবে না। আরো কত রকম! অজস্র পদ্ধতিতে আমাদের কাছে স্কুল তখন ভালো লাগে। স্কুলে গেলে ক্লাস ফাঁকি দেওয়া যায়। ক্লাসের মধ্যেও দুষ্টুমি করা যায়। এই যে দুষ্টুমিগুলি, যেগুলিকে আমরা দুষ্টুমি বলি, সেগুলো কী? যেগুলো 'খারাপ কাজ', রীতির বাইরে, সেগুলো হচ্ছে দুষ্টুমি। মানে, যা আপনার জন্য 'করণীয়' ছিল না, কিন্তু আপনি করছেন। মানে, যা আপনার করতে আসলে ইচ্ছা করছে—হ্যাঁ?—কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেটা পছন্দ করেন না, তার নাম হচ্ছে 'খারাপ কাজ', দুষ্টুমি। [এইভাবেই, এরকম আবাল্য প্রশিক্ষণের কারণেই 'আদবকায়দা' এবং 'বেআদবি'র ধারণা পাই আমরা, 'ভালো' ও 'মন্দ' বিষয়ক ধারণা পাই। ব্যক্তিজীবন থেকে শুর" করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ড় যাবতীয় কর্তৃপক্ষ এভাবে

[১২] এ প্রশ্নের উত্তরে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিক মহোদয় কয়েকটা কথা বলেন যা রেকর্ডে অস্পষ্ট ছিল, উদ্ধার করা যায়নি। তারপর বর্তমান আলোচক (সরন) তাঁর আলোচনা আবার শুর" করেন, এখানে ঠিক পরের এই "*আচ্ছা। ...*" অনুচ্ছেদটি থেকে তার অনুলিপি।

'এটা করা যাবে না', 'এটা করা ভালো না', 'ওটা করা যাবে না', 'ওটা করলে শাস্ড়ি পেতে হবে' বলে একের পর এক আইন করতে থাকে। আবাল্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ফলে যাঁরা সেসব আইন মেনে চলেন তাঁরা হন রাষ্ট্রের 'সুনাগরিক', আর যাঁরা নিজের বুদ্ধি-বিবেক-অনুভূতি অনুয়ায়ী চলেন, তাঁরা হন 'অপরাধী'। এভাবেই রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে ক্রিমিনালাইজ করে, 'অপরাধী' আখ্যায়িত করে। যেমন ধর"ন, বড়লোকদের দামি মদ খাওয়াটা পছন্দ করলেও গরিব-ফকির-দরবেশদের গাঁজা খাওয়া বা সিদ্ধি সেবা করাকে রাষ্ট্র (মানে আমাদের শাসক-ব্যক্তিবর্গ) পছন্দ করে না। সুতরাং, কেউ গাঁজা খেলেই সেটা জেলে গিয়ে পচার মতো অপরাধ হয়ে যায়। আধুনিক পৃথিবীর সমস্ড় কারাগারে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে অপরাধী-কয়েদিরা আছেন, তারা এই তথাকথিত 'মাদকসেবনকারী' গরিব মানুষ। এঁদের দরকার চিকিৎসা, রাষ্ট্র এঁদেরকে দেয় বন্দিত্ব। যেমন ধর"ন, সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে এখন রাষ্ট্র ভাবছে, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে হবে। উপায় কী? রাষ্ট্র একটি ভিক্ষাবিরোধী আইন প্রণয়ন করবে। তারপর যাঁরা ভিক্ষা করবেন তাঁরা সবাই আইন ভাঙার দায়ে 'অপরাধী' হয়ে উঠবেন। জেলখানাগুলো ভরে উঠবে গরিব মানুষে।[১৩]] এই তো! 'ভালো' এবং 'খারাপ'-এর প্রাথমিকতম বৈশিষ্ট্য! [০০:৫২:৫৮]

আমি গড়ে যেটা দেখতে পাই, এগুলো গড়ে বলছি, প্রত্যেকটা ঘটনা ধরে ধরে আমাদেরকে আবার, যদি আমরা দেখতে পারি, তখন আবার [সুনির্দিষ্ট] কোনো কোনো ঘটনার বেলায় অন্য রকম উত্তরও পেতে পারি আমরা, ঠিক না? [আপাতত] মোটা দাগে আমরা ব্যাপারটা যদি দেখতে চাই, তাহলে যা দেখা যায়, সেইটা বলছি [এখানে]। তো, তাহলে অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের গুর"ত্ব কোথায়, প্রয়োজনীয়তা কোথায়, এই প্রশ্নেরও তাহলে কিন্তু আলাদা আলাদা উত্তরই পাব আমরা। [০০:৫৪:১০]

কী ঘটেছে যে, ব্যবসাবাণিজ্যের রিপোর্ট এত গুর"ত্বসহকারে ছাপা হচ্ছে?

এখন ধরেন যে, একটা জিনিস আমরা দেখলাম যে, আমরা অর্থনীতির গুর"ত্ব বুঝি। ব্যবসাবাণিজ্যের গুর"ত্বও বুঝি। কিন্তু আমরা তো রাজনীতির গুর"ত্বও বুঝি। আমরা খেলাধুলার গুর"ত্বও বুঝি। আমাদের জীবনে লেখাপড়ার গুর"ত্বও বুঝি। এগুলোর সবই তো সাংবাদিক হিসেবে আমাদের আওতার

[১৩] মাদকের দায়ে অপরাধীকরণ প্রসঙ্গে দেখুন: পঞ্চম অধ্যায়, কলিন ওয়ার্ড, ২০০৪; মাদকবিরোধী জেহাদের রাজনীতি সম্পর্কে দেখুন: আর্মেন্ড়নো, ২০০১; কারাগার যে গরিব মানুষদেরকে সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিষ্ঠান সে সম্পর্কে দেখুন: ক্রপোৎকিন, ১৮৮৭; যাবতীয় সমস্যার সমাধানে কথায় কথায় আইন প্রণয়ন করা, তথা আইন এবং কর্তৃত্বের সম্পর্ক বিষয়ে দেখুন: ক্রপোৎকিন, ১৮৮২।

মধ্যে পড়ে, তাই না? আমাদের কাভারেজের মধ্যে পড়ে—মানুষ সংক্রান্ড় সব কিছুই। তাহলে আলাদা করে অর্থনীতি এবং ব্যবসা বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের গুর"ত্ব নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে কেন এখন? এতদিন বলতে হয়নি কেন? [০০:৫৪:৪৭]

[অংশগ্রহণকারী একজন সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে] আপনি মনে হয় বললেন যে, আপনি একদম শুর"তে কৃষি বিষয়ক রিপোর্টিং করতেন? এইটা কীভাবে হলো বলেন তো? আমার কাছে এইটা ব্যতিক্রমী মনে হলো।[১৪] তার মানে এই কাজে আপনার স্বাভাবিক একটা আগ্রহও ছিল। মানে, কৃষিকাজ ভালো লাগত।[১৫] তার মানে আপনি অর্থনৈতিক এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের মধ্যে ছিলেনই, শুর"ই করেছেন এটা দিয়ে, বাস্ড়বে—তাই না? মানে, অর্থনৈতিক রিপোর্টিং দিয়েই আপনার রিপোর্টিং শুর"। তখন কি আপনি কোথাও শুনেছেন অর্থনৈতিক রিপোর্টিং নিয়ে আপনাকে শিখতে হবে আলাদা করে?[১৬] কত বছর হলো আপনার রিপোর্টিং শুর" করা?[১৭] বহু বহু দিন, তাই না?[১৮] অথচ, এতদিন পরে এসে আমাদেরকে অর্থনৈতিক এবং ব্যবসা বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের গুর"ত্ব আলাদা করে শিখতে হবে এরকম একটা সিদ্ধান্ড় কোথাও হয়েছে। [একজন সাংবাদিক এ পর্যায়ে, "সেই সময়ের অবস্থা আর এখনকার অবস্থা এক নয়" জাতীয় একটি কথা বলেন।] এটা আপনার যেকোনো প্রশ্নের বেলাতেই ঠিক। সেই সময়ের রাজনীতি, এখনকার রাজনীতি আলাদা। সেই সময়ের খেলাধুলা, এখনকার খেলাধুলা আলাদা। সেই সময়ের পত্রিকা, এখনকার পত্রিকা আলাদা।

একজন সাংবাদিক : তখন অর্থনৈতিক রিপোর্টগুলি প্রথম পাতায় বড় করে দিত। এখন পাতাই করে দিয়েছে একটা—এইটা অর্থনীতির পাতা।

সরন : আগে অর্থনৈতিক রিপোর্টগুলি প্রথম পাতায় বড় করে দিত, এরকম ঘটনা কি বেশি একটা ঘটত?

বেশ ক-জন সাংবাদিক : (এক সাথে নেতিবাচক উত্তর) না, না।

সরন : হঠাৎ ঘটত।

একজন সাংবাদিক : শুধু বাজেট।

সরন : বাজেট, তাই না? শুধু বাজেট, বা কখনো কখনো স্পেশাল কোনো মানে একটা আইটেম হয়ত লিড আইটেম হলো। খুবই কালেভদ্রে। মানে ঐ জিনিস হতোই না প্রায়। সুতরাং, হঠাৎ করে কিছু যদি হতো তখন হয়ত বড় করে প্রথম

[১৪] সাংবাদিক মহোদয়ের এখানে বলা কথাগুলো রেকর্ডে অস্পষ্ট।
[১৫] সাংবাদিক মহোদয়ের এখানে বলা কথাগুলোও রেকর্ডে অস্পষ্ট।
[১৬] উত্তরে সাংবাদিক মহোদয় বলেন, "কখনোই না"।
[১৭] সাংবাদিক মহোদয়ের এখানে বলা কথাগুলোও রেকর্ডে অস্পষ্ট।
[১৮] সাংবাদিক মহোদয়ের এখানে বলা কথাগুলোও রেকর্ডে অস্পষ্ট।

পাতায় আসত। আমি আপনার পার্থক্যটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে, আপনি যদি শুধু এইভাবে দেখেন যে, আগে আর এখন আলাদা, শুধু যদি আলাদা হিসেবে দেখেন, তাইলে পরে জিনিসটা ধরতে পারা আমাদের জন্য কঠিন হবে। বরঞ্চ আলাদাটা কোথায়, সেইটাকে যদি আমরা ধরার চেষ্টা করতে পারি, তাহলে হয়ত আমরা আমাদের জায়গাটায় আসতে পারব যে, কেন আমরা এখন এই বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছি। যেমন আপনি বললেন যে এখন একটা পাতা আলাদাই আছে। কোনো কোনো পত্রিকার একাধিক পাতাও আছে, তাই না? এবং সেটা প্রতিদিনই ছাপা হয়। কেন, বলেন, কেন, কী কারণে? কী হয়েছে? ঐ সময়ের সঙ্গে এই সময়ের কী আলাদা হয়েছে? কী ঘটনা ঘটেছে যেটার কারণে এই অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্ট পত্রিকাতে এত গুর"ত্ব সহকারে ছাপা হচ্ছে? [০০:৫৮:৫২]

এ পর্যায়ে বেশ ক-জন সাংবাদিক আগ্রহভরে একে একে দুই-একটা করে কথা বলেন, যা রেকর্ডে অস্পষ্ট। আলোচক তখন তাঁদের সব কথা যে রেকর্ড করা হচ্ছে সে কথা তাঁদেরকে জানান।

সরন : আমার মেশিনে ধরা পড়বে আপনাদের বলা কথাগুলো? আমি বুঝতে পারছি না। আমি একটা মেশিন অন করে রেখেছি, রেকর্ড করছি। আপনাদের কথাগুলো ধরা পড়বে এখানে? ফ্যানটা অফ করা থাক? আজকে তো মনে হয় গরম নাই? ঐটাও আরেকটা অভ্যাস—ফ্যান চলতে হবে।

এ পর্যায়ে অনেকেই ফ্যান অফ করে দেওয়ার জন্য আয়োজকদেরকে অনুরোধ করেন। ফ্যান অফ করে দেওয়া হয়। একজন সাংবাদিক তখন তাঁর কথা শুর" করেন।

একজন সাংবাদিক : আমি যেটা বলছিলাম, কেউ-না-কেউ চাপিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা এরকম আমারও মনে হয়েছে। আমরা এই [অর্থনৈতিক ও ব্যবসাবাণিজ্য জাতীয়] রিপোর্টিংয়ে ঝুঁকলাম কেন? [০০:৫৯:৪৬]

এরপর মূল আলোচক আবার তাঁর কথা শুর" করেন: "সমাজে কোথাও একটা সিদ্ধান্ড় নেওয়া হয়েছে যে, অর্থনীতি ...", কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হন, কেননা উক্ত সাংবাদিক মহোদয় তখনো তাঁর কথা শেষ করেননি, তিনি বলেই যাচ্ছিলেন। দু-জনের কথা সংঘর্ষে লিপ্ত হলে আলোচক থেমে যান সাংবাদিক মহোদয়ের কথা শোনার জন্য। [০০:৫৯:৫৫]

এ পর্যায়ে জনাব মহিউদ্দিন একেবারে কাছে এসে, খুব নিচু স্বরে, আয়োজকবৃন্দের পক্ষ থেকে নিউটনকে মনে করিয়ে দেন, হাতে আর সময় আছে ৩০ মিনিট। তাঁর কথা রেকর্ডে অস্পষ্ট ও ভাঙা-ভাঙা শোনা গেছে, তাতে বোঝা যায় তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে, ইতোমধ্যে এই সাংবাদিকবৃন্দ তাঁদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন এবং পরে অন্য একটা অধিবেশনে তাঁরা আবার বলবেনও, সুতরাং আলোচনা যেন এখন সুনির্দিষ্ট জায়গায় নিবদ্ধ হয় এবং দ্র"ত পরিসমাপ্তির দিকে যায়। তখন নিউটন যা বলেন তার মানে দাঁড়ায় এই যে, সাংবদিকদের এসব কথাবার্তা বর্তমান আলোচনারই অংশ এবং পুরো আলোচনা শেষ হতে খুব দেরি হবে না। তখন উপরোক্ত সাংবাদিক তাঁর অসমাপ্ত কথা শুর" করেন আবার। [০১: ০০:০৬]

উক্ত সাংবাদিক : এখানে কোনো একটি মহলের বা বিশেষ একটি মহলের ইন্টারেস্ট আছে, যে-ইন্টারেস্টটি, মানে, ইন্টারেস্টের কারণেই বোধ হয় ঐ দিকে আমাদেরকে ঝুঁকতে হচ্ছে বা ঐ দিকে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে, বা আমরা বাধ্য হচ্ছি—এরকম আমার মনে হয়েছে। তা না-হলে বিজ্ঞাপনগুলো দেখি, সেখানে একটা অবস্থা বুঝতে পারি, কিংবা আমরা কখনো যোগাযোগ করলে ঢাকা থেকে আমাদেরকে অনেক সময় বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের এই ছোট্ট নিউজটি, যে নিউজটি ওরকম দামি নিউজ না, জিন্দেগিতে আমরা ছাপতে পারি নাই, অথচ ঐ নিউজটি যদি ফ্রন্ট পেজে দিতে বলা হয়, আমি কীভাবে দেব?" [০১:০০:৩৮]

সরন : একটা উদাহরণ দেন না—খুব সহজ হবে; বা না-দিলেও চলবে। [০১:০০:৪২]

আরেকজন সাংবাদিক : হঠাৎ করেই আমাদের বিজ্ঞাপন-বিভাগ থেকে ফোন দেওয়া হলো, দেওয়ার পর বলা হলো, [অস্পষ্ট] 'কালকে [অস্পষ্ট] মেঘনা গ্রুপের একটা ইয়া আছে, আপনার ওখানে যাবে এবং ছবি এবং নিউজটা বড় করে দেবেন'। [০১:০০:৫৪]

সরন : কিসের ওপর নিউজ?

সাংবাদিক : মেঘনা গ্রুপের।

সরন : ও আচ্ছা।

সাংবাদিক : তো, ঘটনাটা হচ্ছে যে, 'ছবি এবং নিউজটা একটু বড় করে দেবেন';—নিউজটা আমি কীভাবে বড় করব, যা ঘটেছে তার বাইরে?! (সবার চাপা হাসি, নানা মন্তব্য, কথা) [০১:০১:১০]

অন্য আরেকজন সাংবাদিক : একটা বিষয় ইয়া করতেছে, মানে, [অস্পষ্ট] মোবাইল কোম্পানি, বিভিন্ন কোম্পানির [অস্পষ্ট] বিজ্ঞাপনের স্বার্থ দেখেতেছে পত্রিকায়। এইটা দেখতে যেয়ে এক ধরনের অর্থনৈতিক রিপোর্ট কাজ করতেছে। [০১:০১:২৩]

সরন : হুঁ হুঁ।

উক্ত সাংবাদিক : এছাড়া আমি মনে করি যে, এক ধরনের পাঠকও আমাদের সৃষ্টি হয়েছে যারা এই অর্থনৈতিক রিপোর্টগুলো চায়। (এ পর্যায়ে মূল আলোচক আবার তাঁর আলোচনায় ফিরে যান।) [০১:০১:৩১]

...

দোকানদারির রিপোর্টিং

একটা কথা কিন্তু উঠেই যাচ্ছে। তাহলে, অর্থনৈতিক রিপোর্ট একটা দাঁড়াচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য যেগুলো প্রয়োজন—ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে, নেতৃস্থানীয়—সেরকম রিপোর্ট। আবার, আপনার পাড়ার আমার বাজারের মুদি-দোকানদার বা অন্যান্য দোকানদারদের বা ব্যবসায়ী-দের নিউজ যে করতে হবে তা কিন্তু তাঁরা ভাবছেন না। যারা লিডিং ফার্ম, তাই না, নেতৃস্থানীয় যারা প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, তাদের বিষয়ক তথ্যগুলো পড়ার মতো কিছু লোক দাঁড়াচ্ছে। এইটা এক ধরনের হচ্ছে যে অর্থনৈতিক রিপোর্ট। [০১:০২:০৭]

আরেকটা তো হলো যে, ঐ যে উনি বলছিলেন কৃষি দিয়ে তো উনি শুরুই করেছেন ...। [০১:০২:১২]

এ সময় একজন সাংবাদিককে উঠে দাঁড়াতে দেখে মূল আলোচক তাঁকে বলেন, "হ্যাঁ, প্রদীপ দা বলেন।" তখন তিনি কথা তোলেন বিজ্ঞাপন নিয়ে, বিজ্ঞাপনকৃত পণ্যের উৎপাদক হাউজটির খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত বিশেষ সুবিধা প্রসঙ্গে, যা নিয়ে একটু আগেই কথা হচ্ছিল। অন্যদিকে, আরেকজন সাংবাদিক মিডিয়ার আগাম সংবাদ ভোজ্য তেলের দাম, তথা সাধারণভাবে দ্রব্যমূল্য, বাড়ানোর ক্ষেত্রে কীভাবে 'খবরের আড়ালে বিজ্ঞাপন' বা 'প্রমোশন' হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ 'অমুক দ্রব্যের দাম বাড়ছে' জাতীয় আগাম সংবাদ পণ্যটির দাম বাড়াতে পাইকারি বিক্রেতাদেরকে কীভাবে সাহায্য করে, তা নিয়ে। আরো একজন সাংবাদিক তাঁর নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেন নিত্যদিনের পণ্যের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে কীভাবে মিডিয়া ব্যবসায়ীদেরকে "উস্কে দেওয়া"র কাজ করে থাকে। এ পর্যায়ে সরন আবার কিছুক্ষণের জন্য কথা বলতে সক্ষম হন। [০১:০৩:৪৩]

সরন : এরকমটা ঘটবেই। কেননা আপনি যা চান শুধুমাত্র সেইটুকু তো আপনি রিমোট কন্ট্রোল করতে পারবেন না। যেকোনো রিপোর্টই আপনি যখন করবেন তার বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হবে। যারা যারা যেভাবে ভূক্তভোগী, ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে, সেরকম সেরকমভাবে প্রতিক্রিয়া হবে। যারা দাম বাড়ার কারণে ঝামেলায় পড়বে তাদের অনুভূতি হবে যে, তার ক্ষিপ্ত হবে, বিরক্ত হবে, তারা মিডিয়াকে থ্যাঙ্কস জানাবে, মিডিয়া আগেই বলেছিল, দাম বাড়ছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। [০১:০৪:১১]

আমাদের দেশে তো 'কর্তৃপক্ষ' আছেন। আজকে শুধু না, এক ধরনের চিরকাল থেকেই আছেন। কিছু হলে পরেই 'কর্তৃপক্ষ কিছু একটা করুক'। আপনার-আমার, আমরা যে পক্ষ, জনপক্ষ, আমাদের কিছু করণীয় নাই। আমাদের করণীয় বলতে অপেক্ষা করা যে, কর্তৃপক্ষ কিছু একটা করবে। কিছু হলে পরেই 'একটা আইন হোক'। রাস্তাঘাট ভাঙা, রাস্তাঘাট ভালো করার জন্য একটা আইন হোক। অমুক জায়গায় বাসের হর্ন বাজায় খুব বেশি, গাড়ির হর্ন বন্ধ করার জন্য একটা আইন হোক। যা কিছুই আমরা চাই বা চাই না সেইসব কিছু বন্ধ করার জন্য বা চালু করার জন্য একটা আইন হোক। আমি মাঝখানে বলছিলাম, এভাবে কর্তৃপক্ষ এবং আইন, আইন এবং কর্তৃপক্ষ—এরাই হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে যাবতীয় কিছু করেন। [০১:০৪:৫২]

তো, ঐ একটা অভিযোগ আসবে ভূক্তভোগীদের দিক থেকে যে, কর্তৃপক্ষ জানতেনই, আগের দিনই রিপোর্ট করা হয়েছে দাম বাড়তে পারে, তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না কেন?

একজন সাংবাদিক আবার সেই ভোজ্য তেলের দাম বাড়ার প্রশ্ন, আমদানিসূত্রে বিদেশের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতার কথা, আমাদের অসহায় অবস্থার কথা

তোলেন, সীমান্ড় দিয়ে তেল পাচার হয়ে যাওয়ার কথা বলেন। তারপর, আরেকজন সাংবাদিক দেশী-বিদেশী ব্যবসাবাণিজ্য ও বাজারহাটের হালচাল সাধারণ মানুষ বোঝেন না বলে ব্যাপারগুলো 'ভালো করে বুঝিয়ে বলা'র জন্য মিডিয়া এখন ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকতে পারে বলে অভিমত দেন। [০১:০৬:৩০]

সরন : তার মানে হচ্ছে যা ঘটনা ঘটছে দেশে, সে ঘটনাগুলো জনগণ সব নাও বুঝতে পারে, তাদের জন্য সব জিনিস বোধগম্য নাও হতে পারে, তার জন্য তাদেরকে বুঝিয়ে বলার কাজটা ... [০১:০৬:৪৩]

উক্ত সাংবাদিক : এইটা হচ্ছে কী, বুঝিয়ে বলার ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকাই সব থেকে বেটার, কারণ ... [০১:০৬:৪৭]

আচ্ছা, এইটা আমাকে বলেন, এই যে 'বুঝিয়ে বলা', বুঝিয়ে বলার কোনো ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন? দাম বাড়বে, দাম কমবে, এগুলো কিন্তু আমরা যেটাকে বলি 'কী' সেই 'কী-প্রশ্নের' উত্তর ('কী' ঘটছে)? 'কেন' ঘটছে তা না-বললে তো বুঝিয়ে বলা হলো না! যেকোনো ঘটনাই কেন ঘটছে, অন্য কী ঘটতে পারতো, এরকম কেন ঘটল, বা কী করলে অন্য রকম ঘটবে, এগুলো যদি আমি বুঝিয়ে না-বলি তাহলে বোঝানো গেল না। সেরকম রিপোর্ট কি দেখতে পাচ্ছেন?[১৯] আছে শুধু কোন দোকানে কী পাওয়া যায়, কোথায় কী বিক্রি হচ্ছে, নতুন মডেলের কী এসেছে, নতুন ফ্যাশনের কী এসেছে সেইসব, তাই না? কোনটার কী দাম, কোথায় গেলে আপনি সেটা কিনতে পারবেন, সেটা পরলে আপনাকে কেমন দেখাবে, তার জন্য বানিয়ে বানিয়ে মডেলদেরকে দিয়ে ছবিটবি তোলানো, তাই না? [০১:০৭:৩৫]

একটা বিপুল পরিবর্তন। কিন্তু কেন ঘটছে? ধরেন, সামগ্রিক অর্থে, দ্রব্যমূল্য কেন বাড়ে? আবছা আবছা শোনা যায় যে, একটা সিন্ডিকেট আছে। মাঝে মাঝে পত্রিকার বা মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে এরকম একটা আবছা আবছা কথা শোনা যায়। বৃহত্তর যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো আছে সারা পৃথিবীতে, সেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে স্থায়ী কোনো ব্যাপার আছে কিনা। এগুলো তো কোনো নতুন সমস্যা না—জিনিসপত্রের দাম বাড়া—বিশ বছর আগেও তো বাড়ছিল। ছিয়াশিতেও জনসাধারণ ভুগছিল দ্রব্যমূল্য বাড়ার কারণে, তাই না? দ্রব্যমূল্য বাড়াটা আজকের দিনের একটা এই মুহূর্তের ইস্যু। কিন্তু, প্রধানত, অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্ট বলতে বোঝাচ্ছে দোকানদারি বিষয়ক রিপোর্টিং। মানে, কোথায় কী কিনতে-টিনতে পাওয়া যায়, কোথায় কী নতুন দোকান-টোকান খুলল। [০১:০৮:২৬]

[১৯] দু-জন সাংবাদিক বলেন, 'না, সেরকম রিপোর্ট নাই।'

একজন সাংবাদিক : "এইটা তো না, স্যার! অর্থনীতি বলতে তো এইটা না, কেনাটাই তো না।"
সরন : [সাংবাদিক মহোদয়ের কথাকে সমর্থন করে] ঠিক না?
উক্ত সাংবাদিক : "জি, স্যার।"
সরন : কিন্তু, দাঁড়াচ্ছে কিন্তু বাস্ড়বে তা-ই।
উক্ত সাংবাদিক : "হ্যাঁ। আমাদের পরিবেশ তা-ই।" [০১:০৮:৩২]

সরন : বাজেটের সময়, বাজেটের আগে-পরে, কোন বিষয়ের ওপর ট্যাক্স বাড়বে, কোন বিষয়ের ওপর শুল্ক কমবে—এগুলো নিয়ে কিছু রিপোর্ট হয়। কিন্তু এখানে ঐ 'বুঝিয়ে বলা'র ঘটনা থাকে না। বরঞ্চ, আপনি খেয়াল করলে ধরতে পারবেন, খেয়াল না-করলে ধরতে পারবেন না—এমন ঘটনা প্রচুর থাকে। প্রচুর চালাকি থাকে। প্রচুর আড়াল-করা হয়। প্রচুর লুকিয়ে-রাখা হয়। [০১:০৮:৫২]

চিত্র ১: *প্রথম আলোর* 'অ্যাংকর মাদার্স ডে বিশেষ সংখ্যা আম্মু তুমি লক্ষ্মী'

আম্মু-আব্বু-সাংবাদিকতা

যেমন ধরেন, একবার আমি এরকম দেখলাম, "আম্মু-আব্বু-সমাচার" লেখাটার[২০] মধ্যে আমি যেটা উলেণ্ডখ করেছি যে, গুঁড়ো দুধের ওপরে সরকার

[২০] দ্রষ্টব্য : নিউটন, ২০০৩। এই রচনাটি বর্তমান আলোচনার জন্য, সমাজ-মিডিয়া-সংস্কৃতি

ট্যাক্স বাড়িয়েছে—বাড়াতে যাচ্ছে—এমন ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল। এখন আমার ভালো করে মনে নাই। তো, তখন *প্রথম আলো*-তে রিপোর্ট হলো যে, দুধ হচ্ছে খুবই একটা অত্যাবশ্যক জিনিস বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে; দুধ যা মোট প্রয়োজন সারা বছরে, সেটা এখানে উৎপন্ন হয় না; সরবরাহ নাই; তাই, গুঁড়ো দুধের দাম যদি বেড়ে যায় ট্যাক্স বাড়ানোর কারণে তাহলে পরে সেটা আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। এটা যে হবে—এই মর্মে তারা রিপোর্টের মধ্যে ঐ 'নিউজিল্যান্ড ডেইরি', কি 'ডানো', এই রকম নানান কোম্পানির আপনার যারা ডিরেক্টর, কর্তা-ব্যক্তি, এঁদের সাক্ষাৎকার নিলেন ছোট ছোট করে তাঁরা এই বিষয়ে: নিউজিল্যান্ড ডেইরির অমুকে বলেন যে, হ্যাঁ, দুধ একটা অত্যাবশ্যক জিনিস, এটা ট্যাক্সমুক্ত থাকা উচিত, ট্যাক্স অন্ড়ত কমানো উচিত। এই ধরনের কথাবার্তা তাঁরা বললেন।[২১] [০১:০৯:৪৯]

মদ সিগারেটের সঙ্গে এক কাতারে গুঁড়ো দুধ

বিলাসপণ্য নিয়ন্ত্রণের নামে

পুষ্টি সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা

সুনীতি বিশ্বাস

সরকারের আমদানি তালিকায় মদ এবং সিগারেটকে উল্লেখ করা হয়েছে অনাবশ্যক পণ্য হিসেবে। অথচ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগানদার দুধও রয়েছে একই তালিকায়। সরকার একে বিলাসপণ্য হিসেবে চিহ্নিত করে এর আমদানি নিরুৎসাহিত করতে নানা রকম শুল্ক আরোপ করেছে।

বাজেট আসছে

গুঁড়ো দুধের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিউজিল্যান্ড মিল্ক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

চিত্র ২: *প্রথম আলো*, প্রথম পাতা, ২৬ মে ২০০২

একই সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আমরা দেখলাম, মা-দিবস উদযাপিত হচ্ছে। মা-দিবসে *প্রথম আলো*-তে বিরাট করে একটা পাতা—শিশুদের যে পাতাটা, "গোলণ্ঢাছুট"। গোটা পৃষ্ঠাটা মা-দিবস উদযাপনের জন্য উৎসর্গ করা হলো এবং গোটা পৃষ্ঠাটা ব্যাপক চিত্রবহুল কাভারেজ দিয়ে সাজানো হলো নিউজিল্যান্ড

সংক্রান্ড় আমার যাবতীয় বিশেণ্ডষণের জন্য, এবং "সমকালীন অনেক লেখকের জন্য সূত্র-দলিল" (মানস, ২০০২)।

[২১] এই রিপোর্টটা লিখতে *প্রথম আলো* যাদের সাথে আলাপ করেছে তাদের মধ্যে আছেন নিউজিল্যাণ্ড মিল্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মইনুল হোসেন, গুঁড়া দুধের অপর ব্যবসায়ী সানোয়ারা গ্রপের চেয়ারম্যান নূর"ল ইসলাম বিএসসি, গুঁড়া দুধের আরেক আমদানিকারক নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেডের হিউম্যান রিসোর্স ও করপোরেট অ্যাফেয়ার বিভাগের প্রধান এম জুলফিকার হোসাইন, আর ডানো গুঁড়া দুধের উৎপাদনকারী আরলা ফুডস ইনগ্রিডিয়েণ্টস মিলকো-র বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আহমেদ কবীর। (নিউটন, ২০০৩)

ডেইরির ছবিটবি দিয়ে। "অ্যাংকর মা দিবস"। অ্যাংকর 'আম্মু তুমি লক্ষ্মী' মা দিবস—এরকম (ঐটা ওদের বিজ্ঞাপনের স্লেণ্ঢাগান)[২২]। [০১:১০:২৩]

তো, অ্যাংকর একটা গুঁড়ো দুধ; তাঁরা মা-দিবসের গোটা পাতাটা স্পন্সর করছে; (তখন মনে হয় ইটিভি ছিল) একুশে টিভিতে তাঁরা একটা অনুষ্ঠান, মা-দিবসের, স্পন্সর করছে; মা-দিবস নিয়ে এই সমস্ড় আলোচনা [ও কর্মকা"] চলছে; এবং গুঁড়ো দুধের দাম কমানো উচিত—এইটা নিয়ে *প্রথম আলো*-তে রিপোর্ট হচ্ছে। একই সঙ্গে ঘটনাগুলো ঘটছে। বাজেটের আশেপাশে। জুন মাসের ঘটনা। ২৬শে জুন[২৩] নাকি, না, মনে নাই আমার সঠিকভাবে। ... যাক। বাজেটের আগে-পরে এ ধরনের ঘটনা। তার মানে কিন্তু *প্রথম আলো*র স্বার্থটা পরিষ্কার। প্রথম আলোর সঙ্গে এই ধরনের গুঁড়োদুধ-কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনের বিনিময় আছে। স্পন্সরশিপের [বা পৃষ্ঠপোষকতার] সম্পর্ক আছে। এবং সেই জায়গা থেকেই 'গুড়ো দুধ একটা অত্যাবশ্যক জিনিস' এই বলে রিপোর্ট করা [অস্পষ্ট]। আচ্ছা। কিন্তু [সে রিপোর্টে] আমাদের যে গর"র ফার্মগুলো, আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে, নানাভাবে গর"র চাষবাস ইত্যাদি বাড়ানো যায় কিনা, দুধ উৎপাদন বাড়ানো যায় কিনা—[সেসব কথা নাই]। আমাদের মতোন দেশে দুধ যদি উৎপাদন করতে না-পারি, কোথায় পারা যাবে? একটা শিল্পায়িত দেশে দুধ উৎপাদন করা যায় অনেক বেশি, আমাদের এখানে হতে পারে না? এখানে কিন্তু এসব কোনো কথা নাই। গুঁড়োদুধ খেতে হবে বেশি করে, এটা হচ্ছে তাঁদের প্রনোদনা। অথচ জাতিসংঘের হু [WHO] বা স্বাস্থ্য-সংস্থান খুবই সুস্পষ্ট পরামর্শ, দীর্ঘ কাল থেকে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে, বলে যাচ্ছে, গুঁড়ো দুধ হচ্ছে অসম্ভব ক্ষতিকর একটা জিনিস, অত্যন্ড় ঝুঁকিপূর্ণ একটা জিনিস, পারলে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। অন্ড়ত নির্দিষ্ট বয়েস পর্যন্ড় একটা বাচ্চাকে সেটা খেতে না-দেওয়া, হারাম করে দেওয়া হোক—এগুলো তাদের প্রেসক্রিপশন। [০১:১২:০১]

তাহলে দেখেন যে, রিপোর্ট পড়ে ওপরে-ওপরে কিচ্ছু বোঝা যাবে না—কী [করা] হয়েছে। বরঞ্চ মনে হবে যে, বাংলাদেশের লোকেরা যেন দুধ খেতে পায়, 'আমার সন্ড়ান যেন থাকে দুধেভাতে'—এটাই *প্রথম আলো*র আকাঙ্ক্ষা। এটাই মনে হবে। কিন্তু ঘটনা একেবারেই এর বিপরীত, তাই না? [০১:১২:২০]

[২২] পাতার শিরোনামটা ছিল: "অ্যাংকর মাদার্স ডে বিশেষ সংখ্যা আম্মু তুমি লক্ষ্মী" (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)

[২৩] আসলে ২৬শে মে ২০০২ তারিখের *প্রথম আলো* পত্রিকার প্রথম পাতার রিপোর্ট এটা: "মদ সিগারেটের সঙ্গে এক কাতারে গুঁড়ো দুধ: বিলাসপণ্য নিয়ন্ত্রণের নামে পুষ্টি সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা"

তাহলে, অর্থনৈতিক রিপোর্টিং বলব কাকে? যেখানে শুধু দোকানদারি বিষয়ক রিপোর্টিং হবে? কিংবা অমুক ফার্মে অমুকে এমডি নির্বাচিত, তমুক ফার্মের কার্যালয় পরিবর্তন, তমুক জায়গায় নতুন কার্যালয় উদ্বোধন, আরেক জায়গাতে মাল্টিন্যাশনাল কোনো কর্পোরেশনে বাইরে থেকে নিয়োগ পেয়ে আমাদের দেশে 'কান্ট্রি ম্যানেজার' হয়ে কেউ এসেছেন তার ছবি দিয়ে রিপোর্ট—এগুলোই তো? 'অর্থ ও বাণিজ্য' পাতার রিপোর্টিং? অথবা, বড় বড় অর্থনৈতিক ও ব্যবসাবাণিজ্যিক ফার্মগুলোর জন্য ক্ষতিকর কোনো ঘটনা যেন না ঘটে, সেই মর্মে কিছু রিপোর্ট করা। এ রিপোর্টগুলো দিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের ওপর চাপ তৈরি হয়—সামনে বাজেট আছে, সেখানে এই ধরনের কিছু যেন না-ঘটে, ইত্যাদি, তাই না? [০১:১৩:২২]

উপনিবেশ ও দারিদ্র্য : 'বাংলাদেশ গরিব দেশ'

সামগ্রিক অর্থে আমি বাংলাদেশের অর্থনীতিটা বুঝতে পারব পত্রিকা রিপোর্ট পড়লে—এমন অবস্থা কিন্তু নাই। এরকম জায়গা কিন্তু নাই যে, আমি অর্থনীতিটা বুঝতে পারব যে, কীসে কী হয়। কেন আমাদের দেশটা গরিব? ধরেন, প্রথম কথা তো এইটা, তাই না? অর্থনীতির কথা উঠলে—বাংলাদেশ গরিব দেশ। এটা যেমন 'সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে' ঐরকম—বাংলাদেশ গরিব দেশ। এটাই যেন স্বাভাবিক। এইটা কিন্তু স্বাভাবিক না, তাই না? ১৭৫৭ সালে ... আমাদের এখানে ঢাকা একটা বিরাট শহর। ... তারপর পূর্ব বাংলার, সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ববাংলা লুটপাটের পয়সাকড়ি এখান থেকে জাহাজে ভরে ভরে, নগদ টাকা এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি, লন্ডনে গিয়েছে। প্রধানত এই টাকা দিয়েই বৃটেনের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। তার মানে, আমরা যে গরিব এটা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। [০১:১৪:২২][২৪]

... তাহলে আমরা দেখলাম, সত্যিকারের অর্থনীতিটা বোঝা যায়, এরকম রিপোর্ট কিন্তু পত্রিকাতে আমাদের হচ্ছে না, তাই না? হচ্ছে না যে, তা নিয়ে কোনো আক্ষেপও নেই। ... গোটা বাংলাদেশের অর্থনীতিটা কী সেটা যদি পাঠকরা পত্রিকা পড়ে বুঝতে শুর" করেন, তাহলে কিন্তু তাঁরা বুঝতে শুর" করবেন, কেন আমাদের পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। [০১:২৭:৫৭]

একজন সাংবাদিক : স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করি?

সরন : বলেন।

সাংবাদিক : আপনার কথার সূত্র ধরেই—আপনি বলছিলেন যে, সবাই জনে যে, বাংলাদেশ একটি গরিব দেশ।

সরন : হ্যাঁ। যেন প্রাকৃতিক ব্যাপার। স্বাভাবিক ব্যাপার।

[২৪] ০১:১৪:২৩ থেকে ০১:২৭:১৫ পর্যন্ড় চা-বিরতি ছিল।

সাংবাদিক : বাংলাদেশ যে হচ্ছে বা গরিব হয়ে আছে, এটার পেছনে যে কারণগুলো, নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক কারণ জড়িয়ে আছে। আসলে এই কারণগুলো কি অর্থনৈতিক রিপোর্টের মধ্যে পড়ে?

সরন : আপনার কী মনে হয়?

সাংবাদিক : আমার তো মনে হয় পড়ে।

সরন : পড়ে না?

অন্য একজন সাংবাদিক : অবশ্যই পড়ে।

সরন : এটা যদি না-পড়ে তাহলে অর্থনীতি-রিপোর্টিংয়ের সূত্রপাত হবে কোথা কোথা থেকে?

প্রথম সাংবাদিক : যদি পড়েই থাকে, তাহলে আমি তো মনে করব যে, বিশ্ব-ব্যবস্থা যেটা, [বর্তমান] এই বিশ্বব্যবস্থার কারণে যে একটা অর্থ-ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সেই অর্থব্যবস্থার পরিণতিতেই আমরা গরিব হয়েছি।

সরন : তাই তো।

একজন সাংবাদিক : এইগুলাও তো অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের মধ্যে পড়ে।

সরন : নিশ্চয়ই।

একজন সাংবাদিক : সেইগুলা আমরা তাহলে বলছি না কেন যে, কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে, শোষিত হয়ে, এই কথাগুলা তো বলছি না? [০১:২৯:০৪]

সরন : যেমন ধরেন, নোম চমস্কিকে একবার, এই আলোচনার মধ্যে, জিজ্ঞেস করা হলে উনি একটা উদাহরণ দিলেন, গোটা এশিয়াতে জাপান একটা উন্নত দেশ, পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর মতোই উন্নত একটা দেশ। ... তো, জাপান এতটা উন্নত কেন? এশিয়ায় আর কেউই জাপানের আশেপাশেও উন্নত না। নোম চমস্কির উত্তরটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপান কখনো উপনিবেশ ছিল না। [০১:২৯:৪৯]

[চমস্কির ভাষায় বলি: আসলে আপনি যদি যেসব দেশ উন্নত হয়েছে তাদের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন একটা সাধারণ ব্যাপারে এদের মধ্যে একটা মিল আছে। আর সে মিল এতই স্বতঃস্পষ্ট, যে-কারো তা খেয়াল করতে বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষায়তনে আপনি তা কখনো কাউকে বলতে শুনবেন না যেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত তারা কখনো পশ্চিমের উপনিবেশ ছিল না। যেসব দেশকে পশ্চিম উপনিবেশ বানাতে সক্ষম হয়েছে সেসবের প্রত্যেকটা দেশ পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, একেবারে ডুবে গেছে। জাপান এমন একটা দেশ যে নিজেকে ইউরোপের উপনিবেশ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। আর, জাপানই হচ্ছে সনাতন তৃতীয় বিশ্বের একটা অংশ যা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হতে পেরেছে। আচ্ছা, ইউরোপ জাপান ছাড়া বাদবাকি সবকিছু দখল করে নিতে পেরেছে এবং জাপান উন্নত হয়েছে। এ থেকে কী বোঝা যায়? আফ্রিকার ইতিহাসপ্রণেতার দেখিয়েছেন, জাপান যখন ১৮৭০-এর দিকে শিল্পায়ন শুর" করে তখন তা বিদ্যমান সম্পদরাশি, রাষ্ট্র-পরিগঠন, প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি দিক থেকে পশ্চিম আফ্রিকার আশান্ড়-রাজ্যের মতোই

ছিল। আচ্ছা, আজকে ঐ দুইটা দেশের তুলনা করেন। সত্যি যে, এদের মধ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক পার্থক্য আছে। কিন্তু মারাত্মক পার্থক্যটা হচ্ছে জাপান পশ্চিমের অধীনস্ড় হয়নি এবং আশান্ড়-রাজ্য হয়েছে—বৃটিশদের দ্বারা। সুতরাং, আজ পশ্চিম আফ্রিকা হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকা, আর জাপান হচ্ছে জাপান। (চমস্কি, ২০০২: ৬৫)]

জাপান ছাড়া আর প্রায় সব দেশই (এদিকে থাইল্যান্ড বাদ যাবে), পশ্চিমা শক্তিগুলোর উপনিবেশ ছিল। ... দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপ আমাদের বাংলাকে লুণ্ঠন করেছে। অকল্পনীয় লুণ্ঠনের শিকার হয়েছি আমরা। গরিব হয়েছি। [০১:৩০:০৯]

[উপনিবেশের বাজার-বিকৃতি কীভাবে অধীকৃত দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে বিপর্যস্ড় করে দেয় সেটা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর আর বাংলার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন চমস্কি (বলতে গেলে আমি স্রেফ অনুবাদ করে দিচ্ছি এখানে):

[শুর"তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদৌ কীভাবে শিল্পবিপণ্ডব ঘটল—সেটাই হওয়া উচিত প্রথম প্রশ্ন। এর সাথে যুক্ত ছিল 'বাজার-বিকৃতি'র দৃষ্টান্ড়। এসব নিয়ে অর্থনীতি বিষয়ক কোর্সসমূহে এসব পড়ানো হয় না। শিল্পবিপণ্ডব সেখানে শক্তি পেয়েছে টেক্সটাইলস্ বা সূতা-কারখানা থেকে। তার মানে একটাই পণ্য: তুলা। আর, তুলা ছিল সস্ড়—মারাত্মক জর"রি ব্যাপার। আচ্ছা, তুলা কীভাবে সস্ড় হলো? বাজার-শক্তির কারণে? না। তুলা সস্ড় ছিল, তার কারণ তাঁরা এখানকার স্থানীয় আদিবাসী অধিবাসীদের উৎখাত করে তাদের দাস বানিয়েছিলেন। এইজন্যই তুলা সস্ড় হয়ে উঠেছিল। গণহত্যা এবং দাসত্ব: এর চাইতে কঠোর বাজার-বিকৃতির কথা কল্পনা করার চেষ্টা করে দেখুন। (চমস্কি, ২০০২: ২৫৭)

[অন্যান্য যেসব দেশের নিজেদের তুলাসম্পদ ছিল তারাও নিজেদের মতো করে শিল্পবিপণ্ডবের সূত্রপাত ঘটানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা বেশিদূর যেতে পারেনি, কারণ ইংল্যান্ডের বন্দুক ছিল বেশি। ইংল্যান্ড তাদেরকে গায়ের জোরে থামিয়ে দিয়েছে। যেমন ধরেন, মিশরের নিজের তুলাসম্পদ ছিল এবং তারা শিল্পবিপণ্ডবের দিকে রওনা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই, প্রায় একই সময়পর্বে, ১৮২০-র দিকে। কিন্তু বৃটিশরা পূর্ব-ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে কোনো অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে রাজি ছিল না। সুতরাং তারা এটাকে স্রেফ গায়ের জোরে থামিয়ে দিয়েছিল। আচ্ছা, বেশ, মিশরে কোনো শিল্পবিপণ্ডব নাই। (চমস্কি, ২০০২: ২৫৭ এবং এর সপ্তম অধ্যায়ের ৪৬ নং টীকায় উদ্ধৃত মারসত, ১৯৮৪: ১৬৯, ২৩৮, ২৫৮)

[বাজার-বিকৃতির এসব ধ্যানধারণা নিয়ে বৃটেনের আদি 'পরীক্ষানিরীক্ষা' চালানো হয়েছিল তৎকালীন ভারতের যে জায়গাটাকে 'বাংলা' বলা হতো সেখানে।

আসলে অষ্টাদশ শতকে যে জায়গাগুলোকে প্রথম উপনিবেশ বানানো হয় বাংলা তাদের একটা। রবার্ট ক্লাইভ যখন প্রথম সেখানে নামেন, জায়গাটাকে তিনি স্বর্গ বলে বর্ণনা করেন। ঢাকা, তাঁর মতে, ঠিক লন্ডনের মতো ছিল। তাঁরা আসলে এটাকে 'ভারতের ম্যানচেস্টার' বলে ডাকত। এটা ছিল সমৃদ্ধ, জনবহুল এলাকা। এখানে ছিল উচ্চ মানের তুলা, কৃষি, উন্নত শিল্প, বিপুল সম্পদরাজি, পাট, সর্বপ্রকারের জিনিস। শিল্প-উৎপাদনের দিক থেকে এটা আসলে ইংল্যান্ডের সাথে তুলনীয় ছিল। এবং সত্যিই মনে হচ্ছিল এটা শিল্পবিপণ্ডবের দিকে উড়তে শুর" করতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এখন এটার দিকে তাকিয়ে দেখেন : ঢাকা, বাংলাদেশের রাজধানী, দুর্যোগ-দুর্দশার চূড়ান্ড় প্রতীক। আর, এর কারণ বৃটিশরা দেশটাকে লুটতরাজ করে ধ্বংস করে দিয়েছিল। কীসের দ্বারা? আজকে আমরা যাকে বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফ-প্রণীত 'কাঠামোগত সংস্কার' বলি তার তুলনীয় সব কর্মকা"ের মাধ্যমে। (চমস্কি, ২০০২: ২৫৭)

[লোহা, জাহাজ ও সুতাসহ শিল্পকলকারখানা, বাণিজ্য কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেই সময়কার বৃটেনের সাথে বাংলার তুলনা, বাংলা থেকে পাওয়া মুনাফা ও লুটপাটের টাকায় বৃটিশ শিল্পবিপণ্ডব গড়ে ওঠা, তথা ভারতীয় শিল্পের জবরদস্ড়িমূলক-বাধ্যতামূলক আত্মত্যাগের বিনিময়ে বৃটিশ শিল্প-বিপণ্ডবের বিকাশ, উপনিবেশের লুণ্ঠনের কারণেই বাংলার নিঃস্ব হয়ে পড়া, এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বের অধীনে বাংলার কপালে কী অকল্পনীয় লুটপাট-ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিল তা জানার জন্য দেখতে পারেন, যেমন ধর"ন, ক্লেয়ারমন্ট, ১৯৬০: ৮৬ পাতার ৫৭ নং টীকা, এবং ৯৮; হার্টম্যান, ১৯৮৩: ১১-১৩ এর প্রথম অধ্যায়; নেহর", ১৯৪৬: ২৮৩-২৯৯ (চমস্কি, ২০০২: ২৫৭ এর সপ্তম অধ্যায়ের ৪৬ এবং ৪৭ নং টীকায় উদ্ধৃত)।

[একই রকম পর্যবেক্ষণ আমাদের জওয়াহেরলাল নেহর"রও—চমস্কিই জানিয়েছেন। আমাদের, অর্থাৎ বাংলার এবং পুরো ভারতবর্ষের গণদারিদ্র্যের আদি কারণ যে উপনিবেশ তা অসাধারণ সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন নেহর"। চমস্কির বইয়ের পাদটীকা-খ" নেহর"র যে উদ্ধৃতি আছে তার নকল করার বিকল্প নাই, কারণ এর চেয়ে ভালো করে বলাই অসম্ভব প্রায়:

> তাৎপর্যপূর্ণ একটা ব্যাপার আলাদা করে চোখে পড়ে। ভারতের যে অংশগুলো সবচেয়ে বেশি দিন বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল সেগুলোই আজ সবচেয়ে গরিব। বৃটিশ শাসনের দৈর্ঘ্য এবং দারিদ্র্যের ক্রমবিকাশের মধ্যেকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক তুলে ধরার জন্য এক ধরনের চার্ট সত্যিই বানানো সম্ভব। ... এতে কোনো সন্দেহই করা চলে না যে, ভারতের দরিদ্রতম অংশগুলো হচ্ছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিছু অংশ। আর ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে উঁচু যেখানে সেটা হলো পাঞ্জাব। বৃটিশরা আসার আগে বাংলা অবশ্যই অত্যন্ড় ধনী এবং সমৃদ্ধিশীল ছিল। এই পার্থক্যগুলোর পেছনে বহু কারণ থাকতেই

পারে। কিন্তু এ সত্যের ধকল সামলো কঠিন যে, এক সময়কার এত সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল বাংলা ১৮৭ বছরের বৃটিশ শাসনের পর ... এরকম গণদারিদ্র্যের দুর্দশায় নিপতিত হলো। ... এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, হিন্দুস্ড়নী যে শব্দগুলো ইংরেজি ভাষার অংশ হয়ে উঠেছে তার একটা হলো 'লুট'। ...

প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কাজই ছিল ভারতে উৎপাদিত বস্ত্রশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যাদি ও মশলা প্রভৃতি পূর্ব থেকে ইউরোপে বহন করে নিয়ে যাওয়া। সেখানে এসবের বিরাট চাহিদা ছিল। কোম্পানিটি গঠিতই হয়েছিল এই কাজের জন্য। ইংল্যান্ডে শিল্পপ্রকৌশলের বিকাশ ঘটার ফলে শিল্পভিত্তিক পুঁজিপতিদের নতুন একটা শ্রেণী গড়ে ওঠে। তাঁরা এই নীতির পরিবর্তনের দাবি তুলে বলে ভারতীয় পণ্যের জন্য বৃটিশ বাজার বন্ধ করে দিতে হবে এবং বৃটিশ শিল্প-উৎপাদকদের জন্য ভারতীয় বাজার অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। এই শ্রেণীর প্রভাবে বৃটিশ আইনসভা ভারতের ব্যাপারে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠতে শুর করে। প্রথমেই তাঁরা বৃটেন থেকে আইন করে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বাদ দিয়ে দেন। ... তারপর আসে ভারতীয় শিল্প-উৎপাদকদেরকে পরিসীমিত এবং ধ্বংস করে দেওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা। ... ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ভেঙে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ড় হয় বিপুল সংখ্যক তাঁতী এবং কারিগর। পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই প্রক্রিয়া চলে, অন্যান্য প্রাচীন শিল্পকারখানাগুলোও ভেঙে পড়তে থাকে, যেমন জাহাজনির্মাণ, কাচশিল্প, কাগজশিল্প, এবং আরো বহুরকম কার শিল্প। কারিগর শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয় বিস্ময়কর মাত্রার বেকারত্ব। এতকাল ধরে শিল্প-উৎপাদনে নিয়োজিত এই লাখোকোটি মানুষ এখন কী করবেন? তাঁরা এখন কোথায় যাবেন? তাঁদের পুরোনো পেশার আর তাঁদের জন্য খোলা নাই। নতুন পেশায় যাওয়ার পথও বন্ধ। অবশ্যই তাঁরা মরতে পারতেন। অসহ্য পরিস্থিতি থেকে মুক্তির ঐ পথ তো সবসময়ই খোলা। মরেছেনও তাঁরা। লাখে লাখে। ভারতের বৃটিশ গভর্নর-জেনারেল, লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৪ সালে জানিয়েছিলেন যে, "বাণিজ্যের ইতিহাসে এই দুরবস্থার তুলনা পাওয়া কঠিন। তাঁতীদের হাড়ে ভারতের সমতল এলাকাগুলোর রঙ জ্বলে গিয়ে শাদা হয়ে যাচ্ছে ...।" ক্রমাগতভাবে ভারত গ্রামে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটা প্রগতিশীল দেশে গত শতাব্দীতে জনসংখ্যাগত একটা পরিবর্তন ঘটেছে—কৃষি থেকে শিল্পের দিকে, গ্রাম থেকে শহরের দিকে। ভারতে এই প্রক্রিয়াটাকে উল্টে গেছে, বৃটিশ নীতির কারণে। ... ভারতীয় জনসাধারণের বিভীষিকাপূর্ণ দারিদ্র্যের এটাই তাহলে সেই আদি ও আসল কারণ, এবং তা খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। (নেহর, ১৯৪৬: ২৯৫-২৯৯)]

ফলে, আমাদের এখানে অর্থনীতি নিয়ে কথা উঠলে প্রথম কথা ওঠে, আমরা গরিব। তো, প্রথম কথা যদি হয় আমরা গরিব, তাহলে এটাই হতে হবে আমাদের এখন অর্থনীতির একটা গোড়ার কথা, তাই না? এইটা যদি আমি না-বুঝি, তাহলে আমি বাণিজ্য আর অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টিং কী বুঝব? [০১:৩০:২৫]

তাহলে, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার জায়গা আসলো—গোটা দুনিয়া জুড়েই কিছু একটা ঘটেছে যে কারণে বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টিং নিয়ে আলাদা করে কথা ওঠাতে হচ্ছে।...এ হচ্ছে একটা ব্যাপার। [০১:৩১:০৪]

অর্থনৈতিক সম্পর্ক

দুই হলো, যা-ই ঘটে থাকুক, আলাপটা উঠল, আলাপ ওঠার পর এবার নাম দিলাম অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং, কিন্তু আলাপটা হবে কী নিয়ে আসলে? তখন দেখব আমরা, আসলে আলাপটা হবে খুব সংকীর্ণ একটা পরিসীমার মধ্যে, খুব সংকীর্ণ একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে। মানে, আলোচনাটার বেড়া দেওয়া থাকবে—বাংলায় যদি বলি, 'বেড়া' দেওয়া থাকবে। লক্ষ্মণগীর মতো। অর্থনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে খুব সংকীর্ণ কতকগুলো মুখস্ড় বুলি মধ্যে। এই আলোচনার সূচকগুলি আপনি দেখবেন—দ্রব্যমূল্য, শেয়ারবাজার, এমডি নির্বাচন, অফিস স্থানান্ড়র, বাজেট নিয়ে কিছু কথা, শুল্ক বাড়ানো-কমানো। [০১:৩২:১০]

আমরা যদি প্রণালীবদ্ধভাবে চিহ্নিত করি তাহলে আরো নির্দিষ্ট করে বলতে পারব। আমার কাছে সেভাবে চিহ্নিত করা নাই। প্রণালীবদ্ধভাবে মানে কী? আমরা যদি এক বছরের, দুই বছরের, তিন বছরের পত্রিকা নিয়ে মোট তালিকা বানাতে থাকি যে, গত এত বছরের অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্ট বলতে মোট কী জিনিস ছাপা হয়েছে? তখন আমরা কিন্তু হাতেনাতে পেয়ে যাব যে, ঘুরেফিরে খুব সংকীর্ণ কয়েকটা জিনিস, কয়েকটা সূচক—এগুলো নিয়েই আলাপ, এগুলোরই নাম অর্থনৈতিক রিপোর্টিং। [০১:৩২:৩৪]

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ড় গ্রামীণ ফোন কত কোটি টাকা মুনাফা নরওয়ে বা পশ্চিমে পাঠিয়েছে? এর হিসাব আপনি দেখেছেন? গত কয়েক বছরে? গ্রামীণ ফোনের দশ বছর না? তার মানে এক দশক ধরে কাজটা চলছে—দশটা বছর। এই রিপোর্টটা নাই। কিন্তু গ্রামীণ ফোন গত বছর যে প্রচুর ট্যাক্স সরকারকে দিয়েছে এরকম একটা বড় রিপোর্ট আমাদের পত্রিকাগুলোতে এসেছে। এই রিপোর্টটা কিন্তু কোনো রিপোর্টার গিয়ে অনুসন্ধান করে রচনা করেননি, তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটা প্রেস কনফারেন্স টাইপের করেছেন, গ্রামীণ ফোনের অফিসাররা, সেখানে তাঁরা জানিয়েছেন, আমরা এই পরিমাণ টাকা সরকারকে দিয়েছি। মানে আমরা সরকারকে উদ্ধার করেছি। আবার, যেমন ধরেন বিএটি, বৃটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো।... পর পর কয়েকবার ওরা গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হলো।...প্রধানমন্ত্রী পদক উপহার দিলেন তাঁদেরকে। আনুষ্ঠানিকভাবে।...চীন মৈত্রী মিলনায়তনে। অথচ ওঁরা কিন্তু এমন কাজও করছেন পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে—স্বাভাবিক গাছগুলোকে কেটে কেটে তামাকের

চাষে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন, যেন পাহাড়ী লোকেরা, যাঁরা সাধারণ জুম চাষটাষ করেন, তাঁরা যেন তামাক চাষ করেন।...একটা খবর *ভোরের কাগজ*-এ এসেছিল ধরেন যে বছর আট-নয়েক আগে, ধারাবাহিকভাবে। কে করেছিলেন আমার মনে নাই। তো, যাঁরা স্বাভাবিক চাষাবাদকে নষ্ট করে দিয়ে তামাক চাষকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, তার জন্য টাকা বরাদ্দ করছেন আগাম, চাষের আগেই আগাম কিনেও নিচ্ছেন তামাক, ... তাঁরা বনায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার পাচ্ছেন পর পর তিন বছর ধরে। তো, এগুলো কি আমাদের অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের আওতার মধ্যে পড়ে না? [০১:৩৫:২৫]

আচ্ছা, এইগুলো কী জিনিস, বলেন দেখি? এগুলোর নাম কী? এগুলোর একটা নাম দিতে পারি আমরা। নামটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। অর্থনীতির যে বড় বড় শক্তিগুলো আছে, যে ক্ষমতাকেন্দ্রগুলো আছে, সেই ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কী? এবং ঐ ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে আমাদের সরকারের, আমাদের এলিটদের, আমাদের মিডিয়ার—সামগ্রিক অর্থে এলিট পরিবারের—সম্পর্কগুলো কী রকম? সম্পর্কের সুতাগুলোকে যদি একবার আমরা শনাক্ত করতে পারি, তাহলে দেখতে পাব ঐগুলোই হচ্ছে অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোর মূল কাঠামো। এবং ঐ সম্পর্কগুলো যদি বুঝতে পারি, তাহলে বুঝব কেন *প্রথম আলো*তে বা অন্য কোনো পত্রিকাতে গ্রামীণ ফোন কী পরিমাণে মুনাফা করেছে তা নিয়ে কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আজ পর্যন্ড় নাই। আমি গ্রামীণ ফোন সম্পর্কে খারাপ কথা বলছি না। কী কী জিনিস তাঁরা সার্ভিস দিতে চেয়ে দেননি, ওঁদের গ্রাহকরা কত অসংখ্য পদ্ধতিতে বঞ্চিত হয়েছেন, বা ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছেন, বাড়তি ট্যারিফ, বাড়তি রেট-টেটের শিকার হয়েছেন ... সেগুলো নিয়ে কোনো কথাই তুলছি না। খুব সোজা ব্যাপার—কত কোটি টাকা তাঁরা এযাবত মুনাফা করেছেন সে রিপোর্টটা পেলাম না, কিন্তু কত টাকা তাঁরা সরকারকে ট্যাক্স দিয়েছেন সে রিপোর্টটা পাচ্ছি। শুধু গ্রামীণ ফোন ব'লে না, আপনি দেখবেন যে, প্রতিটা মোবাইল ফোন নিয়ে কোনো গ্রাহকসমস্যাকেন্দ্রিক রিপোর্ট নাই। এই যে আমার বাংলা লিংকে সন্ধ্যা হয়ে গেলে নেটওয়ার্ক থাকে না অনেক দিন থেকে। আমি এটা কোথাও জানাতে পারব না। নালিশ করার কোনো কর্তৃপক্ষ নাই বাংলাদেশে। এত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে আছে কিন্তু এরকম কোনো কর্তৃপক্ষ নাই যেখানে আমি গিয়ে বলব, গ্রামীণ ফোনের বা বাংলা লিংকের বা একটা মোবাইল কোম্পানির গ্রাহক হিসেবে আমি এই সমস্যার শিকার হচ্ছি। এরকম লাখ লাখ গ্রাহক প্রতিদিন শিকার হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছেন। বলার কিছু নাই। [০১:৩৭:০৮]

এক-এগারোর কর্তৃত্বতন্ত্র ও দুর্নীতির অর্থনীতি

সরকারী কর্মচারী পাঁচ টাকা ঘুষ খেলে সেটা নিয়ে বলার জায়গা আছে। সেটা নিয়ে প্রচুর লেখার জায়গা আছে। টিআইবি-ও একটা দাঁড়িয়ে গেছে। যাঁরা লেগেই আছেন, আমরা যে একটি দুর্নীতিপরায়ণ দেশ, সেটা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু বড় বড় কর্পোরেট যে দানবগুলো, বিশাল কর্পোরেট হাউসগুলো, কী দুর্নীতি করছে, তাঁদের গ্রাহকদের কী রকম বঞ্চিত করছে, এইটা নিয়ে একটা রিপোর্ট নাই। এই দুর্নীতি নিয়ে টিআইবি-র বিন্দুমাত্র মনোযোগ নাই। টিআইবি-র মনোযোগে আছে হাসপাতাল। যেখানে ৩ টাকা ঘুষ, চার টাকা ঘুষ খায়—দারোয়নরা, যে দারোয়ানরা বেতনই পায় তিনশো টাকা চারশো টাকা। আমি তাদের ভালো কিছু নাই তা বলছি না। কিন্তু তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রটা বোঝা যায়। কোর্ট, হাসপাতাল, সরকারী অফিস, রাজনৈতিক দল—তারা বেছে নিয়েছেন। এতদিন রাজনৈতিক দল নিয়ে যে তাঁরা ক্রমাগত রিপোর্ট করে গেলেন, রাজনৈতিক দল মানেই দুর্নীতির ঘাঁটি। এইসব রিপোর্টের একটা ফল তো আমরা পাচ্ছি হাতেনাতে —সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের লোক একমত হয়ে গেলাম, রাজনৈতিক দল না-থাকলেই প্রায় ভালো। কিছুদিন আগে পর্যন্ড়ও মনোভাবটা প্রায় এরকমই ছিল। এখন টের পাওয়া যাচ্ছে যে, না, রাজনৈতিক দল তো আমার লাগবে। তার মানে, যে রাজনৈতিক দলগুলো চলছিল, বাম-ডান, ঐ রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে আমার কাজ হচ্ছিল না। তার মানে, আমার অন্য রাজনৈতিক দল দরকার। এরা কি লুটপাট-প্রুফ হবে? দুর্নীতি-প্রুফ হবে? এমন গ্যারান্টি কি কেউ দেবেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলো কি দুর্নীতিপরায়ণ না? ইরাকে যুদ্ধ করতে হবে, এইটা কার সিদ্ধান্ড়? এইটা আমেরিকার জনসাধারণের সিদ্ধান্ড়? নিশ্চয়ই না? আমেরিকা যাঁরা চালান, যাঁরা লিপস্টিকও বানান আবার ক্ষেপনাস্ত্রও বানান, এটা তাঁদের সিদ্ধান্ড় । এ অস্ত্রব্যবসায়ী ফার্মগুলোই আপনি দেখবেন মিডিয়ারও মালিক। এরা ওষুধ কোম্পানিরও মালিক। যুদ্ধ যদি না-চলে তাহলে আমেরিকার অর্থনীতি টেকে না, এটা যুদ্ধ-অর্থনীতি, স্থায়ী যুদ্ধ-অর্থনীতি। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব—সারাক্ষণই থাকতে হবে।...তাহলে ইরাকের যুদ্ধটা বা আফগানিস্ড়নের যুদ্ধটা ওঁদেরই সিদ্ধান্ড়, তাই না? এটা সুনীতি, না দুর্নীতি? এটাকে আমি মার্কিন জনগণের নিরাপত্তার নামে চালাচ্ছি যে, সাদ্দাম হোসেন যখন-তখন ঢুকে পড়বে, ঢুকে পড়ে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলবে...এইটা কোনো দুর্নীতি না। আমেরিকা কোনো দুর্নীতিপরায়ণ দেশ না। পৃথিবীকে এক নম্বর দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ।... [০১:৪০:৪৩]

আসলে কিন্তু যেখানে সরকার নাই, সেখানে দুর্নীতি নাই —এটা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বিস্ড়রিত প্রপঞ্চ। আপনি দেখবেন, যেখানে সরকার নাই, যেখানে কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ নাই, সেখানে দুর্নীতি নাই। বাস্ড়বে দেখেন। কর্তৃপক্ষীয় কাঠামো

যেখানে কাজ করে না, সেখানে দুর্নীতি কাজ করে না। যেখানে শুধু আমি আর অন্য মানুষজন লেনদেন করি সেখানে দুর্নীতি থাকে না, কিন্তু এখানে যদি কর্তৃপক্ষীয় লেনদেন থাকে যে, আমি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার, এটা আমার পদ, এটা আমার ক্ষমতা, আর আপনি আমার ছাত্র, আপনি যদি আমার এ কাজটা করে দেন তাহলে একটা নম্বর পাবেন, না-করে দিলে একটা নম্বর কাটা যাবে, কম দিয়ে দেব, এটা সেটা। যখন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকাঠামো আমাদের সম্পর্ক-গুলোকে গ্রাস করে, তখন দুর্নীতি সেখানে জায়গা পায়, সুযোগ পায়—এইটা সারা পৃথিবীতে। যেখানে মানুষ নিজেরা নিজেরা লেনদেন করে, সেখানে দুর্নীতি কাজ করে না। যেমন ফুলবাড়ি—তিন দিন, চার দিন ওখানে সরকার ছিল না, তাই না? অন্ড়ত তিন-চার দিন দেখলাম ওখানে কোনো সরকার নাই। থানা-পুলিশ ঘরের ভেতর বসে আছে, রাস্ড়ায়ই বের হয় না। যদি-বা বের হয়, শাদা পতাকা উড়িয়ে বের হয়, যেন 'আমরা পুলিশ না, আমরা তোমাদেরই লোক'। (শ্রোতাদের চাপা হাসি) [০১:৪১:৫২]

বাস্ড়বে, কার্যত, আমাদের জীবনে একটা পা ফেলার জায়গা নাই যেখানে সরকার নাই, যেখানে রাষ্ট্রের আইনকানুন নাই। সেখানে ফুলবাড়ি তিন-চার দিন রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের উর্ধ্বে চলে গেল। তো, তখন তো হিসাব অনুসারে ফুলবাড়ি দুর্নীতিতে, বিশৃংখলায় এবং অপরাধে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। তাই না, আমাদের তো অনুমান এগুলোই? থানা-পুলিশ না-থাকলে মানুষ সবাই চুরিডাকাতি করবে। তা ছাড়া থানা-পুলিশ কেন আছে? [০১:৪২:২০]

পরীক্ষার হলে যদি আমি পাহারা না দিই, তাহলে আমার সব ছাত্র চোর, তারা সুযোগ পেলেই নকল করবে—এইটা হচ্ছে আমার অনুমান, ছাত্রদের সম্পর্কে। এবং শিক্ষকদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমান হচ্ছে যে, ছাত্ররা যদি খাতার মধ্যে নাম লেখে তাহলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশি নম্বর দিয়ে দেব, বা কম নম্বর দিয়ে দেব। এইজন্য খাতার ওপর শিক্ষার্থীদের নাম লেখা যাবে না। রোল নম্বর দেখে আমরা চিনব না—এরকম একটা অভিনয় করব। (শ্রোতাদের হাসি) বড় কথা হলো, আপনার প্রাথমিক অনুমানটা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চোর। এঁরা চিনলেই নম্বর কমবেশি করে দেয়। এটাই প্রশ্নাতীত অনুমান। তার মানে বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা তার ছাত্রদেরকে এবং শিক্ষকদেরকে, দুই পক্ষকেই চোর মনে করে, দুর্নীতিপরায়ণ মনে করে, তাই না? নিয়মটা তো আসলো এখান থেকে। তার মানে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় চালাবেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উপরে আপনার কোনো আস্থা নাই—নীতিগত কোনো আস্থাই নাই। আপনাকে যতক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখব ততক্ষণ আপনি সৎ। এই হলো অনুমান। [০১:৪৩:৩৮]

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় আমি এটা বললাম, আপনি দেখবেন—অনুমানটা এই। এটা আপনি সমাজের বেলাতেও দেখবেন, কমবেশি একই। সরকারী, কর্তৃপক্ষীয় অনুমান হচ্ছে এইটা। কর্তৃত্বপরায়ণ ধারণা হচ্ছে এইটা—মানুষকে হাতে-পায়ে বেঁধে গর" না-বানাতে পারলে ওরা সৎ থাকবে না। কিন্তু ফুলবাড়িতে আমরা তিন দিন দেখলাম, অপরাধ ছাড়া, অপরাধের একটিও কোনো ঘটনা ছাড়াই, ফুলবাড়ি চলল। দ্রব্যমূল্য বাড়ল না। বাজারে উল্টাপাল্টা হলো না। ওরা স্থানীয়ভাবে নিজেরা কমিটি করে বাজারে টহল দিল। এবং এলাকাতে নারীপুর"ষ সবাই রাস্ড়ায় বেরিয়ে আসলেও কোথাও কোনোরকম কোনো অনাচার ঘটল না। তার মানে আমি কী বলছি? যেখানে [স্থায়ী, কেন্দ্রীভূত এবং আরোপিত] কর্তৃত্ব নাই, কর্তৃত্ব কাঠামো নাই সেখানে দুর্নীতি নাই—সাধারণভাবে। [০১:৪৪:২৫]

কিন্তু টিআইবির দুর্নীতির আলাপের যে-ধারা বা ডিসকোর্স (*আলাপ-আলোচনার সামগ্রিক কায়দা-কানুন-ধারাকে বোঝানোর জন্য আমাদের ফরাসি ভাষার তাত্ত্বিকেরা ডিসকোর্স কথাটা বলেন, অর্থাৎ মোট যা বাতচিৎ, কোনো একটা বিষয় নিয়ে মোট যা আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি, কথাবার্তা—তার নাম হচ্ছে ডিসকোর্স*), দুর্নীতি নিয়ে মোট যে কথা গত পাঁচ বছরে বলেছি আমরা, টিআইবি বলেছে, তাতে দুর্নীতির এসব প্রাথমিক জায়গা আসেনি। [০১:৪৪: ৫৪]

এখন যে ১১ জনের সরকার আছে, এই ১১ জনের অধীনে তো ঐ আমলাতন্ত্রই কাজ করছে, নাকি? এখন সরকার কোনো দুর্নীতি করছে না—এটা আমাদের ধরে নিতে হবে? অথচ এই কাঠামোটাই তিন দিন আগে পর্যন্ড় পুরোপুরিভাবে দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। কীভাবে এখন তারা দুর্নীতিপরায়ণ থাকল না হঠাৎ করে? ভয়ে। তাহলে আপনার গণতন্ত্রের প্রাথমিক ধারণাটা কী, বলেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা হচ্ছে: ভয় দেখাতে হবে। (চাপা হাসি—শ্রোতাদের) [০১:৪৫:৩৭]

আপনি স্বীকার করেন বা না-করেন, আপনি এটা করছেন। তা যদি না-হয়, তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে দুর্নীতি চলছে—একই কাঠামো যেহেতু বিদ্যমান, ওপরে ১১ জন লোকই তো শুধু বদলেছে। আর, আপনি যদি দাবি করেন, না দুর্নীতি চলছে না, তাহলে পরিবর্তনটা কোথায় ঘটেছে? পরিবর্তন হচ্ছে যে, এখন একটা আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। একটা ভয়ের বাতাস বাংলাদেশে আছে, তাই না? ধান গাছ কতটুকু দুলবে বাতাসে সেইটা নিয়েও ভয় আছে ধানের—উল্টাপাল্টা কিছু হয় কিনা।... [০১:৪৬: ১৪]

এই তো! এখন সেটা মঙ্গলের জন্য হোক, অমঙ্গলের জন্য হোক, ইতিহাস বলবে। সেটা নিয়ে আমি মন্ড়ব্য করছি না।...তাহলে, আপনি দেশ চালাবেন

কি এইভাবে? তাহলে তো আবার আপনি যখন আতঙ্কের হাওয়া তুলে নেবেন, তখন আবার দুর্নীতি হবে। আর, তা যদি না-হয়, তাহলে কাঠামো বদলাতে হবে। কাঠামো যদি বদলাতে হয়, তাহলে দুর্নীতির অর্থনীতিটা বুঝতে হবে। দুর্নীতির অর্থনীতিটা যদি বুঝতে চান তাহলে আপনাকে ঐ যে বললাম, প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান সমাজে যেগুলো আছে, সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে হবে। [০১:৪৭:১৮]

রাজনীতির রাক্ষসতন্ত্র, কর্পোরেট খোক্কসতন্ত্র

খালেদা জিয়া খারাপ বংশের লোক, বা শেখ হাসিনা খারাপ বংশের লোক, বা আরাফাত রহমান জন্মগ্রহণ করার সময় থেকেই দুর্নীতিপরায়ণ—এগুলো তো ঠিক কথা না। ...আপনার যে অর্থনীতিটা চলছে সেই অর্থনীতিটাই কিন্তু খালেদা জিয়া বা হাসিনার মতো রাক্ষস তৈরি করছে। আমি ঐটাকে রাক্ষসতন্ত্র বলি। [অস্পষ্ট] এটা হচ্ছে রাজনীতির রাক্ষসতন্ত্র। আর নতুন যে দুনিয়ায় আমরা ঢুকতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কর্পোরেট খোক্কসতন্ত্র। ... [০১:৪৯:০৯]

বিশ্বায়ন ও প্রশিক্ষণ

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং হয় না, তা না। হচ্ছে। হওয়ার প্রধান কারণ কী? প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৯০ সাল থেকে একটা বড় ঘটনা পৃথিবী-ব্যাপী ঘটেছে, যেটার নাম আমরা বলছি বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন তো পুঁজিবাদের গত কয়েক শ বছর ধরেই চলছে। তাছাড়া, লর্ড ক্লাইভ বাংলাদেশে কেমন করে আসলেন? গোলোকের ঐ মাথা থেকে গোলোকের এই মাথায় চলে আসলেন কেমন করে, যদি গোলোকায়ন না-হয় এইটা? ...তার মানে, এখন থেকে পুঁজি অনেক বেশি করে সারা দুনিয়াতে তার ইচ্ছা মতো ঘোরাফেরা করবে। এটা হচ্ছে পুঁজির সিদ্ধান্ত। পশ্চিমা বাজারগুলো পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সেগুলোতে আর বেচা-কেনার জায়গা থাকছে না। সুতরাং, নতুন নতুন বাজার দরকার।...পুঁজি যেন সব জায়গায় পাঠাতে পারি। পুঁজিকে কেউ ব্যাহত করবে না। কোনো বন্দুক, কোনো আইন, কোনো মূল্যবোধ, কোনো ধর্ম, কোনো রাষ্ট্র, কোনো সমাজ পুঁজির পথে যেন বাধা হয়ে না-দাঁড়ায়। এর নাম বিশ্বায়ন। [০১:৫১:০৩]

এই বিশ্বায়ন ঘটার ফলটা হচ্ছে সারা দুনিয়াটা বাজারে পরিণত হওয়া। এটা বাজারের যুগ। আপনার বেডরুমে ঘুমানোর জায়গা, ড্রইং রুম বাজার। ড্রইং রুমে পার্লার, কিংবা একটা দোকান, কাপড়ের দোকান, কিছু একটার দোকান, কিছু একটা বেচাকেনা। মানুষের প্রধানতম পরিচয় হবে, সে বেচাকেনা-করা প্রাণী। সে ক্রেতা, সে ভোক্তা। আপনি যদি ক্রেতা হন, আপনাকে তাহলে বিক্রেতাও হতে হবে। গোটা সমাজ যদি ভোক্তা হয়, খাদক সমাজ, ক্রেতা-

সমাজ, তাহলে সেই সমাজকে বিক্রেতা-সমাজও হতে হবে। মানে আপনি এবং সারাক্ষণই কিছু-না-কিছু বেচব এবং সারাক্ষণই কিছ-না-কিছু কিনব। এই হচ্ছে আমাদের কাজ। বাকি সব হচ্ছে বুলি। বাকি সব আলাপ, অভ্যাস। এই তো! এর নাম হচ্ছে বিশ্বায়ন। যেন আমি গোটা দেশটাকেই, গোটা সমাজটাকেই, প্রায় প্রত্যেকটা বাসাবাড়ি এবং প্রত্যেকটা নাগরিককে বাজারের অংশ করতে পারি। আপনাকে বাজারের নাট, না-হয় বাজারের বল্টু, না-হয় বাজারের গিয়ার, না-হয় বাজারের ছাদ, না-হয় বাজারের চাকা—কিছু একটা হতে হবে। যদি না হন, আপনি অনুপযুক্ত। আপনি কিছুক্ষণ পর দেখবেন যে, আপনি খুব বিপদে আছেন। [০১:৫২:২৫]

কয়েক মিনিট দেরি করলেই দেরি। বিরাট দেরি। সময় হচ্ছে টাকা।...এই যে আমরা এখানে আছি, যে সময় আমরা দিচ্ছি, এটা টাকায় অনুদিত হবে, আমাদের উভয়পক্ষেই, তাই না? আমাদের প্রাথমিক প্রণোদোনাও তা-ই—এখানে হাজির হওয়ার। কিন্তু ঐ যে মানুষের বাচ্চা। এরই মধ্যে অন্য কাজ করবে সে—তার আগ্রহ অনুসারে, তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে, তার কর্তব্যবোধ অনুসারে। একেকজন একেক রকমের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে। আমি যেমন নিচ্ছি এখন। এবং এরকম সুযোগ নেওয়ার মতো পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের এখানে আছে। আমার একার পক্ষে সুযোগ নেওয়াটা সম্ভব হতো না, আপনারা যদি প্রত্যাখ্যান করতেন। [০১:৫৩:১৭]

এটা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতো, সেখানে সাংবাদিকতার শিক্ষক যদি এরকম প্রশিক্ষণে বসতেন, এবং আমার মতো কোনো শিক্ষক যদি এই আলাপগুলো তুলতেন, তাহলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হতেন—কোনো-না-কোনোভাবে। কেননা মার্কিন সাংবাদিকরা প্রশিক্ষিত। আমাদের সাংবাদিকরা এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষিত না। এটাই পার্থক্য। এইজন্য ওঁরা সিএনএন-বিবিসি, আমরা সিএনএন-বিবিসি না। সিএনএন-বিবিসি মানে পুরোপুরি প্রশিক্ষিত, যেখানে কোনো উল্টা-পাল্টা হবে না, হিসেবের বাইরে কিছু হবে না। হিসেবের বাইরে যে কিছু হবে না সেটা আবার আপনাকে ঘাড়ে বন্দুক ধরে যে করাচ্ছি, তা কিন্তু না। আপনি যেহেতু প্রশিক্ষিত, সুতরাং আপনি নিজেই হিসেবের বাইরে যাবেন না। এই জন্যই ঐ সাংবাদিকতা হচ্ছে উন্নত সাংবাদিকতা। এবং ঐ জন্যই আমাদের এখানে সাংবাদিকতা উন্নত সাংবাদিকতা না। ঐ প্রশিক্ষণ আমাদের এখানে নাই। [০১:৫৪:৪৬]

সেই কারণেই কখনো অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং নাম দিয়ে, কখনো অন্য কোনো নাম দিয়ে আমাদের এখানে নানান টাইপের প্রশিক্ষণ চলবে। সারা বছর ধরে, এবং সামনের গোটা গোটা বছরগুলো জুড়ে। নানান

নামে, নানান ইস্যুতে প্রশিক্ষণ চলবে। কখনো অর্থনীতি বিষয়ে, কখনো ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে, কখনো পরিবেশ বিষয়ে, কখনো নারী পাচার বিষয়ে, কখনো মাদক বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে। এবং বছর পনর-বিশেক গেলে আপনি দেখবেন যে, প্রশিক্ষিত লোক ছাড়া আর কোনো লোক এই ইন্ডাস্ট্রিতে নাই, সাংবাদিকতা-ইন্ডাস্ট্রিতে নাই। [০১:৫৪:৫২]

বিনোদনের বেলায়, নাটকের বেলায়, ফিল্মের বেলায় 'ইন্ডাস্ট্রি' কথাটা চালু হয়ে গিয়েছে। তাঁরা নিজেরাই বলেন। নাটক যিনি লেখেন, উনি 'ইন্ডাস্ট্রি'র জন্য লেখেন—বাংলা কথা, পরিষ্কার, তাই না? 'ইন্ডাস্ট্রি' যতদিন ইংরেজি শব্দ ছিল, ততদিন বুঝিনি আমরা। এখন বাংলা হয়ে গেছে। এখন নাটক যেটা লিখছি সেটা ইন্ডাস্ট্রিতে চলতে হবে। তাহলে এখানে 'নাটক', শিল্প', 'নাটক শানিত হচ্ছে শোষকেরা সাবধান' এ সমস্ড় বুলি, পোস্টার সব ফাঁপা কথা। 'নাটক' হচ্ছে একটা প্রোডাকশন যা ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপন্ন হয়—ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি, অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড বাই দ্য ইন্ডাস্ট্রি। যা হয়, সেই প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে 'কালচার'। সাংবাদিকতারও সেই রকম হওয়া উচিত। ঐ রকমই একটা কালচারাল প্রোডাকশন হওয়া উচিত সাংবাদিকতা। সেটা এখনও হয়নি। [০১:৫৫:৫০]

নিও লিবারাল অ্যান্টিবায়োটিক

এসব যদি না-হয় তাহলে বাজারটা ভালো মতো চলে না। ধর্মঘট হয়, হরতাল হয়, রাজনৈতিক দলগুলো মারামারি করে। বোকার মতো। যা মোট খাওয়াদাওয়া করা দরকার ভাগাভাগি করে খেলেই তো হয়। সেটাই নিয়ম হওয়া উচিত। আলাপ-আলোচনা-সমঝোতার মাধ্যমে। তার জন্য এত মারামারি করতে হবে কেন? মারামারি করলে তো ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী পুঁজি বিচলিত হয়, বিরক্ত হয়। পুঁজি তখন সিদ্ধান্ড় নেয় কেমন করে সাইজ করা যায়। যা তার পথে বাধা, তাকে কীভাবে সরানো যায়। তখন অনেক দিন ধরে প্রচারণা চলে: রাজনীতি খারাপ, রাজনীতিবিদেরা দুর্নীতিপরায়ণ, আমরা পরিবর্তন চাই। এই তো! [০১:৫৬:৪১]

আপনি এই মুহূর্তে মার্কিন, বৃটিশ, অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যান, অর্থনীতি-বিভাগগুলোতে যান, নৃবিজ্ঞান-বিভাগগুলোতে যান, খোঁজ নেন—দেখবেন যে, অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন। আমাদের মতো 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোতে 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোতে (যাদেরকে উনারাই এ সমস্ড় নামে ডাকেন), এখন নিওলিবারালিজম বা নয়া-উদারনীতিবাদকে (অর্থাৎ বিশ্বায়ন, অর্থাৎ পুঁজির অবাধ নাড়াচাড়া) অধিপতি অর্থনৈতিক ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য 'নিওলিবারাল অ্যান্টিবায়োটিক' প্রয়োগ করা হচ্ছে। [০১:৫৭:২৭]

যে সমস্ড় দেশে তাঁরা নয়া-উদারনীতিবাদ চালু করতে চাচ্ছেন, সেসব দেশে ঐ নয়া-উদারনৈতিক অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। কেননা ঐসব দেশের অর্থনীতি অসুস্থ, ভাইরাস-আক্রান্ড়। তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। এটা এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক: এক-এগারো। আমি কিন্তু অর্থনীতি নিয়েই আলাপ করছি, ঠিক না? কয় দিন আগে আমার বন্ধু [বখতিয়ার আহমেদ বাদল] আমাকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইমেইল করল। ও ওখানে নৃবিদ্যা পড়ছে। উচ্চতর ডিগ্রি করছে। ও বলছে, বাংলাদেশে এখন যেটা চলছে, সেটাকে এখানে আমরা বলি: নয়া-উদারনৈতিক অ্যান্টিবায়োটিক। [০১:৫৮:০১]

এইটা হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতির সামগ্রিক সূত্রসমূহ (মানে সুতা) বা সামগ্রিক সম্পর্কজাল যতক্ষন আপনি দেখবেন না, ততক্ষন আপনি আসলে উপলব্ধির দিক থেকে অর্থনীতির কাছাকাছি আসতে পারবেন না। আমি তো অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ না, কোনো বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ না, আমি শুধু খেয়াল করি, ঘটনা ঘটে কীভাবে, সেটা টের পাওয়া যায় কেমন করে। সামগ্রিক সম্পর্কজাল পর্যন্ড় আমি যদি পৌঁছাতে না-পারি, তাহলে আমি কিন্তু বুঝব না 'আমি কে' 'আমি কেন এই প্রশিক্ষণে এসেছি' থেকে শুর" করে 'বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এখন কোথায় আছে', এবং যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বুলিসমূহ (সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, প্রগতি, উন্নয়ন, মৌলবাদ, মৌলবাদের বিরোধিতা ইত্যাদি প্রভৃতি যা কিছু আছে) আমরা বুঝতে পারব না। [০১:৫৯:০২]

মোটা দাগে আমরা কিন্তু দেখতেই পারছি, কয়েক কোটি লোক যে মোবাইল ফোনের গ্রাহক, তাদের ভোগান্ড়ি নিয়ে কোনো অর্থনৈতিক রিপোর্ট হয় না, কিন্তু নোবেল এবং আরেকজন মডেল ওসমানী মিলনায়তনের মঞ্চের ওপর নাচছেন, ঐটা হচ্ছে *প্রথম আলোর* প্রথম পাতার প্রথম খবর। ঐখানে, ওদেরই পায়ের নিচে বা ভেতরের পাতায় আপনি দেখবেন গুর"ত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংবাদ আছে যেটা প্রথম খবর হচ্ছে না, ঐ রকম গুর"ত্ব পাচ্ছে না। যেমন ধরেন যে, মঙ্গায় দুই কোটি লোক আক্রান্ড় কুড়িগ্রাম অঞ্চলে, ভেতরের পতায়, আর ওপরের পাতায় আমাদের মডেলরা হাঁটাহাঁটি করছেন। [০২:০০:০২]

... একটা কথা দিয়ে আমি আমি শুর" করেছিলাম কিন্তু যে, কোনো প্রশ্নের আপনি একতরফা উত্তর পাবেন না, বিভিন্ন উত্তর পাবেন। আপনি যে লাইনে উত্তর খুঁজতে চান, যে উত্তর পেলে আপনার জন্য সুবিধা, বা অন্য কারো জন্য সুবিধা, তাঁরা সংশিণ্টষ্ট উত্তরগুলো পাবেন। [০২:০০:২৮]

তাহলে, এখানে অর্থনৈতিক এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং আসলো কেন? বিশ্বায়নের যুগে, বাজারের যুগে, বাজার যেন গতি পায়, বাজার যেন

শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বাজার যেন অগ্রসর হতে পারে, আমরা যেন প্রত্যেকে বাজারের উপযোগী হতে পারি, তার জন্য। [০২:০০:৪২]

যেমন ধরেন যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে স্কুলের বাচ্চাদের জন্য, স্কুলের দেওয়ালগুলোতে সিগারেটের বিজ্ঞাপন, বা খেলাধুলা বিষয়ক পণ্যের বিজ্ঞাপন, অন্যান্য জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। তর্ক উঠছে। বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো পরিষ্কার বলছে, [তাঁরা পুরো একটা ক্রেতা-প্রজন্ম গড়ে তুলতে চান। এখন থেকে একেবারে শিশুদেরকে তারা তাই টার্গেট করছেন।] আমার কাছে দলিল আছে যে কেউ গেলেই পাবেন, বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটে যান, ওঁরা নিজেরাই বলবেন, এখন আর গোপন নাই। এই যে ফার্মাকীরা যে নাটক বানাচ্ছেন ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেটা কি গোপন কিছু? সেটা কি আমাকে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখাতে হবে? না। তাঁরা নিজেরাই বলছেন। এখন আর গোপন করার কিছু নাই। [০২:০১:১৯]

সর্বত্র যখন বাজার তখন তো আপনি চুপ চুপ করে বাজার করতে পারবেন না। প্রকাশ্যেই বাজার করতে হবে। এটাকেই রীতি বলতে হবে। এই রীতি অনুসারে যে চুল আঁচড়ায় না, জামাকাপড় পরে না, সে অনুপযুক্ত। এটা তার সমস্যা। চিন্ড্রভাবনার কথা তো দূরেই রাখলাম—এই রীতি অনুসারে যারা চিন্ড্রভাবনা করে না তারা তো প্রায় উন্মাদের মতো একটা জিনিসের মধ্যে পড়ে, আনফিট তো আনফিট—তাদের মাথায় গণ্ডগোল আছে। তাই না? এ ছাড়া তারা কেন বোঝে না যে, যুগটা অনুসারে আমাদের আচার-আচরণ কী হওয়া উচিত। এ ছাড়া যে অন্য কিছুও হতে পারে, হওয়া উচিত, সেটা তো কোনো প্রসঙ্গই না। [০২:০১:৫৫]

মিডিয়া-কর্পোরেট পার্টনারশিপ

তাহলে ... একটা জরুরি কথা হলো, সত্যি সত্যি অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়। খুবই প্রয়োজন। বরাবরই প্রয়োজন ছিল। আজকের দিনে আরো প্রয়োজন। এই গুরুত্ব নিয়ে আমাদের এখন নিশ্চয়ই আর কোনো অস্পষ্টতা নাই। আবার, অপর দিক থেকে, বিশ্বব্যাপী বাজারপক্ষীয় লোকজনের দিক থেকেও, আজকের দিনে অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং অত্যন্ড় প্রয়োজন। কিন্তু সেটা কী ধরনের অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং, আর আমি যে ধরনের রিপোর্টিংয়ের কথা বলছি সেটা কী ধরনের অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিং? অর্থাৎ অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের আওতা কী, তার ইস্যুগুলো কী কী? [০২:০৩:০১]

দুই ধরনের আওতা। একটা হচ্ছে, আপনি ওপরে ওপরে খেলবেন। বাইরে বাইরে, ওপরে ওপরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবেন। কোনো জিনিসের ভেতরে যাবেন না। আসলে আপনার সাথে আমার সম্পর্কটা কী সেটা বলবেন না। অর্থনীতির প্রকৃত সম্পর্কসূত্রগুলোকে দেখবেন না। গ্রামীণ ফোনের সঙ্গে [অস্পষ্ট], বা গ্রামীণ ফোনের সঙ্গে মিডিয়ার, প্রকৃত সম্পর্ক-ধারা আপনি দেখবেন না। অথচ এটা বিঘোষিত। গত কয়েক বছর ধরে মিডিয়া প্রকাশ্যে, লিখিতভাবে বলছে যে, তারা গ্রামীণ ফোনের পার্টনার। তারা আর কার কার পার্টনার? আমার বলার আর দরকার নেই। আপনি স্রেফ একটা তালিকা বানাতে পারেন। আপনি একটু বসেন। কয়েক জন মিলে সময় দেন। এক বছরের পত্রিকা দেখেন। তালিকা বানিয়ে ফেলতে পারবেন যে, *প্রথম আলো* মোট কার কার পার্টনার, তাঁদেরই ঘোষনা অনুসারে। তখন পার্টনারদের একটা ক্লাব পাওয়া যাবে। এটা একটা ক্লাব। পার্টনারশিপ-ক্লাব।

পার্টনারশিপ কী?...পার্টনারশিপ ব্যবসা-জগতের একটা প্রত্যয় বা কথা, তাই না? এটা মানবীয় সম্পর্কের প্রত্যয় না। যখন সমাজটা বিজনেস হয়ে ওঠে, তখন আপনি দেখবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউরোপে স্বামী-স্ত্রীরা পরস্পরকে বলছে, আমরা লাইফ-পার্টনার। তার মানে আপনি টের পাবেন, ঐখানে বিজনেস ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে। ঐ জন্য স্বামী-স্ত্রীরা এখন পার্টনারশিপে আছে। আমাদের এখানেও এখন কথাটা বলা শুরু হয়ে গেছে। [কারণ আমরাও ঘরে ঘরে বাজার হয়ে উঠছি।] ... [০২:০৪:৫৯]

আচ্ছা। তার মানে, 'পার্টনারশিপ' মূলত একটা ব্যবসা-বাক্য। এবং মিডিয়াই বলছে তারা কার কার পার্টনার। পার্টনারশিপের এই ক্লাব একটা ব্যবসায়িক বন্দোবস্ড়।... তাঁরা তো আপনাকে [সাংবাদিককে] কর্মচারী হিসেবে নিয়েছেন, যেন আপনি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করেন। তার উদ্দেশ্যপূরণে আপনি যদি কাজ না-করেন, তাহলে তো আপনাকে বিদায় করে দেবে। কিন্তু শুধু বিদায় করে দিলেই তো আর হচ্ছে না। কারণ, লোক দরকার যে প্রচুর। প্রচুর পত্রিকা, প্রচুর মিডিয়া, প্রচুর আউটলেট—মিডিয়ার প্রচুর মুখ তৈরি হচ্ছে, তাই না? টেলিভিশন, এটাসেটা, নানান ধরনের...এই ফার্ম, সেই ফার্ম—বিজ্ঞাপন বানানোর, নাটক বানানোর, গান বানানোর। ব্যবসার কত রকমের মুখ, চেহারা। এইজন্য প্রচুর দক্ষ লোক লোক দরকার। প্রচুর প্রশিক্ষিত লোক দরকার। এইজন্য প্রচুর প্রশিক্ষণ। দুই পা পর পর বাঁয়ে প্রশিক্ষণ, ডাইনে প্রশিক্ষণ, ঢাকায়, মফস্বলে, গোটা দেশে। এই যে এত মুখ বিজনেসের, এত বড় বড় হাঁ, তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য এত প্রশিক্ষণ। যখন মোটামুটি পেট ভরে যাবে যে, হ্যাঁ এখন আমার মোটামুটি লোক হয়েছে, তখন শুরু হবে গুণগত মান

নিয়ন্ত্রণ। তখন যথেষ্ট প্রশিক্ষিত যারা না, তাদেরকে বিদায় করে দেওয়া হবে। [০২:০৬:২১]

তখন আপনাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলা হবে, 'তুমি কী রিপোর্ট কর? তোমার রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠ না। তুমি রিপোর্টিং বোঝোই না। এত দিন ধরে তুমি রিপোর্ট কর, তুমি জান না রিপোর্ট কীভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে করতে হয়!' আপনার তো তখন ওখানে জিজ্ঞেস করার উপায় নাই, 'কেন এ রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠ না, আমি তো বুঝলাম না'। ঘটনা হচ্ছে যে, রিপোর্টটা ইন্টারেস্টের বাইরে চলে গেছে, হিসেবের বাইরে চলে গেছে, প্রশিক্ষণের বাইরে চলে গেছে। তখন তারা আপনাকে বলবে না যে, 'সাংবাদিকতা একটা মুনাফা করার প্রতিষ্ঠান, এখানে সম্পাদক আমি—এ থেকে শুর করে তুমি সাংবাদিক পর্যন্ড় আমরা হচ্ছি কর্মচারী, মালিকের, এবং মালিকের স্বার্থের বাইরে আমরা যদি যাই, তাহলে সেটাকে সাংবাদিকতা বলে না, এবং এটা তুমি এখনও শেখো নাই, সুতরাং তুমি খেলো গা, অন্য কাজ করো'। এটা তো বলা হবে না। বলা হবে, তুমি রিপোর্টিং শেখো নাই। ... [০২:০৭:১৯]

পরের এই ধাপটা আমাদের এখানে এখনও আসেনি। আসেনি বলেই আমরা এখনও এক ধরনের অবাধ প্রবেশাধিকার পাচ্ছি মিডিয়াতে। [০২:০৭:২৬]

অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের দুই ধরন

... তো এই তো আমাদের অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের দুই ধরনের চেহারা। তাহলে এর আওতা বা ইস্যুগুলো আলাদা হবে। আপনি যদি সাধারণভাবে অর্থনৈতিক রিপোর্টিং করতে চান, তাহলে আপনাকে শুর করতে হবে 'বাংলাদেশ গরিব দেশ কেন' এই জাতীয় আলাপ মাথায় নিয়ে—আমি এটা বলছি না যে, ঠিক এই মর্মে আপনি একটা রিপোর্ট লেখেন —কিন্তু আপনার বোঝাপড়াটা এখান থেকে শুর হবে।... আর, আরেকটা হলো, নানকিঙে একটা অনুষ্ঠান আছে, ঐটা কাভার করতে হবে। তখন তাহলে ইস্যুগুলো আলাদা হয়ে যাবে। এটা আপনি র বাবা মতিন দৌলা না কি, তারপর ঐ যে ইফতেখার, কারা কারা সব বড় বড় অফিসাররা আছেন, ওনারা এসে দাঁড়াবেন, এবং ওনারা যা বলবেন সেটাই বড় রিপোর্ট হবে। আপনি তখন দেখবেন, রিপোর্টের ভাষা একই। প্রথম আলো, যুগান্ড্র এবং সমকালের রিপোর্ট মেলাবেন—দেখবেন যে, একই ভাষা। তার মানে, ঐটার কপি গেছে ঐখানে। রিপোর্টারকে আর কষ্ট করে লিখতে হবে না। কারণ, ঠিকমতো যদি প্রশিক্ষণ না-হয়ে থাকে! ফলে ঐ কাজটা আমি করে দেব, এবং ঐটাই হবে রিপোর্ট। এইটা হচ্ছে অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের আরেক ধরনের আওতা এবং ইস্যু। [০২:০৯:২১]

আপনি দেখবেন যে, ঐ পিৎজা ইন। আক্কু চৌধুরী। মানে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। মানে, কালচার। উনি হচ্ছেন পিৎজা ইনের, নাকি ঐটার নাম কী [একজন সাংবাদিক মনে করিয়ে দেন, পিৎজা হাট], হ্যাঁ, পিৎজা হাটের উনি হচ্ছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, না জানি কী। উনি আবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চার জনের এক জন পরিচালক। আচ্ছা। ঐটার যখন উদ্বোধন হবে, তখন ঐখানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ঐ আমলে যিনি সেনাবাহিনীর প্রধান, বড় বড় বিজনেসের দুই-একজন প্রধান তো আছেনই, দুই-একজন সম্পাদক, দুই-একজন কার্টুনিস্ট, দুই-একজন সঙ্গীতশিল্পী, দুই-একজন হচ্ছে যে আপনার বুদ্ধিজীবী—সব যেয়ে হাজির। [০২:১০:০৩]

একদম গুনে গুনে আপনি চার্টটা পেয়ে যাবেন। তালিকা বানাবেন গত দশ বছরে মোট কী কী অনুষ্ঠান হয়েছে, পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে, আর কোন অনুষ্ঠানে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের পরিচয় কী, সেটা পাশে পাশে লিখবেন। তাহলেই আপনারা দেখবেন যে, ক্লাবটা কী? এটাই বাংলাদেশের এলিট-ক্লাব। এটাই এই এলিট-ক্লাবের সাংস্কৃতিক চেহারা, কার্টুনের চেহারা, বুদ্ধিজীবীর চেহারা, মিডিয়ার চেহারা, তার অর্থনীতির চেহারা, তার সঙ্গীতের চেহারা, তার সেনাবাহিনীর চেহারা, এবং তার পররাষ্ট্র-সম্পর্কের চেহারা। একদম তালিকাভূক্ত। এখানে কোনো গোপন কিছু নাই, লুকোছাপার কিছু নাই। আপনার মাথার মধ্যে এ প্রশ্ন আসবেই না যে, আমেরিকার মতো একটা দেশের রাষ্ট্রদূত—সে কেমন করে একটা দোকানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হয়? তার মানে, তখন আপনি বুঝবেন যে, এটা হচ্ছে লর্ড ক্লাইভ। সে এখানে ব্যবসা করার জন্য এসেছে। লর্ড ক্লাইভের সৈন্যবাহিনী ছিল, এর সঙ্গে সৈন্যবাহিনী নাই। এখন সৈন্যবাহিনী ঘাড় উঁচু করে তাকাচ্ছে—আফগানিস্ড়ান থেকে তাকাচ্ছে মাথা উঁচু করে—বাংলাদেশ দেখা যায় কিনা। আবার, ভারতীয় সেনাবাহিনীও আছে, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীও আছে—তারা ওদের কোনো কাজকর্ম করে দিতে পারে কিনা, এদেরকে দিয়ে করানো যায় কিনা। মানে, সৈন্যবাহিনী পেছনে আছে। আচ্ছা। ... [০২:১১:২৭]

তার মানে, সমাজের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অর্থনৈতিক এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক, তাই না? আপনি যেটাকে 'রাজনীতি' বলছেন, যেটাকে 'সংস্কৃতি' বলছেন, যেটাকে এক-এগারো বলছেন, এগুলো প্রাথমিক অর্থে অর্থনৈতিক বিষয়। তার মানে, পত্রিকার জন্য, মিডিয়ার জন্য, সাংবাদিকতার জন্য অর্থনৈতিক এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের চেয়ে বেশি গুর ত্বপূর্ণ কী? কিছুই না। কিন্তু এর গুর ত্বের ধরন, প্রয়োজনীয়তার ধরন এবং রিপোর্টিংয়ের ইস্যু এবং আওতা—এগুলো আলাদা আলাদা। অন্ড়ত দুইটা চেহারা আপনি এখানে শনাক্ত করতে পারবেন। [০২:১২:০০]

ইমেজ-রিপোর্টিং, ভাসাভাসা রিপোর্টিং, শোবিজ

আচ্ছা। শুধু কি অর্থনৈতিক বিষয়গুলোই কি আমাদের এখানে ভাসাভাসা ধরনের হয়? তা নয়। আপনি যেটাকে 'সংস্কৃতি' বলে চালাচ্ছেন সারাক্ষণ, সেই সাংস্কৃতিক রিপোর্টিং দেখেন। আপনি খেলাধুলা বিষয়ক রিপোর্টিং করছেন, সেই রিপোর্টিং দেখেন। [০২:১২:১৬]

ক্রিকেট আপনাকে সারাদিন ধরে খেলতে হবে। প্রতিদিন খেলতে হবে। কেন? খেলোয়াড়রা হাঁপিয়ে যাচ্ছে। ওয়াসিম আকরাম নিজে বলছেন যে, আমি ক্লান্ড, আর পারছি না খেলতে। আমাদের শরীরে কুলাচ্ছে না। এত খেলা খেলতে হচ্ছে। ওয়াসিম আকরাম বলছেন। সবাই মুখ ফুটে বলেন না। যাঁরা অনেক ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন, যাঁদেরকে ছাড়া খেলা জিনিসটা চলবে না, তাঁরা এরকম বলার মতো হিম্মত দেখাতে পারেন। যেমন ওয়াসিম আকরাম—আর, যাঁরা পাগল। যেমন ব্রায়ান লারা। বলে তো তার বাদ পড়ে যাওয়ার দশা ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। স্পন্সরশিপ নিয়ে মারামারি, ব্রায়ান লারার। এই জিনিস নিয়েই তো। রীতিমতো মারামারি না, কৌশলগত। ওদের ক্রিকেট বোর্ড যাঁদের সাথে চুক্তিবদ্ধ তাঁদের বাইরে ব্রায়ান লারা এবং আরো কেউ কেউ অন্য কোম্পানির সাথে চুক্তি করে বসে আছেন, যা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের আইনের বাইরে। এই হচ্ছে মামলা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের লাটে ওঠার দশা। ক্রিকেটের এই খবরগুলো সেরকম খবর না। আশরাফুল অধিনায়ক হচ্ছেন, এইটা ছাড়া খবর নাই।...ও হাঁটছে কীভাবে, ও জামা পরেছে কীরকম, কথা বলছে কেমন করে প্রেস কনফারেন্সে, কীভাবে তাকাচ্ছিল—এগুলো হচ্ছে নিউজ। প্রথম পৃষ্ঠার নিউজ। [০২:১৩:৪৯]

আপনি 'রাজনীতি' নিয়ে আলাপ করেন। এক-এগারোতে কী ঘটল? আরাফাত রহমান, শেখ হাসিনারা চোর হয়ে গেল কীভাবে (যদি হয়ে থাকে)? রাজনীতির মধ্যে কী আছে? ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদরা যে চোর হবে না কেমনে বুঝব সেইটা? তাহলে আমাদেরকে অন্ধ ঈমান রাখতে হবে? না-বুঝে অন্ধ বিশ্বাস? শুধু অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে 'গণতন্ত্র' হবে? যাঁরা গণতন্ত্রের নেতা গত দুই শ বছর ধরে—আমেরিকাতে, বৃটেনে—তাঁরাই তো বলে আসছেন যে, জনসাধারণ যদি সারাক্ষণ নজরদারি না করেন, তাহলে গণতন্ত্র হয় না। [০১:১৪:২৪]

তাহলে, আপনারা দেখবেন, অর্থনীতি ছাড়াও—রাজনীতি, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, আপনার অন্যান্য যত ঘটনাবলী ঘটছে, বুদ্ধিজীবীদের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, এটা-সেটা হয়েই চলেছে—এগুলো নিয়েও দেখবেন যে, যতসব রিপোর্ট-টিপোর্ট হচ্ছে, সব ওপরে ওপরে, এবং বাজারের উপযোগী। ঐগুলোও এক ধরনের কমার্শিয়াল রিপোর্টিং, ব্যবসাবাণিজ্য-রিপোর্টিং, ইমেজ-রিপোর্টিং, শো-

বিজনেস—আমি বলি শো-বিজনেস[২৫], গোটাটাই। এখানে, ধরেন যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, আপনি একটা সেমিনার করবেন—আপনি একটা রাজনৈতিক দল, বা আপনি একটা নাটকের গ্রুপ, বা অন্য কিছু। সেখানে আপনাকে ঐ শো-বিজের যাঁরা তারকা, যেমন হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যিক, তাঁকে রাখতে হবে, বা অন্য কোনো তারকাকে রাখতে হবে। যেমন আপনার কনসার্ট করতে গেলে আইয়ুব বাচ্চু লাগবে, জেমস লাগবে, না-হয় একটা হাসান লাগবে, একটা কিছু লাগবে তো। ওরকমভাবেই এখানে আপনার কবীর চৌধুরী লাগবে, হাসান আজিজুল হক লাগবে, না-হয় তো আনিসুজ্জামান লাগবে। তাঁরা এসে ব্রাশফায়ার করবেন—কালচারের ওপর দিয়ে, অর্থনীতির ওপর দিয়ে, রাজনীতির ওপর দিয়ে—নতুন কোনোকিছুই, তাৎপর্যপূর্ণ কোনো কিছুই সেখানে আলোচিত হবে না। শ্রোতা হয়ে যাঁরা যাবেন তাঁরাও জানেন ওখানে কী হবে, যাঁরা বক্তা হয়ে ওখানে যাবেন তাঁরাও জানেন ওখানে কী হবে। দুই পক্ষ দুই পক্ষের জামাকাপড় দেখবেন, এবং অন্যান্য দৃশ্যমান উপাদানসমূহ দেখতে থাকবেন এবং বাড়িতে ফিরে আসবেন, এবং পুরো সিস্টেমটা চলতে থাকবে। এই তো? [০২:১৫:৫১]

এরই মধ্যে আমাদের এখানে এফবিআইয়ের আদলে র‍্যাব হবে। বা, আরো দক্ষ বাহিনী হবে। অচিরেই আমাদের পুলিশবাহিনী ভেঙে যাবে—যদি সবকিছু 'ঠিকমতো' এখানে চলে। এলিট-বাহিনী গড়ে উঠবে, আরো দক্ষ—হ্যাঁ, আবারও সেই 'প্রশিক্ষণ'—আরো প্রশিক্ষিত পুলিশবাহিনী আসবে। এবং উদাহরণ হিসেবে বলছি, গোটা দেশে আমরা এমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব যেন চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে প্রয়োজনীয় বিনিময় সারতে আমাদর কোনো ঝামেলা না-হয়। [০২:১৬:১৯]

তার মানে, ঘুরেফিরে কিন্তু আমরা অর্থনীতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্টিংটাকে অসম্ভব গুরুত্বের জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। এবং আজকের যুগে কেন এই আলাপটা উঠছে, সেটাও বুঝতে পারছি। [০১:১৬:৩৪]

প্রশিক্ষণ এবং স্ট্যান্ডার্ড জার্নালিজম

এখন সাংবাদিক হিসেবে আমাদের করণীয় কী? বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক হিসেবে আমাদের করণীয় কী? যার যার মতো করে—সেটা আমি বলতে পারি না। যাঁর যাঁর করণীয় নিজে নিজে ঠিক করবেন। আপনার কী উচিত কী না উচিত সেটা বলার মতো আমি কোনো জায়গা দেখি না। আমার মতো করে আমি যেটা বুঝি সেটা হলো যে, আমার করণীয় হচ্ছে, যত দূর সম্ভব এখানে স্বাধীনতার

[২৫] শো-বিজনেস নিয়ে বর্তমান আলোচকের আরো আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: নিউটন, ২০০৩।

পরিসরগুলো বাড়ানোর চেষ্টা করা। আমি যদি মনে করি, আমি যদি চাই, তাহলে প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য, বিশেষজ্ঞতন্ত্র দূর করার জন্য কাজ করা দরকার। যতদিন বিশেষজ্ঞতন্ত্র আছে ততদিন গণতন্ত্র নাই। গণতন্ত্র আর বিশেষজ্ঞদের তন্ত্র পরস্পর-বিপরীত। তাহলে আপনি সাংবাদিক হিসেবে যতটুকু পারেন, যতটুকু চান, করতে পারেন কিছু কিছু কাজ। আপনার ওপরে তো বন্দুক ধরতে পারবে না কেউ। টেলিভিশনে একদিন বন্ধ ছিল নিউজ, তাই না? এক-এগারোর পরে। তাই তো? একদিন বন্ধ ছিল। আচ্ছা। তারপর তো আর বন্ধ রাখা গেল না। চালু হয়ে গেল। কী চালু হলো সেটা পরের কথা। এত এত টেলিভিশন-চ্যানেল—একই সংবাদ। পৃথক চ্যানেল, একই সংবাদ। তফাৎ কী? তফাৎ হলো সাজগোজ কী রকম, প্রধানত সংবাদ-পাঠিকার, এবং পাঠকের, এবং সেটের। এইটা হচ্ছে পার্থক্য। এ ছাড়া একই শিরোনাম (প্রায় দশে দশ মিলবে—দুই-একটা কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আলাদা থাকবে), এবং একই স্ক্রিপ্ট—স্বাধীনভাবে আলাদা আলাদা রিপোর্টাররা আলাদা আলাদাভাবে করছেন। একই রিপোর্ট করছেন। কীভাবে? প্রশিক্ষণ। আনুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।

টেলিভিশনের সব রিপোর্টারকে ডাক দিয়ে কিন্তু একই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি, বলা হয়নি যে, 'দেখো, সব রিপোর্টিং যেন একই রকম হয়'। এমন প্রশিক্ষণ কিন্তু দেওয়া হয়নি কোথাও। কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা প্রশিক্ষিত যে, সংবাদ আসলে কী, তাই না? দুদকে যাব, সেটা সংবাদ। নির্বাচন কমিশনে যাব, সেটা সংবাদ। তাহলে নিউজ কোথায় বলেন তো? যেখানে কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ আছে। যেখানে যেখানে বসেরা আছেন, সেখানে সেখানে নিউজ। শুধু আজকে না। শুধু বাংলাদেশেও না। আগেও তা-ই। অন্য দেশেও তা-ই। আপনি সিএনএন খোলেন—একের পর এক সরকারের, কর্তৃপক্ষের লোকেরা ব্রিফ করে যাচ্ছেন। হোয়াইট হাউজ কী বলল—নিউজ। পেন্টাগনের মুখপাত্র কী বলল—নিউজ। স্টেট ডিপার্টমেন্ট কী বলল—নিউজ। বড় বড় কর্পোরেট হাউজ কী বলল—নিউজ। জনসাধারণ কোথায় আছে, কেমন আছে—নিউজ না। সোজা ব্যাপার। এটা নিউজ না। [০২:১৯:২২]

আমাদের দেশে অবশ্য এখনও পর্যন্ড় জনসাধারণ নিয়ে নিউজ হয় কেননা আমরা এখনও পর্যন্ড় স্ট্যান্ডার্ড জার্নালিজম আয়ত্ত করতে পারিনি। [০২:১৯:২৯]

বইপত্রের হদিস

এনকার্টা, ২০০৪

Microsoft Encarta Encyclopedia. Microsoft Encarta Refe-rence Library. Microsoft Corporation.

আর্মেন্ড্রানো, ২০০১

Paul Armentano, "Drug War Mythology" in Russ Kick, *You Are Being Lied To* (The Disinformation Guide to Media Distortion, Historical Whitewashes and Cultural Myths), pp 234-240, New York: Disinformation.

কলিন ওয়ার্ড, ২০০৪

Collin Ward, *Anarchism: A Very Short Introduction*. Oxford, UK: Oxford University Press.

ক্রপোৎকিন, ১৮৮২

Peter Kropotkin, "Law and Authority", *Le Revolte*, republished in a pdf booklet format by *Zabalaza Books*, Zohanesberg, South Afrika, www.zabalaza.net/zababoo ks, zabalaza@union.org.za.

ক্লেয়ারমন্ট, ১৯৬০

Frederick Clairmonte. *Economic Liberalism and Under-development: Studies in the Disintegration of an Idea*. New York: Asia Publishing House.

চমস্কি, ২০০২

Noam Chomsky, *Understanding Power:The Indispensable Chomsky*. Edited by Peter R. Mitchell and John Schoeffel, New York: The New Press. (Explanatory footnotes available at www.understandingpower.com)

ক্রপোৎকিন, ১৮৮৭

পিওতর ক্রপোৎকিন, "কারাগার কি দরকারি?", (লন্ডন থেকে 'ওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনি' কর্তৃক প্রকাশিত *রুশী ও ফরাসি কারাগারে* গ্রন্থের সমাপ্তি-অধ্যায়, বাংলা অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন) বিধান দাশগুপ্ত (সম্পা.), *অঞ্জলি*: শারদীয় ১৪১৬, ঢাকা: মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি।

নিউটন, ২০০৩

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৩), "বাজারের যুগে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আম্মু-আব্বু-সমাচার অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান মহাজনী মুদ্রণের পলিটিক্যাল ইকোনমি", কামরুল হাসান মঞ্জু কর্তৃক সম্পাদিত *জনপরিসরে গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৪৬৭—৫১২, ঢাকা: ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

নিউটন ২০০৮ক

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৮ক), "আইনের শাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মান", *ওংকার ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্ড়া-অনুশীলন প্রচেষ্টা*। রেজাউর রহমান, সারোয়ার হোসেন সুমন, মেহেদী হাসান প্রান্ড়, মোহাম্মদ আলী রুবেল, রেজাউল পারভেজ, গোলাম রাব্বানী, আরিফ রেজা মাহমুদ এবং রীমা পারভীন কর্তৃক সম্পাদিত ছোটকাগজ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এপ্রিল। (লেখাটি সামান্য সেন্সরকৃত হয়ে দৈনিক *সমকাল* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ১৮ই জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে। অনেক পরে এটি *ওংকার* থেকে

পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল সেলিম মোরশেদ প্রমুখ সম্পাদিত *স্বপ্নের সারসেরা: ছোটকাগজ আন্দোলনের ২৫ বছর* গ্রন্থে (ঢাকা : উলুখড় ছোটকাগজ প্রকাশনা, ২০১০)।

নিউটন ২০০৮খ

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৮খ) "মহামান্য ভয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা"। *বহতা: সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক ছোটকাগজ*। সুকর্ন আহমেদ সম্পাদিত। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পাঠচক্রের প্রকাশনা। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল। (২৩শে আগস্ট ২০০৭ তারিখে প্রথম পাতায় ঘোষণা দিয়েও লেখাটি ভেতরের পাতায় ছাপতে পারেনি *প্রথম আলো* সামরিক সেন্সরশিপের কারণে।)

নিউটন ২০০৮গ

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৮গ) "বিড়ালের জেলখানা"। *অরিত্র*। বিপুল মজুমদার সম্পাদিত। অষ্টম সংখ্যা, জুলাই। রতন সেন পাবলিক লাইব্রেরি, খুলনা।

নিউটন ২০০৮ঘ

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৮ঘ) "কর্তৃত্ব কারাগার দেবরাজ", *কারাগার স্বাধীনতা সৃজনশীলতা* (প্রকাশিতব্য পাণ্ডুলিপি—যন্ত্রস্থ)।

নিউটন ২০০৮ঙ

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৮ঙ) *গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের সহজ পুস্তক*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

নিউটন ২০০৮চ

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৮ঙ), "চিন্তার সংকট: সাহিত্যের স্বাধীনতা: মানুষের মুক্তি — প্রসঙ্গ হাসান আজিজুল হকের কার্তেসীয় পদ্ধতি এবং সাহিত্যে আত্মঘাতী বোমাবাজির প্রবণতা", *কাকতাড়ুয়া*, খুলনা।

নিউটন ২০০৮ছ

সেলিম রেজা নিউটন, "অক্টোবর-মহাসংকট: মাৎস্যন্যায়-পর্ব", http:// www.ukbengali.com/Columns/Col-2008/Col-0806/Col-08 0613-Selim-Reza-Newton-on-October-Crisis-Bangladesh.html, *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন: ১৩ই জুন ২০০৮।

নিউটন ২০০৯ক

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৯ক) "আদর্শ দাসত্ব-মহাগ্রাম"। *শাশ্বতিকী* (মোজাফ্ফর হোসেন সম্পাদিত)। প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। জানুয়ারি। ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নিউটন ২০০৯খ

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৯খ) "সুশীল-সামরিক জরুরি জমানা: প্রচারণা, রাজনীতি আর গণমানুষের গণতন্ত্র"। *কুঁড়েঘর* (রাজ মাসুদ ফরহাদ সম্পাদিত)। ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি। ঢাকা।

নিউটন ২০০৯গ

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৯গ) "ফিরে দেখা ২০০৭" (২০০৭ সালের আগস্ট-বিদ্রোহ নিয়ে নিউটনসহ আরো কয়েক জনের সাক্ষাৎকার), 'যুগান্তর ক্যাম্পাস' পাতা, *যুগান্তর*, শনিবার ১২ই সেপ্টেম্বর।

নিউটন ২০১০ক

সেলিম রেজা নিউটন (২০১০ক) *বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়* (বিডিআর-বিদ্রোহ নিয়ে ক্লাসরুম-পর্যালোচনার অডিও-অনুলিপি)। ঢাকা: যেহেতু বর্ষা।

নিউটন ২০১০খ

সেলিম রেজা নিউটন (২০১০খ) "আগস্ট-বিদ্রোহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা"। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিক্ষক ফোরাম' কর্তৃক ২৩শে আগস্টের 'কালো দিবস' উদযাপন এবং কারানির্যাতিত ছাত্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য নিবেদিত 'সম্মাননা সভা' উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তব্য। কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ২৩শে আগস্ট। (এই লিখিত বক্তৃতাটির পরিবর্ধিত-পরিমার্জিত একটি ভাষ্য "আগস্ট বিদ্রোহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং জেলফেরত শিক্ষক-রাজনীতি" নামে প্রকাশের জন্য যন্ত্রস্থ আছে।)

নেহরু, ১৯৪৬

Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, New York: John Day Company, 1946: 283-299.

মানস, ২০০২

মানস চৌধুরী, "পরিশিষ্ট এক : 'আম্মু-আব্বু সমাচার'-এর পুরাঘালী যৌনময়তা প্রসঙ্গে, সেলিম রেজা নিউটনকে লেখা মানস চৌধুরীর চিঠি, ১৪ আগস্ট ২০০২, "আম্মু-আব্বু-সমাচার" (নিউটন, ২০০৩) রচনাটির প্রকাশিতব্য পরিমার্জিত সংস্করণের 'পরিশিষ্ট এক' হিসেবে সংযোজিত।

মারসত, ১৯৮৪

Afaf Lutfi Al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

হার্টম্যান, ১৯৮৩

Betsy Hartmann and James Boyce. *A Quiet Violence: View from a Bangladesh Village*. London: Zed Books.

সোয়াইন ফ্লু
‘রাংতায় মোড়া যুগের অসুখ’[১]
কাবেরী গায়েন

প্রাক-বয়ান

লেখাটি দুই পর্বে উপস্থাপিত। প্রথম পর্বটি ছাপা হয়েছিল গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক পত্রিকা *মাধ্যম*-এর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায়, *সোয়াইন ফ্লু:‘অতি’-‘মিথ্যা’-তথ্যের মহা-মহামারি* শিরোনামে [এখানে সামান্য সম্পাদিত]। সোয়াইন ফ্লু’র মহাউত্তেজক প্রথম তরঙ্গ সেটি। সোয়াইন ফ্লু’র সেই রমরমা অবস্থানটি ম্রিয়মান অনেকটাই। পাশ্চাত্যে প্রথম তরঙ্গ মিইয়ে এলে দ্বিতীয় তরঙ্গের তোড়জোর শুর“ হয় এবং WHO-র ভবিষ্যত গণনা অনুযায়ী তার অভিঘাত বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে যেনো ভয়াবহ প্রতীয়মান হয়, সেই চেষ্টার চাপিয়ে দেয়া ফলাফল কেমন রূপ নিয়েছে বাংলাদেশে সেই পর্যবেক্ষণটি পেশ করা হলো দ্বিতীয় পর্বে। বলাই বাহুল্য, সেই চেষ্টার ‘তেমন-সফল’ পরিণতি দেখা না গেলেও আয়োজন থেমে নেই, পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় তরঙ্গের রক্ত-পরীক্ষা শুর“ হয়েছে। সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ড় বিনিয়োগ করা পুঁজি নাছোড়বান্দা থাকবেই জানি!

পর্ব-এক ॥ সোয়াইন ফ্লু :‘অতি’-‘মিথ্যা’-তথ্যের মহা-মহামারি[২]

‘আউটব্রেক অব ফিয়ার’

২৬ এপ্রিল ২০০৯, রবিবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অফিসাররা স্বাস্থ্য বিষয়ক জর“রী ঘোষণা দেবার সাথে সাথে, রবিবার বিকালের নিউজ র“মগুলোতে যে ঢিলেঢালাভাব থাকে সেটি যেনো গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ‘সোয়াইন ফ্লু’ জ্বরে কাঁপতে লাগল গোটা মিডিয়া জগত। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেবল চ্যানেলগুলো নিউইয়র্কের মেয়র মিশেল বণ্ডুমবার্গ, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার, সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর ডিরেক্টর রিচার্ড বেসের, এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারী জ্যানেট নেপোলিটানোর নিউজ কনফারেন্স প্রচার করে ফেললো। প্রেসিডেন্ট ওবামার মন্ড়ব্য (‘cause for concern’ not ‘cause for alarm’) বাজানো হলো অবিরত, সব চ্যানেলে, যেনো বা দেশের সোনার ছেলেরা যুদ্ধে যাচ্ছে দেশমাতৃকার সম্মানে, তাদের

[১] কবীর সুমনের গান থেকে নেয়া

[২] ইংরেজি pandemic শব্দের লেখককৃত বাংলা অনুবাদ

চাঙ্গা রাখা চাই। টক শো’র পর টক শো চললো সেই বক্তব্যের নানা দিক নিয়ে। বাদ পড়লেন না হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র রবার্ট গিবস। দিনভর প্রশ্ন করা হলো তাকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কে। প্রশ্নও বলিহারি, যেমন করলেন CBS-এর বিল পণ্ডানেট, “হোয়াট ডিড য়্যু নো, অ্যান্ড হোয়েন ডিড য়্যু নো ইট”?

প্রথম পাতার হেডলাইন, সার্বক্ষণিক কেবল সংবাদ আপডেট, এবং সান্ধ্যকালীন সংবাদের প্রধান শিরোনাম হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশে দেশে। সোয়াইন ফ্লু সংবাদ বিশ্ব গণমাধ্যমের একচেটিয়া প্রধান শিরোনাম হয়ে উঠল, এমনকি বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং মার্কিন উদ্দীপনায় নির্মিত ‘ওয়ার অন টেরোরিজম’ ছাপিয়ে।

উত্তেজক সব সংবাদ ছাপা হতে লাগল। সংবাদপত্রের বড় শিরোনামগুলোর মাত্র কয়েকটির দিকে একটু চোখ দেয়া যাক :

“Flu Fears Spur Global Traige” [Wall Street Journal]
“Nation braces for worst as new strain emerges’ [USA Today]
“US Steps UP Alert as More Swine Flue IS found” [The Washington Post]

“HOG WILD” শিরোনামটির সাথে রয়েছে এক শুকরের ছবি [The New York Post]। শুকরের শুকর- জীবন সার্থক হলো। আমাদের সার্থক হলো চোখ!

আর লন্ডনে, মাস্ক পরা এবং মেশিনগানধারি মেক্সিকান পুলিশের ছবির উপর রবিবারের মেট্রো পত্রিকার প্রধান শিরোনাম, “Swine flu, ‘could kill up to 120m”

একশো কুড়ি মিলিয়ন! লন্ডনের পাতাল রেলে বসা আমার গায়ে কাঁটা দেয় বৈ কি! তাও আবার WHO-র বরাত দিয়ে বলা!

গজিয়ে এবং গাঁজিয়ে উঠল কতক রমরমা শব্দও। স্কটল্যান্ডের এক দম্পতি কানকুন থেকে হানিমুনশেষে ফিরে আসার পর সংক্রমিত প্রমাণিত হলে যে পেণ্ডনে এই দম্পতি দেশে ফিরেছেন, The Daily Record পত্রিকা সেই পেণ্ডনের নামকরণ করল ‘plague planes’। একই পত্রিকা এই শব্দ ব্যবহার করল সংবাদ শিরোনামে “Two more ‘plague planes’ Scots being tested for swine flu” [৬ মে ২০০৯]। আর Scotland on Sunday ব্যবহার করল নতুন শব্দ ‘flu plane’, আর নাটকীয় বটে এই শব্দের ব্যবহার সংবাদ শিরোনামে, ফার্স্ট লিড, “Search for hundreds on flu plane” [৩ মে ২০০৯]।

মিডিয়াকে তপ্ত, জ্বলন্ড়, জীবন্ড় রাখার কতই না মৌলিক চেষ্টা! কত দৃষ্টিকোণই না ব্যবহার করা হলো! মেক্সিকোতে প্রভাব, সবচেয়ে বেশি আক্রান্ড় দেশ, ভ্রমণের উপর প্রভাব, স্টক মার্কেটে প্রভাব, ফেডারেল স্বাস্থ্য বিষয়ক চাকরির ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের শূন্য পজিশনগুলোর অবস্থা কী? মেক্সিকোতে ভিজিট করার সময় বরাক ওবামা কি বিপদে ছিলেন? রিপাবলিকানরা কেন মহা-মহামারি ফ্লুর প্রস্তুতির জন্য উত্থাপিত ৮৭০ মিলিয়ন ডলার বিলকে প্রত্যাখ্যান করলো? গরিব দেশে ছড়ালে কী হবে? আর উত্তরগুলোও কিছু কম মূল্যবান ছিল না। এই যেমন CNN-এর উপস্থাপক টি. জে. হোমস "The Coming Plague" এর লেখক লরি গ্যারেটের সাক্ষাতকার নিলে তিনি জানালেন, "আমাদের অজানা রয়ে গেছে অনেক কিছু"। অন-স্ক্রিন শিরোনাম তখন "Outbreak of Fear"। বটে!

'মিডিয়া-হাইপ' নিয়ে মুখ খুললেন যারা

মিডিয়া হাইপ নিয়ে মুখ খুললেন মিডিয়ার লোকজনই প্রথমে, প্রকাশ্যে। "২৪-ঘন্টা ইন্টারনেট-মিডিয়া-টেলিভিশনের এটা একটা সমস্যা", MSNBC-র প্রেসিডেন্ট ফিল গ্রিফিন-এর ক্ষুব্ধ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন কার্টস [২৮ এপ্রিল ২০০৯], "এটি অবশ্যই একটি বড় সংবাদ এবং এখানে মনোযোগ দিতে হবে। আমি মনে করি, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেনো আমরা অতি কথনের দিকে না যাই এবং জনগণকে মৃত্যুর ভয়ে ভীত না করে তুলি।"

CNN-এর প্রধান মেডিক্যাল প্রতিবেদক সঞ্জয় গুপ্ত মেক্সিকো সিটি থেকে বললেন, কিছু প্রতিবেদন, "যদি ভুলভাবে নেয়া হয়, অযাচিত উত্তেজনার কারণ হতে পারে।" [উদ্ধৃত, কার্টস, ২৮ এপ্রিল ২০০৯]

অনেক মিডিয়া বিশেণ্ডষকই মনে করছেন মিডিয়া সমন্বিতভাবে অতিরঞ্জনের পথ বেছে নিয়েছে। এই বিশেণ্ডষকদের অন্যতম একজন মার্ক ফেল্ডস্টেইন, NBC, ABC এবং CNN-এর সাবেক প্রতিবেদক, বর্তমানে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক। তাঁর মতে, "অবশ্যই জনগণকে ভীত করার জন্য আমরা অতিরিক্ত করছি।" [৩ মে, ২০০৯]

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব কমিউনিকেশন-এর ডিন এবং মিয়ামি হেরাল্ড পত্রিকার সাবেক সম্পাদক টম ফিডলার অতীতের মিডিয়াসৃষ্ট ফ্লু-আতংকের কথা স্মরণ করে মজার মন্ড়ব্য করলেন, " আমাদের প্রবণতা হলো শেষ প্রলয়ের মুখোমুখি হওয়া কিন্তু এযাবতকালে কোন শেষ প্রলয় আমাদের পর্যন্ড় পৌঁছায়নি।" [২৭ এপ্রিল, ২০০৯]

রবার্ট ম্যাকি [১মে, ২০০৯] মিডিয়ার এই বাড়াবাড়িকে বর্ণনা করেছেন চমৎকার এক রূপক দিয়ে, How loudly should a responsible person shout (or whisper) "Possible Fire!" in a crowed theatre? আর ইমার্জেন্সির জন্য প্রস্তুত হতে বলতে থাকা পৃথিবীজুড়ে পাবলিক হেলথ সংস্থাগুলোর আয়োজনকে একই রূপককের সাহায্যে বলছেন তিনি, "they are just whispering loudly, 'Make sure the theatre has fire extinguishers"! ।

এরা সব মিডিয়া বিশেষজ্ঞ । ডা. রন পল, যিনি একজন মার্কিন সিনেটর এবং ১৯৭৬ সালের সোয়াইন ফ্লু প্রপাগান্ডার স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন তিনি CNN-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে [৩ মে, ২০০৯] এটিকে 'non event' Ges 'overblown grossly' হিসেবে বর্ণনা করলেন ।

মিডিয়া-হাইপের বিপরীতে মিডিয়া!

যখন মিডিয়ার প্রতি দোষারোপ জনমনে বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠছে, তখন মিডিয়ার একটি অংশ আবার অ্যান্টি-মিডিয়া অবস্থান নিতে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। বিষয়টি বৃটিশ চিকিৎসক ডা. বেন গোল্ডকেয়ার, যিনি একাধারে কলাম, বণ্ডগ এবং বই লেখেন, বেশ যুৎসইভাবে তুলে ধরেছেন। The Guardian পত্রিকায় [২৯ এপ্রিল, ২০০৯] *Swine flu and hype–a media illness* প্রবন্ধে তিনি জানাচ্ছেন, হঠাৎই মিডিয়া তার সাথে এই মর্মে যোগাযোগ শুর" করল যেনো তিনি বলেন যে সোয়াইন ফ্লু বলে কিছু নেই, সবই মিডিয়ার তৈরি। যে ভাষায় এসব মিডিয়া প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করেছে সেও খুবই কৌতুহলোদ্দীপক:

"Will you come and talk about the media over-hyping swine flu?" [Case Notes on Radio 4]
"We need someone to say it's all been overhyped" [BBC Wales]
"Is the coverage misleading?" [This Week at the BBC]
"We wanted to talk to someone on the other side, you know, challenging the fear factor" [Al-Jazeera English]
"Is it another media scare like SARS and bird flu?" [The Richard Bacon Show on Five Live]

এই প্রবন্ধে এবং The Guardian-এর সাথে সাক্ষাৎকারে ডা. গোল্ডকেয়ার যে ভীতির দিকটি তুলে ধরেছেন সেটি গুর"ত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একের পর এক এ জাতীয় গুজব মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা এতটাই কমিয়ে দিয়েছে যে মিডিয়া এ বিষয়ে কোন তথ্য নিজ থেকে প্রকাশ করতে যে আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন, সেটি হারিয়ে ফেলেছে। আর এর সুদূরপ্রসারী ফলটি আরও ভয়াবহ যেমনটি বলছেন ম্যাকি [১ মে, ২০০৯], যে মিডিয়ার বিষয়টি হয়ে উঠছে অনেকটা মিথ্যাবাদি রাখাল বালকের মতো, আর তাই যেদিন সত্যি এই জাতীয় মহা-মহামারি দরজায় কড়া নাড়বে সেদিন মানুষ অগ্রাহ্য করবে মিডিয়ার ডাক, যেমনটি হয়েছিল হ্যারিকেন ক্যাটরিনার সময়।

MSNBC-র গ্রিফিন এর মতে, "এটি বেশিদিন আগের কথা নয় যে বার্ড ফ্লু সারা পৃথিবী থেকে শত শত মানুষ মেরে ফেলছিল। আমাদের এখন একটু সংযত হওয়া দরকার।"

মিডিয়া কভারেজ বিষয়ে মার্কিন জনগণ দ্বিধা বিভক্ত

সোয়াইন ফ্লু সংক্রান্ড় মিডিয়া কভারেজ নিয়ে খোদ আমেরিকাতেই জনগণ দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ১মে, ২০০৯ আমেরিকা ভিত্তিক জরিপ সংগঠন এধষষঁঢ় পরিচালিত [মোরেলস, ২০০৯] ১,০১২ জন আমেরিকান পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপর এক টেলিফোন জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, শতকরা ৪৫% আমেরিকান মনে করেন যে মিডিয়াতে সোয়াইন ফ্লু'র বিপদ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত তথ্য দেয়া হয়েছে, ৪৬% মনে করেন মিডিয়া কভারেজ মোটামুটি ঠিকই ছিল। মিডিয়া কভারেজ নিয়ে মতামত যাই-ই থাকুক, ৭৯% জন মনে করেন ব্যক্তিগতভাবে তার বা তার পরিবারের সদস্যদের সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ড় হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মাত্র ৪% মনে করেছেন খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। ফ্লুর বিপদ সম্পর্কে আতংক ৩০ এপ্রিল ছিল সর্বোচ্চ, এসময় ২৫% মানুষ মনে করেন যে ব্যক্তিগতভাবে তারা ভীত, কিন্তু ৫ এপ্রিলের মধ্যে এই সংখ্যা নেমে আসে ১৭% এ।

টেক্সাসে, ৩০ এপ্রিল, ফোর্ট ওয়ার্থের সব স্কুল বন্ধ করার পর এবং আশি হাজার ছাত্রকে বাড়ি পাঠানোর পর গভর্নর রিক প্যারির মন্ড়ব্য, "মিডিয়া-হাইপের কারণে স্টেটের সমস্যা আরো বেড়েছে।" বেচারা! মিডিয়াকে চটাতেও পারেন না!

তবে কেবল প্রচলিত মিডিয়ায় নয়, ফ্লুর গল্প ছড়িয়েছে অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে আরো অনেক বেশি। মিডিয়া রিসার্চ প্রতিষ্ঠান Nielson Online এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী সকল টুইটার মেসেজ এর দুই শতাংশের বেশি ছিল সোয়াইন ফ্লু সংক্রান্ড়। এবং অতীতেও দেখা গেছে যে অ্যাভিয়ান ফ্লু এবং সার্স নিয়ে সংবাদপত্রের পাতায় মহা-মহামারির আতংক দূর হতে সময় নিয়েছে অনেক।

এ-তো গেল মিডিয়ার বাড়াবাড়ি। প্রশ্ন হলো মিডিয়া কি সঠিক তথ্যটি পৌঁছে দিতে পেরেছে মানুষকে? নাকি কেবলই 'প্যানডেমিক অব [মিস]ইনফরমেশন'?।

পরিস্থিতি কতটা স্পষ্ট করেছে এই তথ্য 'মহা-মহামারি'?

অনিশ্চিত বা জর"রি পরিস্থিতিতে মানুষ মিডিয়ার দ্বারস্থ হয় সেই উদ্বেগ থেকে মুক্তির জন্য। এটি একদিকে যেমন গণমাধ্যমের প্রাথমিক কাজের মধ্যে পড়ে আবার সান্দ্রা বল-রকেশ এবং মেলভিন ডিফ্লারের [১৯৭৬] এর মিডিয়া সিস্টেম ডিপেন্ডেসি থিওরিরও মূল কথা এটাই।

The Times পত্রিকার মনিকা ডেভি'র [১মে ২০০৯] মতে, ইনফ্লুয়েঞ্জা বিষয়ে অনভিজ্ঞ বহু মানুষ জানিয়েছেন এসব প্রতিবেদন বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সংশয় বাড়িয়েছে শুধু। অনেকেই বিষয়টিকে মিডিয়ার 'over-hyping' করার অভিযোগ করেছেন।

রবার্ট ম্যাকির [১মে, ২০০৯] মতে, তথ্য প্রচারের বেগ বাড়ার সাথে সাথে জনগণ তথ্য-ভারাক্রান্ড় হয়ে পড়ে এবং ঠিক কতটুকু হুমকির মধ্যে তারা আছে সেই বিষয়টি স্পষ্ট না করতে পারার জন্য মিডিয়াকে দোষারোপ করা শুর" হয়।

Carl N. নামের এক পাঠক [৩০ এপ্রিল ২০০৯] রবার্ট ম্যাকি'র বণ্ঢগের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন:

> "আমি বুঝতে পারি না। আমাদের এত উৎকণ্ঠিত হতে হবে কেন? প্রতিবছর ইনফ্লুয়েঞ্জায় হাজার দশেক মানুষ মারা যায়! মিডিয়া কি এটি বোঝে? কেন তারা প্রতিটি কেসে [এমনকি যদি মারাত্মকও না হয়] এমন প্রতিক্রিয়া দেখায় যেনো আমরা বুবনিক পেণ্ঢগে আক্রান্ড় হতে চলেছি?"

একই দিন, একই বণ্ঢগে CB নামের আরেকজন পাঠক মন্ড়ব্য করেছেন:

> এই ফ্লু এত মনোযোগ কেন পাচ্ছে? মেক্সিকোর ঝুঁকিপূর্ণ পকেটগুলো বাদ দিলে, একে তো গতানুগতিক ফ্লু'র চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়না। এমনকি মেক্সিকোর পরিসংখ্যানও যেভাবে গুটিয়ে আসছে সেখানেই যে খুব খারাপ কিছু হচ্ছে সে বিষয়েই বা নিশ্চিত হই কীভাবে? …CDC এবং WHO কি আসলেই কোন খারাপ কিছুর জন্য অনুশীলন করছে? প্রকৃত সংখ্যার বিপরীতে যে পরিমাণ আতংক জমা হয়েছে তা খুবই অনভিপ্রেত।
>
> [অনুবাদ লেখকের]

মজার বিষয় হলো, এই প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে এই ভাইরাসের উৎপত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য নিতে গিয়ে ক্রমাগতভাবে 'হতে পারে', 'হয়তো', 'সম্ভবত' জাতীয় শব্দের তোড়ে মূল তথ্য যে কী সেটি আবিস্কার করা বেশ আয়াসসাধ্যই হয়ে উঠেছে। এমনকি WHO-র অফিসিয়াল তথ্য অনুযায়ী [২৩ মে ২০০৯] :

H1N1 ভাইরাসের উৎপত্তি অ্যাভিয়ান ফ্লু হিসেবে যা 'হয়তো' শূকরকে আক্রান্ড় করেছে। এটি 'হয়তো' এশিয়ায় সংঘটিত হয়েছে। তারপর এই ভাইরাস 'হয়তো' পাখিতে সংক্রমণ ঘটিয়েছে এবং মেক্সিকোতে আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে এটি আবার শুকরকে সংক্রমিত করেছে। 'সম্ভবত' শুকর সংক্রমিত হয়েছে মানব ফ্লু দিয়ে এবং যখন অ্যাভিয়ান ফ্লু শুকরকে সংক্রমিত করেছে তখন একটি নতুন ফ্লু ককটেল তৈরি হয়েছে যার কোন অভিজ্ঞতা মানব শরীরে নেই এবং এভাবে এই ফ্লুটি অপরীক্ষীত থেকে যায় এবং মৃত্যু ঘটায়।

[অনুবাদ এবং ব্যবহৃত বন্ধনী কমা লেখকের]

সবশেষে জেনিভা মিটিং-এ [১৮ মে, ২০০৯] WHO পরিষ্কারভাবে বলেছে, "এই ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কে মাত্র একটি বিষয়ই নিশ্চিত যে কোন কিছুই নিশ্চিত নয়।" এবং শেষ করেছে এভাবে যে "কত দ্রুততায় এই নতুন ভাইরাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হবে কী না, সেটি নিশ্চিত নয়।"

কিন্তু তারপরও WHO পূর্বাপর ভয়ের কর্তৃত্ব জারি রাখে এই বক্তব্যে যে, যদি মহা-মহামারি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে প্রতিষেধক, যেমন টীকা, দেয়া হবে। কিন্তু সরবরাহ চাহিদাকে মেটাতে পারবে না এবং মেডিক্যাল সুবিধা অপ্রতুল হয়ে পড়বে এবং পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা কমে যাবে যা অর্থনীতিকে ভয়াবহভাবে প্রভাবিত করবে। যখন অর্থনীতির অবনতি ঘটে তখন জনস্বাস্থ্য'র অবনতি ঘটে।

সুতরাং অস্পষ্টতার দায় শুধু মিডিয়ার নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারও রয়েছে গভীর যোগ এবং এই আলোচনাতে আমাদের ফিরতেই হবে।

ফলাফল? মেক্সিকো কার্যত পাঁচদিন বন্ধ হয়ে গেল!

মিডিয়ায় ভয়ের ভাঙনের সাথে [আউটব্রেক অব ফিয়ার] যখন পন্ডিতেরা বিতর্কে রত টক-শো, সংবাদত্রের কলাম, বণ্ঢগ, YouTube আর Twitter-এ তখন প্রকৃতপক্ষে ১মে থেকে পাঁচদিন মেক্সিকোর উত্তর অংশ কার্যত বন্ধ থাকল। বন্ধ থাকল স্পোর্টস এবং থিয়েটার। আর্থিক ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ এখনো নিরূপণ করা হয়নি, তবে যখন মেক্সিকো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, কেবল কিছু ইভেন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তখন AP-র রিপোর্ট অনুযায়ী [২৮ এপ্রিল ২০০৯] মেক্সিকো সিটি একা ইভেন্ট বাতিল এবং বাণিজ্য বন্ধের কারণে প্রতিদিন হারাচ্ছিলো ৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই হারানোর বেদনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রবার্ট ম্যাকি'র বণ্ঢগে ক্রিশ্চিয়ান মারসেলো [১মে ২০০৯] নামের এক মেক্সিকানের প্রতিক্রিয়ায়:

> আমি মেক্সিকোর মনটেরেতে বাস করি এবং বিশ্ব মিডিয়া অনুধাবন করতে পারেনি মেক্সিকোর অর্থনীতিতে কী নিষ্ঠুর প্রভাব তারা রাখলো। এ পর্যন্ড় এই ফ্লু-র কারণে মাত্র ১২জন মারা গেছে, ১২ জন! সিজনাল ফ্লু প্রতিবছর ৩০হাজারের বেশি

> মানুষকে মেরে ফেলে। আমি মনে করি এই মিডিয়া হাইপের কারণে উদ্ভুত অর্থনৈতিক অবস্থা মেক্সিকোর সামাজিক কাঠামোতে কী প্রভাব ফেলবে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের সে ব্যাপারেই বেশি উদ্বেগ থাকা প্রয়োজন। এটি খুবই আশ্চর্য যে আজ পর্যন্ড় ক্যানকুন, পণ্ড্যায়া ডেল কারমেন, পুয়ের্টো ভালণ্ঢার্টা, কারবো সান লুকাসে কোন কেস শনাক্ত হয়নি অথচ হঠাৎই সবাই তাদের ভ্রমণ বাতিল করে দিলো এবং 'ঘাতক ভাইরাস'-এর ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়ে গেলো। একটি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় রত অর্থনীতির উপর এর ফলাফল ভয়াবহ। [অনুবাদ লেখকের]

শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, এবং শুধু মেক্সিকো নয় ভয়ের বিস্ড়ার থেকে অনেক অদ্ভুত আচরণ ঘটেছে পৃথিবীর নানা দেশে।

স্কটল্যান্ডের এক দম্পতি কানকুন থেকে হানিমুনশেষে ফিরে আসার পর সংক্রামিত প্রমাণিত হবার পরে সেই শহরের স্কুলগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। স্কটিশ ছাত্র-ছাত্রীরা এই উপলক্ষ্যে পরিচিত হলো "quarantine rooms" নামের এক নতুন ব্যবস্থার সাথে, সম্ভাব্য ফ্লু আক্রান্ড় ছাত্রছাত্রীদের আলাদা পরীক্ষা নেবার জন্য এই ব্যবস্থা, যেমনটা জানিয়েছেন মস আর ম্যাকলালিন [৬ মে ২০০৯]। এমনকি সরকার পরীক্ষা ছাড়াই জিসিএসইসি পরীক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেবার পরিকল্পনাও করে ফেললেন।

দেশে দেশে মাস্ক আর জীবানুরোধক ওয়াইপের ব্যবহার রাস্ড়াঘাটে সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হলো। মাস্কপরা মিলিশিয়া স্টেনগান হাতে টহল দিতে লাগল রাস্ড়ায় আর বিশ্ব গণমাধ্যমে সেসব প্রথম পাতা-প্রথম শিরোনাম হয়ে উঠল।

১ মে ২০০৯ এশিয়ার প্রথম নিশ্চিত কেস শনাক্ত করা হয় হংকং-এ, একজন মেক্সিকান ট্যুরিস্ট যিনি তখন হংকং ভ্রমণে এসেছিলেন তার দেহে। ২০০৩ সালে SARS এবং পরে এভিয়ান ফ্লু-র কারণে যে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে সেকথা বিবেচনায় নিয়ে হংকং সরকার এবার আর কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। সেই ট্যুরিস্ট যে হোটেলে অবস্থান করছিলেন সেই হোটেলের ২০০ অতিথি এবং ১০০ কর্মচারিসহ গোটা হোটেলটিকে সিল করে ফেলা হলো।

যুক্তরাজ্য সরকার সোয়াইন ফ্লু বিত্তান্ড় পৌছে দেবার জন্য ঘরে ঘরে বিতরণ করল পুস্ড়িকা । টেক্সাসের মেয়রকে ৮০ হাজার ছাত্রকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হলো। কিন্তু যে তথ্যের জন্য এত তোলপাড়, প্রশ্ন উঠেছে খোদ সেইসব তথ্যকে নিয়েই।

সোয়াইন ফ্লু কভারেজ : 'অতি-তথ্য' নাকি 'ভুল-তথ্য'র মহা-মহামারি (?)

সোয়াইন ফ্লু কভারেজ নিয়ে যে বিতর্কটি এখন সচল আছে তা হলো মিডিয়া কি 'অতি-তথ্য' দিয়েছে নাকি 'ভুল-তথ্য' দিয়েছে? বিতর্কটি ফয়সালা করা যাবে না সম্পূর্ণভাবে, তবে যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে দুটি আন্ড়সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে।

প্রশ্ন এক : সোয়াইন ফ্লু কি ভীতিকর?

সোয়াইন ফ্লু বা H1N1 এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা যা নতুন, এবছর মধ্য-এপ্রিল থেকে এর উপদ্রব দেখা গেছে । প্রথমে মেক্সিকোতে। ইনফ্লুয়েঞ্জার ধরনটি নতুন বলেই মানুষের শরীরে এর কোন প্রাকৃতিক সুরক্ষা নেই এবং সংক্রমণের হারও অনেক 'দ্রুত'। ফলে অচিরেই এটি মহামারি [epidemic] নাম ধারণ করলো। পরে এই রোগের প্রকোপ অন্যান্য দেশেও দেখা গেলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা [WHO] বিশ্ববাসীকে সম্ভাব্য মহা-মহামারির [pandemic] সতর্ক বার্তা প্রচার করলো। মহা-মহামারি বা pandemic হলো সোজা কথায় যে কোন রোগের বিশ্বব্যাপী মহামারি। একুশ শতকের বাস্ড়বতায় যে কোন সংক্রামক রোগের দ্রুত এবং জটিল বিস্ড়ার সম্ভব প্রধানত দুই কারণে।

প্রথমত, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে আন্ড়র্জাতিক ফ্লাইট যা সহজেই দেশ থেকে দেশে বা মহাদেশ থেকে মহাদেশে দিনে দিনেই পৌছে দিতে পারে সংক্রমিত মানুষকে।

দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান শহরায়নের কারণে উদ্ভূত ঘনবসতি যেখানে কয়েকজন সংক্রামিত হলেই স্নো-বল প্রতিক্রিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে মানুষের মধ্যে।

তৃতীয় আরেকটি বিষয় ভয়ের আগুনে উস্কানি দিয়েছে। অদ্ভুত যে, এই সংক্রমণ মূলত দেখা গেছে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারি এবং ৬০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে। এই বিষয়টি আসলে ১৯১৮ সালের স্প্যানিস ফ্লু-কে সামাজিক স্মরণে [social memory] নিয়ে আসে। ১৯১৮ সালের স্প্যানিস ফ্লু-তে সারা পৃথিবীতে ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল। স্প্যানিস ফ্লু-ও আঘাত হেনেছিল মূলত ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারি এবং ৬০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে।

এই তথ্যের মধ্যে নিশ্চিত ভয় আছে। মূলধারার গণমাধ্যম যেহেতু WHO নির্দেশিত এই তথ্যকেই কম-বেশী প্রচার করেছে এবং সেখান থেকে যেহেতু ভয় ছড়িয়েছে, কাজেই অতি রঞ্জনের দায়ে দায়ী করা গেলেও সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের দায়ে সম্ভবত মিডিয়াকে এককভাবে দায়ী করা যায় না, কারণ সে দায় মূলত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র। তবে তথ্য যা প্রচারিত হয়েছে তা ভুল এবং মিথ্যা দুয়ের

সংশিণ্টষ্ট দ্রবণ। বিশেষ করে আমরা যখন মিলিয়ে দেখবো প্রচারিত তথ্যের সাথে বাস্ড়ব অবস্থার।

প্রশ্ন দুই : প্রচারিত এবং প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতি কি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

এই 'মহা-মহামারির' প্রথম পর্বের সবশেষ অবস্থা WHO আলোচনা করছে ১৮ মে ২০০৯ তারিখে, জেনেভায়। WHO-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৮ মে ২০০৯ তারিখে ৪০টি দেশ অফিসিয়ালি ৮৮২৯ টি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত কেসকে নিশ্চিত করেছে। যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নিশ্চিত কেসের সংখ্যা জানিয়েছে তারা হলো: যুক্তরাষ্ট্র ৪৭১৪, মেক্সিকো ৩১০৩, কানাডা ৪৯৬, জাপান ১২৫, স্পেন ১০৩, এবং যুক্তরাজ্য ও উত্তর আয়ারল্যান্ড ১০১। এই ছয়টি দেশ একসাথে ৯৭.৯% নিশ্চিত কেসকে শনাক্ত করেছে। এসব শনাক্তকৃত রোগীর মধ্যে এপর্যন্ড় মারা গেছেন ৭৪ জন, যাদের ৬৮ জনই মেক্সিকোর।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রমণের প্রভাব খুবই মৃদু এবং ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ। যাই হোক, এই প্রবন্ধ লেখার সময় [২৩মে, ২০০৯] মৃতের সংখ্যা ৮৫ এবং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষীত নিশ্চিত কেসের সংখ্যা ১১,০৩৪।

প্রচারের নাটকীয়তা যে পর্যায়েই পৌছাক না কেন প্রকৃত অবস্থা হলো সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ড়ের মোট সংখ্যা বেশিরভাগ দেশে নানা ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ড় বার্ষিক সংখ্যার চেয়ে অনেক কম, এমনকি তুলনীয় নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, CDC (২০০৯) তথ্য অনুযায়ী ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোনিয়ায় মারা গেছে প্রতি এক লক্ষে ৬৮.৮ জন। শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায় গড়ে প্রতিবছর ৩৬,০০০ মানুষ। আর কার্ডিও ভাসকুলার রোগে (হার্ট অ্যাটাকে মৃতের সংখ্যা এখানে ধরা হয়নি) মারা যাওয়ার সংখ্যা আরো অনেক বেশি, প্রতি এক লক্ষে ৪৪১.৮ জন। এ পর্যন্ড় যুক্তরাষ্ট্রে সোয়াইন ফ্লু'তে মৃতের সংখ্যা চার, ভারতে এক এবং বাংলাদেশে একজনও নেই [২৫ মে ২০০৯-এর হিসাব এটি]। কিন্তু এখানে একটি বিষয় উলেণ্টখ করতেই হয় যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তিরা অন্য রোগে আক্রান্ড় ছিলেন। কাজেই এসব মৃত্যুর মূল কারণ কোনটি সেটি নিয়েই তীব্র বিরোধ থেকেই যাচ্ছে।

কিছু কিছু মৃত্যু শুর"তে ঢালাওভাবে সোয়াইন ফ্লু জনিত কারণে প্রচার করা হলেও পরবর্তীতে সেই দাবি থেকে সরে আসতেও দেখা দেখা গেছে। যেমন, মেক্সিকোর অফিসিয়ালরা ১মে ২০০৯ তারিখে H1N1 ফ্লু জনিত কারণে মৃতের সংখ্যা পূর্বঘোষিত ১৭৬এর জায়গায় ১০১জনে নামিয়ে আনে এবং জানায় যে ভাইরাসটিকে যত মারাত্মক মনে করা হয়েছিল তেমন মারাত্মক নয়। এমনকি টেক্সাসের যে মৃত নারীকে H1N1 ফ্লু জনিত কারণে মার্কিন মুলুকের প্রথম মৃত বলে দাবি করা হয়েছিল পরে জানা যায় যে তিনি আসলে আরো অনেক জটিল রোগে আগে থেকেই ভুগছিলেন। সেসব পর্ব শেষ হয়েছে, এমনকি মেক্সিকোতে

পর্যন্ড় উদ্বেগের স্কেল নাম্বার থেকে নামিয়ে এখন সম্পূর্ণ সবুজ, নতুন কোন কেসের খবর পাওয়া যায়নি ২১মে ২০০৯ এর পর থেকে।

H1N1-তে আক্রান্ড়দের অবস্থা যত খারাপ হবে মনে করা হয়েছিল বাস্ড়বে এই রোগের প্রকোপ সেই তুলনায় বড় বেশি মৃদু। স্কটল্যান্ডের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার হ্যারি বার্ণস-এর মতে [উদ্ধৃত, ফস্টার ও পিটারকিন, ২ মে ২০০৯], "এ পর্যন্ড় রোগের যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়না এটি শীতকালীন ফ্লু'র চেয়ে মারাত্মক কিছু।"

এসব পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে সোয়াইন ফ্লু আর যাই হোক, মহামারিও হয়ে উঠতে পারেনি, মহা-মহামারি তো অনেক পরের কথা। একইসাথে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে মিডিয়ার অতি-তথ্যের দায় WHO-র উপরও সমানভাবেই বর্তায় কিংবা আরো মৌলিকভাবে।

এবং সোয়াইন ফ্লু'র প্রথম পর্বের শেষদিকে, WHO ভয়ের আবহ এই মর্মে জারী রেখে দেয় যে, ক) H1N1-র শক্তি সময়ে বেড়ে যাবে ফলে এখন যদিও প্রভাব মৃদু কিন্তু এখন থেকে ছয়মাস পরে কী ঘটবে সেটি অনিশ্চিত। খ) এযাবতকালে ফ্লু'র বিস্ড়ার ঘটেছে উত্তর গোলার্ধে যেখানে সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা দুটোই অনেক শক্ত পাটাতনে দাঁড়ানো। কিন্তু এই ফ্লু'র বিস্ড়ার যদি ঘটে দক্ষিণ গোলার্ধে যেখানে সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা দুটোই অনেক দুর্বল তখন পরিস্থিতি কী ভীষণ হবে!

এই ভয় এবং অজানা আতঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বের মানুষ সমাধান পেতে চায়। এবং এভাবেই বিষয়টি বৈধতা পায় যে WHO তার সকল শক্তি প্রয়োগ করবে পৃথিবীব্যাপী এক উদ্বেগের ঢেউ ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে এবং অনেক দেশের আগ্রাসী নীতিকে সমর্থনের। এইসব আগ্রাসী নীতির মধ্যে রয়েছে, যেমন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে, আক্রান্ড় ব্যক্তি এবং তাদের যোগাযোগে থাকা ব্যক্তিদের নির্বাসিত রাখা, কিংবা মেক্সিকোতে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যেনো অনেক মানুষ একত্রিত না হতে পারে। পর্যটক-নির্ভর কানকুনকে কার্যত বন্ধ রাখা হলো বার এবং রেস্টুরেন্ট বন্ধ রেখে যেনো মানুষ যোগাযোগ না করতে পারে এবং ফলে রোগের বিস্ড়ার বন্ধ রাখা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, WHO এবং মিডিয়ার, যৌথ কিংবা একক প্রয়াসে, এই অতিতথ্যের অতিপ্রচারণার কারণ কী? শুধুই কি বিশ্ববাসীকে সচেতন, সতর্ক করা নাকি থাকতে পারে আরো কোন গভীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য? বিভিন্ন রাষ্ট্রই বা এসব আগ্রাসী কর্মসূচী কেন নিচ্ছে? সে আলোচনায় যাবার আগেই

কিংবা বলা ভালো সেই আলোচনা উত্থাপনের জন্যই কতক বিকল্প হাইপোথেসিস বা প্রতি-অণুকল্পের এর দিকে আলোক পাত করতে চাই।

হাওয়ায় ভাসছে যেসব প্রতি-অণুকল্প

বিশ্ব রাজনীতির এমন এক কালপর্বে এই সোয়াইন ফ্লু কোলাহলটি সংঘটিত হলো এবং সমস্ড় আয়োজনের মুখোশ এমন মুখব্যদান করল যে একাধিক বিকল্প হাইপোথেসিস বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন হাইপোথেসিস। বলাই বাহুল্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এসব হাইপোথেসিসের প্রাণভোমরা।

অণুকল্প-১ : বিশ্ব মহামন্দা থেকে দৃষ্টি ফেরানো

সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হাইপোথেসিস এটি। বিশেষ করে ডা. রন পল, যিনি একজন মার্কিন সিনেটর এবং ১৯৭৬ সালের সোয়াইন ফ্লু প্রপাগান্ডার স্বরূপক উন্মোচন করেছিলেন তিনি এই মতের সবচেয়ে প্রবল প্রবক্তা। এ বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করে Youtube- এ ছেড়েছেন, যা প্রচুর আলোচনার ঝড় তুলেছে। CNN-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে [৩ মে, ২০০৯] তিনি এই সোয়াইন ফ্লু'র আবির্ভাবকে ১৯৭৬ সালের সোয়াইন ফ্লু প্রপাগান্ডার সাথে তুলনা করে এটিকে 'non event' Ges 'overblown grossly' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য বজায় রাখার কৌশল। টম ফিল্ডারও একই মত পোষণ করেছেন CNN-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে [৩ মে, ২০০৯]।

অণুকল্প-২ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তহবিল বাড়ানোর মরিয়া চেষ্টা

এই দৃষ্টি আকর্ষণ হাইপোথেসিসের প্রবক্তাদের মতে, যেহেতু বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার মধ্য থেকে যাবার কারণে NGO সেক্টরে আগের মতো অর্থ প্রদান করতে সক্ষম নয়-জাতিসংঘ থেকে তহবিল আদায়ে এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি আর কী হতে পারতো? যদিও অত্যন্ড় সমালোচিত, কিন্তু ডোশি [২০০৫] দেখান যে মার্কিন ইনফ্লুয়েঞ্জা পরিসংখ্যান যত না বিজ্ঞান তার চেয়ে অনেক বেশি জনসংযোগ। কাজেই ইনফ্লুয়েঞ্জা পরিসংখ্যান নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষে খুব কঠিন নাও হতে পারে।

অণুকল্প-৩ : মিডিয়ার 'feeding frenzy'

"২৪-ঘন্টা ইন্টারনেট-মিডিয়া-টেলিভিশনের এটা একটা সমস্যা", যেমনটি বলেছিলেন MSNBC-র প্রেসিডেন্ট ফিল গ্রিফিন সোয়াইন ফ্লু হাইপের শুর"তেই, "কেবল্ নিউজকে ২৪ ঘন্টা পূর্ণ করতে হয়, এবং ২৪ ঘন্টার উত্তেজক সংবাদ সবসময় থাকে না। জনগণকে ভীত করতে পারলে তারা আকৃষ্ট হবে।" [উদ্ধৃত, কার্টস, ২৮ এপ্রিল ২০০৯]। বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা কিংবা 'ওয়ার অন টেরোরিজম' সংবাদ হিসেবে গণ্যামার হারিয়েছে। বিশ্ব মহা-মহামারির সম্ভাবনা মিডিয়ার জন্য অত্যন্ড় উদ্দীপনামূলক হয়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। সমস্যা হলো মাত্রাটা ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি। অবশ্য ফিল্ডার-এর মতে [৩ মে ২০০৯], এই জ্বরের খবর প্রমোট করার ক্ষেত্রে মিডিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত।

অণুকল্প-৪ : হয়তো মে·িকোতে তেমন কোন ঘটনা ঘটেইনি

মেক্সিকোর রোগ নির্ণয় পদ্ধতি উন্নত দেশগুলোর মতো দক্ষ নয়। হতে পারে যে মহামারির কোন ঘটনাই ঘটেনি, মহা-মহামারি তো দূরের কথা। যেহেতু এই রোগ একেবারেই নতুন তাই অসম্ভব নয় যে হয়তো তাদের এমন কোন নিরূপক যন্ত্র ছিল না যা নির্ধারণ করতে পারে যে এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার বেশি কী না। কারণ কতজন আসলেই আক্রান্ড় হয়েছে সেটি মেক্সিকো এখনও বের করতে পারেনি। এবং শুর"তে তারা যে মৃত্যুর পরিসংখ্যান দিয়েছিল সেখান থেকে নিজেরাই সরে গেছে।

অণুকল্প-৫ : মে·িকোর অর্থনীতিকে ধ্বংস করার মার্কিন ষড়যন্ত্র

মূলত মেক্সিকোর অধিবাসি এবং বণ্ঢগে এই ধারণার জোর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু জাতিসংঘের প্রধান দাতা এবং সেই অর্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারও। সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে বর্ধিষ্ণু মেক্সিকোর অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে। একই সাথে তাদের যুক্তি মার্কিন অর্থনীতি কম বেতনে নিয়োগ করা মেক্সিকোর সার্ভিস শ্রমিকদের উপর বড় রকমের নির্ভরশীল। মেক্সিকো এবং মার্কিন শ্রমিকদের মধ্যে বেতন বৈষম্য জিইয়ে রেখে মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য মেক্সিকোর অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে থামিয়ে দেয়া যেমন জর"রী, আমেরিকা সে কাজ করার জন্য যথেষ্ট চতুরও বটে। আর পৃথিবীও সাক্ষী 'weapon of mass destruction'-এর নামে মিডিয়া উন্মত্ততা সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ঝাপিয়ে পড়েছিল ইরাকের উপরে।

এ 'মহা-মহামারি' বিশ্ব পুঁজিবাদের

দুনিয়া কাঁপানো দশদিন লিখেছিলেন জন রিড। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপণ্ঢবের প্রেক্ষাপটে মার্কিন এই সাংবাদিকের লেখা বইটি রাশিয়ার বিপণ্ঢবকালীন সময়কার বিশ্বস্ড় দলিল হয়ে আছে। আর এবার বিশ্বের তাবৎ গণমাধ্যম মিলে দশদিনে বানালো এক সোয়াইন ফ্লু দলিল, মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কের অনিশ্চয়তাকে পুঁজি করে ভীতির বিস্ড়রই যার মূল উদ্দীপনা বলে এখন পর্যন্ড় মন্ড়ব্য করা চলে। সোয়াইন ফ্লু সংক্রান্ড় তথ্যের দাপটে বিশ্ব ভাসলো দশ দিন। ২৬ এপ্রিল ২০০৯ থেকে ৫ মে ২০০৯। *দুনিয়া কাঁপানো দশদিন* যদি হয় সাংবাদিকতার অহংকারের ইশতেহার, আক্ষরিক অর্থেই তথ্যের পণ্ঢাবন বইয়ে দেয়া সোয়াইন ফ্লু'র দশদিন গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতার কলঙ্কের দলিল, যে দুঃস্বপ্নের কথা মিডিয়ার লোকজন ভোলার জন্য তোড়জোড় চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে 'অতি-তথ্য', 'মিথ্যা-তথ্য' আর 'অতি-প্রচার'-এর দায়ভাগ মিডিয়ার উপরে যতটা পড়ল, মিডিয়াকে যারা চালনা করলেন তাদের উপর তেমন একটা পড়ল না। WHO মোটামুটি মান বাঁচিয়ে চলে গেলো। কার প্রণোদনায় তবে মিডিয়ার এই নাচার অবস্থা? নাকি পুঁজি-ক্ষমতা-মিডিয়ার এটি এক লোকদেখানো বেণ্ঢমগেম, যে বেণ্ঢমগেমে এবার বলি হয়েছে মিডিয়া? এই ডামাডোলে জিতলো কে? ক্ষতিগ্রস্ড়ই বা হলো কে?

এই লেখাটি তৈরি করতে গিয়ে মূলধারার গণমাধ্যম এবং বেশকিছু নতুন সামাজিক মাধ্যমের আধেয় পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে নেয়া দরকার। সোয়াইন ফ্লু সংক্রান্ড় যাবতীয় তথ্য প্রচারিত হয়েছে তিন পদ্ধতিতে।

প্রথমত, অফিসিয়াল। WHO, CDC –র প্রেস কনফারেন্স।
দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকতা—মূল ধারার মিডিয়া।
তৃতীয়ত, নতুন সামাজিক মাধ্যম-বণ্ঢগ, টুইটার, ফেসবুক, ইন্টারনেট।

অফিসিয়াল এবং মূল ধারার মিডিয়া সাংবাদিকতার মধ্যে রয়েছে এক মিথোজীবিতার সম্পর্ক। অর্থাৎ মূল ধারার মিডিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে, স্বাধীন নয়। এই মিথোজীবিতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় ওয়াশিংটন পোস্ট-এর স্টাফ লেখক হাওয়ার্ড কার্টস-এর এক মন্ড়ব্যে [২৮ এপ্রিল ২০০৯]: "কর্তৃপক্ষ মিডিয়াকে এসব নিউজ সরবরাহ করছে দেখানোর জন্য যে, তারা তৎপর।" অন্যদিকে নতুন সামাজিক মাধ্যমগুলো স্বাধীন কিন্তু তারাও গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য কিংবা শ্রেণী চরিত্র দিয়ে প্রভাবিত। এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুই পক্ষেরই মূল প্রবণতা ছিল মোটামুটি অযৌক্তিক। যে যে অবস্থানই নিক,

অবস্থানটি মূলত বাড়াবাড়ির। এটির ভয়ের দিক হলো তৈরি হয়েছে এক সামগ্রিক সূত্রহীনতার, যা প্রচার করছে হয় পরিকল্পিত কাঠামোবদ্ধ মিথ্যার অথবা জন্ম দিচ্ছে হয় সংঘবদ্ধ কিংবা ব্যক্তিক নৈরাজ্যের। তৈরি হচ্ছে প্রপাগান্ডা, প্রতি-প্রপাগান্ডা, কিংবা ইতিবাচকভাবে বললে বিকল্প হাইপোথেসিস। জন্ম নিচ্ছে বিশ্বাসহীনতার সংস্কৃতি। সাধারণ মানুষ যাদের বেছে নেবার মতো বিকল্প নেই তারা যখন রাষ্ট্র বা মিডিয়ার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে আর ভরসা করতে পারছে না তখনই তৈরি হচ্ছে হয় হতাশা নয়তো নেতি।

এই নৈরাজ্যের কথাই বোধহয় ড্যানিয়েল বেল [১৯৮৪] বলেছেন পোস্ট-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে, যখন মানুষের অভিজ্ঞতা আর আধুনিক জীবনের জটিল এবং টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধানে কাজে আসবে না, মানুষ যুক্তির চেয়ে অলৌকিকে সমর্পিত হবে। পার্থিব ভালোত্ব আর অর্জনের পেছনে যে মূল্যবোধ বিরাজিত থাকার কথা সেসব প্রশ্নবিদ্ধ কিংবা উপেক্ষিত হবে। এই সুযোগে ত্বরান্বিত হবে বাণিজ্য। কোহেন কথিত 'মরাল প্যানিক'-এর উপর গড়ে উঠবে সেই বাণিজ্য। কখনো রাস্ট্র কেবল প্রতিক্রিয়া করবে তার উপর চাপানো 'মরাল প্যানিক'-এর।

আর তাই বোধহয় আমরা দেখি এই ক্রমশ বেড়ে যাওয়া উদ্বেগের বাণিজ্যিক ফলাফল। সোয়াইন ফ্লু পৃথিবী জুড়ে বহু দেশেই খুব গুরুত্বের সাথে 'বিবেচিত' হচ্ছে, প্রকৃত তথ্য জানা সত্ত্বেও। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা A[H1N1]-র টীকা তৈরির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সচিব ক্যাথলিন সেবেলিয়াস ১.১ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছেন।

এই 'মহা-মহামারি'র উপজাত হিসেবে বিভিন্ন টিকা [যার কার্যকারিতা এখনও অপ্রমাণিত] এবং Tamiflu-র দাম বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এডিনবরা আর গণ্ঢাসগোর প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে Tamiflu প্রায় সাত গুণ চড়া দামে বিক্রি হয়েছে। সাধারণ সময়ে যে Tamiflu ২০ পাউন্ডে বিক্রি হয় তা বিক্রি হয়েছে ১৩৮ পাউন্ডে।

কৃত্রিম চাহিদা তৈরি হয়েছে মুখোশ আর জীবাণুমুক্ত রুমালের। ৮ মে বিবিসি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্ভাব্য সোয়াইন ফ্লু মোকাবেলায় যুক্তরাজ্য সরকার ফ্রন্টলাইন মেডিক্যাল স্টাফদের জন্য ২২৭ মিলিয়ন সার্জিক্যাল মুখোশ আর ৩৪ মিলিয়ন শ্বাসযন্ত্র অর্ডার দিয়েছে। জীবাণুনিরোধক আর সার্জিক্যাল মুখোশ বিষয়ে জনগণের খোঁজ এবং বিক্রি এতই বেড়ে গেছে যে জীবাণুনিরোধক আর সার্জিক্যাল মুখোশ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ARCO–র ম্যানেজিং ডিরেক্টর টমাস মার্টিন একে প্রকাশ করেছেন মাত্র দু'টি শব্দে, "went wild"। অথচ এসব মাস্কের কার্যকারিতা নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব মাস্ক বাতাসবাহিত সংক্রমণকে

আটকাতে পারে না। যুক্তরাজ্যের প্রধান মেডিক্যাল কর্মকর্তা স্যার লিয়াম ডোনাল্ডসনের (৩০ এপ্রিল ২০০৯) The Daily Telegraph-র সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "মুখোশের ব্যাপারে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ হচ্ছে, এদের সামান্যই কার্যকারিতা রয়েছে। এগুলো আর্দ্র হয়ে যায় যা বরং এসব ভাইরাস সংক্রামণের ঝুঁকি বাড়ায় এবং যেহেতু ভাইরাসগুলো এত ছোট এগুলো সহজেই মাস্কের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। এগুলো এমনকি নিরাপত্তার ভুল ধারণাও দিতে পারে।"

WHO ৭২টি 'অভাবি' দেশে ইতিমধ্যে [৫ মে ২০০৯ থেকে] ২৪ মিলিয়ন অ্যান্টি-ফ্লু ড্রাগ পাঠানো শুর" করেছে।

সাধারণভাবে এমনকি মৃদু কোন মহা-মহামারি হলেও বিশ্ব অর্থনীতি থেকে ট্রিলিয়ন ডলার উধাও হয়ে যাবার কথা [সিউ এবং ওয়াং ২০০৪]। ফ্লু মহা-মহামারির কারণে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে এশিয়ান ডেভেলপ ব্যাংকের রিপোর্টও এজাতীয় তথ্যই দেয়। [বণ্ডুম ও অন্যান্য ২০০৫]। তবে ফ্লু মহা-মহামারিতে লাভবান পক্ষ হচ্ছে মাস্ক এবং সব ধরনের জীবাণুনিরোধক পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। কাজেই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলোতে অর্থলগ্নীকারি প্রতিষ্ঠানই সাধারণত লাভবান হয় বলে জানিয়েছেন রিজওয়ে [২০০৫]। এই রিপোর্টে রিজওয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে রাষ্ট্রীয় পৃ"পোষকতায় ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীগুলো "robber barns"-এর মতো কাজ করে। এসব তাত্ত্বিক মডেলের কার্যকারিতাই বুঝি প্রতিষ্ঠিত হলো CNBC-র তিন প্রতিবেদক [গনজালেস ও অন্যান্য ২০০৯]-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে। তারা দেখিয়েছেন যে টীকা বানানোর সম্ভাব্যতার কারণে বেশ কিছু বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর শেয়ার বাজার চড়া হয়ে গেছে। একই বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায় হফম্যান [৩মে ২০০৯]-এর প্রতিবেদনে।

আর ক্ষতিগ্রস্ড় কারা? এই চালানে মেক্সিকো ক্ষতিগ্রস্ড় হলো সবচেয়ে বেশি। মধ্য এপ্রিলেই IMF-এর হিসাব অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মেক্সিকোর অর্থনীতি এ বছর ৪% সংকুচিত হবে এবং ইতিমধ্যে মেক্সিকোর মুদ্রা পেসোর দাম পড়ে গেছে। আর রয়টার, নিউইয়র্ক থেকে শ্যাভেজ-ড্রেফাস [২৭ এপ্রিল ২০০৯] জানাচ্ছেন, মেক্সিকোতে সোয়াইন ফ্লু'র ব্যাপক বিস্ড়ারের কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে লগ্নীকারকরা আশ্রয়ের খোঁজে ইউএস ডলার আর ইয়েনের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ করায় এই দুই মুদ্রারই দাম বেড়েছে পেসোর বিপরীতে।

তা'হলে আর্থিক লাভ হলো বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীগুলোর, WHO নিজের অবস্থানকে খানিক গুছিয়ে নিলো, মার্কিন ডলারের দাম বাড়লো পেসোর বিপরীতে আর মেক্সিকোর সস্ড়শ্রমের যোগানও আগামী অনেক

বছরের জন্য নিশ্চিত হলো। অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকা মানুষকে এসব দেশের সরকারের উপর খানিকটা মনোযোগী করে তোলা গেল এবং এই মনোযোগ ধরে রাখার জন্য ভয়ের সূত্র রেখেই দেয়া হলো— ভাইরাস ফিরে আসবে দ্বিতীয়, তৃতীয় তরঙ্গে, অনেক ভয়াবহভাবে। কারণ যদি সত্যিই মহা-মহামারি আসে তবে ব্যক্তি মানুষের পক্ষে সেই অবস্থা সামাল দেয়া মুশকিল হবে, নির্ভর করতেই হবে সরকার আর প্রতিষ্ঠানের উপর। গরিব দেশগুলোকে নির্ভর করতে হবে বিশ্বপুঁজিবাদের ক্ষমতাকেন্দ্রের উপর। আর এই নির্ভরতার তলে থাকবে চিকিৎসা বাণিজ্য, সাহায্যের নামে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা A[H1N1]-র টীকা তৈরির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সচিব ক্যাথলিন সেবেলিয়াস ১.১ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের ঘোষণা তো শুধু শুধু দেননি। বিশ্বপুঁজিবাদের এহেন সংকটকালে এই 'মহা-মহামারি'র ভয় হলো তার রক্ষা কবচ। বিশ্বপুঁজিবাদ পুঁজি সম্প্রসারণের নতুন এভিনিউ খুললো। WHO কিংবা বিশ্ব গণমাধ্যম হলো তার ঘনিষ্ঠ মিত্র। সিপাহসালার। মিডিয়া যে নিজেই নিজের তৈরি 'হাইপ'কে সমালোচনা করছে এ শুধু হৃত বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। মিডিয়ার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে না পারলে সামনের দূরগামী প্রচারে বিশ্বাস স্থাপন হবে কীভাবে? আর তাই মিডিয়ার এই তড়িঘড়ি আত্মসমালোচনা ছাড়া কোন গতি ছিল না। মার্কিন পুঁজিবাদই মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে, তাকে বেণ্ডমগেমে ফেলেছে এবং তাকে দিয়ে আত্মসমালোচনা করাচ্ছে। তবে কি এ 'মহা-মহামারি' বিশ্ব পুঁজিবাদের, এ 'মহা-মহামারি' যুগের?

২৫ মে ২০০৯, এডিনবরা।

পর্ব দুই ॥ 'রাংতায় মোড়া যুগের অসুখ'

সোয়াইন ফ্লু'র দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং বাংলাদেশ

জুলাই থেকে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় আবারো হানা দিতে শুর" করল সোয়াইন ফ্লু, যেমনটি ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল। এবারও হাঁকানো হলো 'মহা-মহামারি'র সর্বোচ্চ মাত্রা ছয়। তবে এবার মহা-মহামারির সংজ্ঞায়ন করা হলো একটু অন্যভাবে। বলা হলো, সংখ্যা নয়, অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারার ক্ষমতার কারণেই একে 'মহা-মহামারি' বলা হয়েছে। আর বিবিসি'র সংবাদ পাঠকদেরও রসিক বলতেই হয়। নতুন করে ছবি, চার্ট, আর পরিসংখ্যানে সাজানো 'মহা-মহামারি' সোয়াইন ফ্লু'র বয়ানকালে, বিশেষ করে 'pandemic'শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে চোখের তারায় ফুটিয়ে তুলতে শুর" করলেন স্মিত কৌতুক। সেই কৌতুক সঞ্চারিত হয়েছে আমার ভেতরেও। এডিনবরায়, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি সোয়াইন ফ্লু

ছুটি কাটাতে শুর করলেন। ডিপার্টমেন্টে শুধু একবার ফোন করে জানালেই হলো তিনি সোয়াইন ফ্লু' আক্রান্ড়। ডাক্তারি সার্টিফিকেট ছাড়াই এক সপ্তাহের ছুটি এবং যে-কোন ধরনের জ্বর হয়েছে এই মর্মে জিপি'র কোন কাগজ দাখিল করতে পারলে তো কথাই নেই, যতদিন খুশী, ছুটির সমস্যা নেই। সবচে' মজা হয়েছিল প্রফেসর ফিলিপস আর তার চীনা পিএইচডি ছাত্র তাও-এর যখন ফ্রান্সের প্রভসঁ-এ মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় একই হোটেলের লবিতে। দু'জনেই সোয়াইন ফ্লু 'আক্রান্ড়' হয়ে ছুটিতে ছিলেন। কিন্তু বিষয়টি কৌতুক হয়ে থাকতে পারেনি বেশিদিন আমার ক্ষেত্রে। খুব জরুরী পারিবারিক প্রয়োজনে দিন চারেকের জন্য আসতে হলো দেশে, মধ্য-জুলাই নাগাদ। জিয়া বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি ধুন্ধুমার কা। সবাইকে লাইন দিয়ে হলুদ রঙের বাড়তি একটি ফর্ম পূরণ করতে হচ্ছে দেশে প্রত্যাগমন ফর্মের সাথে। বিমানবন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মুখে মাস্ক। ডেস্কে বসা এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করতেই গড় গড় করে বলতে শুর করলেন, "কী করবো? আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি। কিন্তু উপরের নির্দেশ!" আগস্টের শেষে দেশে ফিরে এলাম পাকাপাকি। তখনো হলুদ ফর্ম আর বিমানবন্দরজুড়ে মাস্ক।

খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, ১৮ এপ্রিল মেক্সিকোতে বাংলাদেশের একজন অভিবাসী সোয়াইন ফ্লু-তে মারা গেছেন খবর পাওয়া গেলে বাংলাদেশে সতর্কতার শুর, যদিও তার বন্ধু যার মাধ্যমে এই খবর পাওয়া গিয়েছিল তিনি ঠিক নিশ্চিত করতে পারেননি সেই মৃতব্যক্তি মামুন সোয়াইন ফ্লু-তেই মারা গেছেন কী না। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে এই খবর পাবার ঠিক সাথে সাথে জিয়া আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, শাহ-আমানত বিমানবন্দরসহ দেশের সবক'টি বিমানবন্দরে বিশেষ সতর্কতামূলক পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের জন্য। ১৮ জুন দেশের প্রথম H1N1 রোগী সনাক্ত হবার খবর ছাপা হলে ভীতি আরো বেড়ে যায়, বাড়ে সতর্কতা। [২০ জুন, নিউ নেশন]। লিফলেট ছাপা হলো জনগণকে সচেতন করার জন্য। যত ভয়ের বিস্ড়ার, মাস্কের ব্যবহারও তত বেশি।

'সোয়াইন ফ্লু'তে ছয় মৃত্যু 'মহা-মহামারি', আড়াই লাখ প্রসূতি মৃত্যুকে কি 'মহামারি' বলা যাবে?

দেশে ফেরার পরদিন থেকেই ক্লাস-পরীক্ষা-খাতা দেখার তোড়জোড়ে পড়ে গেলাম। জেন্ডার অ্যান্ড উইমেন স্টাডিজ বিভাগে ক্লাস নিতে গিয়ে দেখি দুই ছাত্র ক্লাসে এসেছে মুখে মাস্ক দিয়ে। জিজ্ঞেস করতেই জানা গেলো, হল কর্তৃপক্ষ নাকি হলের সব ছাত্রকে মাস্ক ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মনের রাগ মনে চেপে ক্লাস শেষ করি। রাস্ড়ায়, রিকশায় কানে মোবাইল স্মার্ট ছেলেমেয়েদের

মুখেও মাস্ক। নিজেকে সান্ড়না দেয়ার চেষ্টা করি, ঢাকার রাস্ড়ায় যে ধুলা! কিন্তু রাগ বিস্ময়ে পরিণত হয় যখন দেখি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে টক শো আর জরুরী স্বাস্থ্য ঘোষণাতেও ক্রমাগত মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য-উপদেষ্টাকে দেখতে পাই মাস্ক ব্যবহারসহ বেশ কিছু নিয়ম মেনে চললে যে কোন ভয় নেই সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে। বিশ্বের ক্ষমতাধর মহাপ্রভুদের ভয় বিস্ড়ারের বিপরীতে এই অভয় দানের ব্যাপারটি অবশ্য প্রশংসাই করি। পরিচিত পরিবারগুলোতে, ভীষণ শিক্ষিত পরিবারেও, বিশেষ করে যেসব পরিবারে শিশু আছে সেখানে ভয়ের তীব্রতা আর অসহায়ত্ব প্রবল দেখতে পাই। আমার নিজের অত্যন্ড় যুক্তিবাদি বড়ভাইকে এসব অসহায়ত্ব'র রাজনীতি নিয়ে বলতে গিয়ে তার উষ্মার মুখোমুখি হই। আড়াই বছর আর দেড় বছরের দুই সন্ড়ান নিয়ে তিনি খুবই ভীত আর অসহায় বোধ করছেন তখন।

এরই মধ্যে ৩১ আগস্ট ৩৭ বছর বয়সী প্রথম 'সোয়াইন ফ্লু' আক্রান্ড় রোগী মারা গেলে আমাকে বেশ চোরের মতোই থাকতে হয় কিছুদিন। শুনতে পাই অনেক ডাক্তার-নার্স সোয়াইন ফ্লু আক্রান্ড় রোগীদের চিকিৎসা কিংবা সেবা দিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এরই মধ্যে আমার এক মাস্টার্স-এর ছাত্র যিনি আবার কোন একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক হঠাৎ ক্লাসে জানালেন মিডিয়ায় 'সোয়াইন ফ্লু' ডিসকোর্স নিয়ে তিনি গবেষণা করতে চান, আমার ক্লাসটি মিডিয়া রিসার্চ অ্যান্ড কালচারার অ্যানালাইসিস-এর। তার কাছেই বিশদ শুনতে পাই হতভাগ্য মৃত এই রোগীর দায়সারা শেষকৃত্যের কথা। স্বজনরা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কোনরকমে দাহ করেছেন তাকে। তবে এই মর্মেও খবর পাওয়া যায় যে, তিনি অন্য রোগেও আক্রান্ড় ছিলেন। দ্বিতীয় মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। এবারে কুড়ি বছরের এক শ্রমিক এবং সর্বশেষ ১লা নভেম্বর একজন শিশুর মৃত্যুকে সন্দেহ করা হয় যে সেও হয়তো সোয়াইন ফ্লু-তেই মারা গেছে। কিন্তু এ'বিষয়ে বিস্ড়ারিত জানা সম্ভব হয় না কারণ শিশুটির পরিবার চায়নি যে বিষয়টি জানাজানি হোক সামাজিক হেনস্থার ভয়ে। তবে তিন মৃত্যুর ক্ষেত্রেই একটি বিষয়ে ঐকমত্য দেখা যায় যে তারা প্রত্যেকেই অন্যান্য রোগেও আক্রান্ড় ছিলেন। যাই হোক, বিডিনিউজ [৮ নভেম্বর, ২০০৯] Institute of Epidemiology, Disease Control and Research [IEDCR]-এর পরিচালক মাহবুবুর রহমানকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, মোট ছয়জন মারা গেছেন যাদের শরীরে H1N1 ভাইরাস পাওয়া গেছে। যে তিনজনের কথা মাত্রই উলেণ্ঢখ করা হলো তাদের বাইরে বাকী তিনজন সম্পর্কে মাহবুবুর রহমান কিছুই জানাননি এবং মিডিয়াতেও আসেনি তাদের খবর। কিন্তু ধরা যাক, এই ছয়জন সোয়াইন ফ্লু-তেই মারা গেছেন নিশ্চিতভাবে, কিন্তু তা'হলেও কি সেটি কোনভাবেই মহা-মহামারির কাছাকাছি কিছু? অনেক টেনেটুনেও আক্রান্ড়ের সংখ্যা দু'শো

ছাড়ায়নি। আমাদের দেশে প্রতিবছর ১০০,০০০ জন নারীর মধ্যে ৩০২ জন নারী সন্ড়ান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। [ইউএনএফপি, ২০০৯]। এই হিসেবটা কি আমরা বুঝি আসলে? প্রায় আড়াই লাখ নারী, প্রতিবছর। এটাকে এমনকি মহামারিও কি বলি আমরা? যক্ষায়, শ্বাসপ্রণালী ঘটিত রোগে, স্রেফ না খেতে পেয়ে, লঞ্চডুবিতে কিংবা কাপড়-কারখানার মেয়েরা আগুনে পুড়ে...সব মিলিয়ে কতজন মারা যান প্রতিবছর? সে পরিসংখ্যান কেই-বা রেখেছে কবে? রাখেনি, কারণ সে হিসাব রাখতে যুক্তরাষ্ট্র বা WHO বাংলাদেশকে বলেনি। কারণ সে হিসাবে বাণিজ্য সম্ভব না। অথচ ইউএনবি আমাদের জানাচ্ছে সোয়াইন ফ্লু'র সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মে মাসেই WHO বাংলাদেশকে দিয়েছে দুই মিলিয়ন অ্যান্টি-ভাইরাল ক্যাপসুল (অথচ এইসব ক্যাপসুলের কার্যকারিতা যে প্রমাণিত হয়নি সেটি অন্ড়ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র না জানার কোন কারণ নেই)। শুর"তেই বলা হয়েছিল আমাদের মতো গরিব দেশগুলোতে, যেখানে গরমও অত্যন্ড় বেশি, এই রোগ এত ভয়াবহ রূপ নেবে যে তা সামাল দেয়া এসব দেশের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব না। উন্নত বিশ্বের [পড়তে হবে যুক্তরাষ্ট্রের] সাহায্য নিতেই হবে। 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ধ্বংস হোক নিপাত যাক'? অতো সহজ না। আর বিষণ্ন হয়ে সেই অসহায়ত্বই শুনি IEDCR-এর মহাপরিচালকের বয়ানে, "আমাদের জন্য টীকা সংগ্রহে আমরা দেরি করছি কারণ আমরা আশা করছি WHO-র কাছ থেকেই আমরা সেসব পাবো। কিন্তু আমরা জানি না, কী পরিমাণ টীকা আমাদের দেরি হবে এবং কখন" [বিডিনিউজ২৪.কম, ৮ নভেম্বর, ২০০৯। অনুবাদ লেখকের।]।

সত্যিই তো অন্ধ ভিখারি কবেই বা জানতে পেরেছেন ভিক্ষার চাল কাড়া নাকি আ-কাড়া হবে! দুপুরে পাবেন নাকি সন্ধ্যায় পাবেন!

একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য একথা প্রমাণ করার জন্য নয় যে, সোয়াইন ফ্লু বলে কিছু ঘটেইনি, বরং আমার উদ্দেশ্য হলো এ'কথা বলা যে সোয়াইন ফ্লু নামের যে ভাইরাসটি'র প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং অনেক মৃত্যুর কারণ হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে সেটি নিয়ে এত মাতম করার কারণ কী যখন সাধারণ ফ্লুতেই মৃত্যু অনেক বেশি? কেন এই ভীতির বিস্ড়র? এই অতি মাতমের পলিটিক্যাল ইকোনোমিটা কী হতে পারে। এ'ব্যাপারে পর্ব এক-এ বিস্ড়রিত আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনাকে পুরোপুরি বহাল রেখে শুধু একটি বিষয় যোগ করতে চাই, বাংলাদেশের তো নিজের ওষুধ কোম্পানি নেই যে বাণিজ্য করবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-WHO-পাশ্চাত্য মিডিয়ার এই মাস্ক-অ্যান্টিভাইরাল ক্যাপসুল খেলায় তার অংশগ্রহণ কেন? কেন বাংলাদেশ মিডিয়ার এত হৈ-চৈ? উত্তরটি আমি পেয়েছি বিমানবন্দরের সেই কর্মকর্তার কাছে, "...কিন্তু উপরের নির্দেশ!" উপরের

নির্দেশ হলে সবুজ বিপণ্ডব সবচেয়ে বড় বিপণ্ডব, পরিবার পরিকল্পনা এক নম্বর জাতীয় কর্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কলকারখানা বিরাষ্ট্রীকরণ একমাত্র অর্থনৈতিক সমাধান, আদমজী তুলে দেয়া একমাত্র শৈল্পিক বিনিয়োগ, তেল-গ্যাস-জাতীয় সম্পদ হস্ড়ান্ড়র এনার্জি সেক্টরের একমাত্র সমাধান, জলবায়ু পরিবর্তন এক নম্বর সমস্যা...সবই তো এক নম্বর। আর এ'হেন অসহায় রাষ্ট্রের কাঁধের উপর সোয়াইন ফ্লু'র নিঃশ্বাস শুধু নয়, স্বয়ং WHO'র ভীতিবার্তা যে বার্তায় সারা পৃথিবী কুপোকাত! গরিব দেশের অসহায় সরকার যার কাছে রোগের কারণ, নিদান কিছু জানা নেই শুধু ভয় আছে বিস্ড়র [অসুখের এবং সাহায্যের], মৃতের সংখ্যা বেড়ে গেলে এই নতুন সরকার টিকে থাকতে পারবে কী না, সেই নিশ্চয়তা নেই তার ব্যতিব্যস্ড় না হয়ে উপায়! সালাম আরেকবার মহামতি মার্কসকে [১৮২৩], "The ideas of rulling class are in every epoch the rulling ideas"-র মতো দিব্যজ্ঞান পৃথিবীকে দিয়ে যাবার জন্য। যারা সাহায্য দিয়ে 'টিকিয়ে রাখে', তারা ভয় দেখাচ্ছে অথচ আমরা ভয় পাবো না! আর বিবিসি, সিএনএন, রয়টার, এএফপি, আলজাজিরা এরাই কুপোকাত তো বাংলাদেশি মিডিয়া! যে শক্তি এবং কর্পোরেট পুঁজি বিবিসি, সিএনএন, রয়টার, এফপি, আলজাজিরা-কে জিইয়ে রাখে, সেই একই পুঁজি বাংলাদেশি মিডিয়ারও প্রাণভোমরা। আর তা'ছাড়াও নিন্দুকেরা যা-ই রটাক, প্রয়োজনীয় সংবাদ জনগণকে দেয়া মিডিয়ার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বৈই কি!

অতঃপর সোয়াইন ফ্লু দ্বিতীয় তরঙ্গ শেষে তৃতীয় তরঙ্গের রক্ত-পরীক্ষা শুর" করেছে

সোয়াইন ফ্লু WHO'র ভবিষ্যতবাণীর পথ ধরে এখন তৃতীয় তরঙ্গের রক্ত পরীক্ষা শুর" করেছে। আবার মিডিয়ায় শিরোনাম তৈরি করেছে সোয়াইন ফ্লু। মিশরে মৃতের সংখ্যা ৩২, গাজায় ২ প্যালেস্টাইনী, কম্বোডিয়ায় ৫, স্পেনভেনিয়ায় ১১, হংকং-এ এক, সাংহাই-এ প্রথমজন এবং তুরস্কে ৪৬ জন মৃত্যুবরণ করেছেন এই তৃতীয় তরঙ্গে। আর ইতালি শনাক্ত করেছে তাদের প্রথম কেস। এই সব সংবাদ শিরোনাম সিনহুয়া'র [৮ ডিসেম্বর ২০০৯], একদিনের। চীন সোয়াইন ফ্লু'র কার্যকর টীকা আবিষ্কারের দাবি করেছে, অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিশুদের বিনা খরচে টীকা দেবার ঘোষণা দিয়েছেন এবং পাশাপাশি সকল অধিবাসীকে টীকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, ইউনিসেফ নেপালী স্কুল ছাত্রদের 'সচেতনতা' বাড়ানোর জন্য প্রচারণা শুর" করেছে, ইন্দোনেশিয়া আগামী বছর নাগাদ টীকা তৈরির দাবি করেছে—এমন কত খবরে মিডিয়া সরগরম, সবচেয়ে বেশি সিনহুয়া। এবং সিনহুয়া পরিবেশিত চীনে সোয়াইন ফ্লু প্রসঙ্গে পাশাপাশি দু'টি সংবাদে একটু কৌতুকবোধ করা যেতেই পারে। একদিকে তারা সফল টীকা আবিষ্কারের খবর দিচ্ছে অন্যদিকে চীনে খুব দ্রুত সোয়াইন ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার খবরও দিচ্ছে। আর এখন, খোদ যুক্তরাষ্ট্রে কেউ

হাঁচি-কাশি দিলেই নাকি তাকে 'সু-রক্ষা'য় সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ বলে কথা!

এরই মধ্যে ভারতের প্রখ্যাত ও বিতর্কিত চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদ অশোক জয়সিংহানি এক চমকপ্রদ তথ্য হাজির করেছেন *সেন্ট্রাল ক্রনিকল* পত্রিকায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে (২৯ নভেম্বর, ২০০৯)। তিনি একে সোয়াইন ফ্লু নামকরণের প্রবল বিরোধী। তাঁর মতে, শুকরের কোন সম্পর্ক নেই এই ফ্লু'র সাথে। এমনকি তিনি মনে করেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা স্প্যানিস ফ্লু, ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ, বার্ড ফ্লু, চিকেন ফ্লু বা সার্স নামে যেসব নামকরণ করেছেন শ্বাসপ্রণালীজাত এই সব রোগকে একত্রে 'রেসপিরেটরি প্যানডেমিক' বলাই যুক্তিযুক্ত যতদিন না আসল কারণকে স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব হয়। তাঁর মতে এগুলো ভাইরাল অসুখ নয়, কাজেই ভাইরাল টীকা বা মাস্ক কোন কাজে আসবে না। ভারতের পুনে'র কথিত সোয়াইন ফ্লু'র কারণে মৃত কেসগুলোকে পরীক্ষা করে তিনি এটিকে কেমিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল যুদ্ধ মনে করছেন, খাবারে ক্রমাগত বিষকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যার বিস্তার। তাঁর দাবি ওষুধ কোম্পানিগুলোর সাথে এইসব প্রক্রিয়াজাত খাদ্য-কোম্পানিগুলোর গভীর সখ্য রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন এই প্রক্রিয়ায় সত্যিই কোটি মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব। যদি এই প্রবন্ধের বক্তব্য সত্য হয় তবে সেটি মারাত্মক, যদি মিথ্যা হয় সেটিও কম মারাত্মক নয়। কারণ একজন নামকরা চিকিৎসক যদি এইসব মনগড়া প্রতি-অণুকল্প দাঁড় করাতে থাকেন এবং ছাপা হয় সেন্ট্রাল ক্রনিকল-এর মতো সংবাদমাধ্যমে, তবে বুঝতেই হবে সরকার-মিডিয়া-বিশ্বস্বাস্থ্য ব্যবস্থা -পুঁজিবাদী ক্ষমতা কাঠামো সবকিছুর কল্যাণে, আমরা, মানুষেরা, এক দিশাহীন রাংতায় মোড়া যুগের অসুখে ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞান যখন দর্শনহীন টেকনোলজি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়, স্রেফ মুনাফার জন্য, তখন যা পড়ে থাকে তা নেহাতই বিনিয়োগকৃত পুঁজির জয়োলণ্ঢাস, সে জয়োলণ্ঢাস নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ড় বিনিয়োগকৃত পুঁজির মরিয়া চেষ্টা চলতেই থাকবে। গোটা এই ঘটনায় কোথাও বিজ্ঞান নেই, আছে কেবল টেকনোলজির মাধ্যমে নির্লজ্জ মিথ্যাচার।

হায় বিলিয়ন ডলার যদি এই রোগটি আসলে কী সেটি নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যয় হতো! আর রোগ নির্ণয়ের আগে রোগের টীকা দেয়া বন্ধ করা যেত! নিষিদ্ধ করা যেত মিডিয়ার অতি-মিথ্যা প্রচার! 'মহা-মহামারি' সত্যিই গ্রাস করেছে এই পৃথিবীকে, তবে সোয়াইন ফ্লু'র নয়, এ 'মহা-মহামারি' বিশ্ব পুঁজিবাদের, এ 'মহা-মহামারি' যুগের। রাংতায় মোড়া যুগের মহা-মহামারি এটি।

ঢাকা। ৯ ডিসেম্বর, ২০০৯।

নোট

১। লেখাটির প্রথম পর্বের শিরোনাম শুর"তে ঠিক হলো 'অতি-তথ্যের মহা-মহামারি'। সমস্যা হলো তাহলে শুদ্ধ তথ্যের অতি প্রচারকেও বোঝাতে পারে। তখন ঠিক করলাম শিরোনাম 'মিথ্যা-তথ্যের মহা-মহামারি'। তাহলে আবার অতি প্রচারের দিকটি বাদ পড়ে যায়। দু'টো মেলাতে চেষ্টা করলাম। ইংরেজিতে আনতে পারলাম না। কিন্তু বাংলা ভাষায় এক অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। হাইফেন দিয়ে 'অতি-মিথ্যা-তথ্য' মিলিয়ে দিলে একই সাথে 'অতি-তথ্য' এবং 'মিথ্যা-তথ্য'কে বোঝানো যায়। তবু বাড়তি সতর্কতার জন্য বন্ধনী[''] দিয়ে অতি এবং মিথ্যাকে আলাদা করে দেয়া হলো। শিরোনামের অর্থ তাহলে দাঁড়ালো অতি এবং মিথ্যা তথ্যের মহা-মহামারি। তবে রসিক পাঠক যদি শিরোনামটিকে অতিমিথ্যা তথ্যের মহা-মহামারি হিসেবে পড়েন তো আমার কোন আপত্তি নেই। ইংরেজি pandemic-এর বাংলা করলাম মহা-মহামারি।

২। ব্যবহৃত সংবাদ শিরোনামগুলোকে ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে শব্দের মজাটাকে দেয়ার জন্য।

তথ্যসূত্র

Ball-Rokeach, S. J., and DeFleur, M.L. (1976). "A dependency model of mass media effects," Communication Research 3:3-21.

Barns, H. (2009). [quoted in] Kate Forster and Tom Peterkin "Search for Hundreds on Flu Plane", Scotland on Sunday. May 3.

Bdnews24.com. (2009). "Swine flu death toll now stands at 6", November 8.

Bloom, E., de Wit, V. and Mary J. (2005). Potential Economic Impact of an Avian Flu Pandemic on Asia, EDR Policy Brief, Series No. 42. ADB.

Carl, N. 2009. [blogged in] Mackey, R. (2009). "Blaming 'Media Hype' for Swine Flu Fears", The Lead Blog, NY Times.com. May 1.

CB. 2009. [blogged in] Mackey, R. (2009). "Blaming 'Media Hype' for Swine Flu Fears", The Lead Blog, NY Times.com. May 1.

Chavez-Dreyfuss, G. (2009). "FOREX-Dollar, Yen Climb as Flu Outbreak Sours Risk Appetite", Reuter (NY). April 27.

Davey, M. (2009). "Thousands Face a Balancing Act Over Flu Fears", NY Times.com. April 30.

Donaldson, L. (2009). [quoted in] John Bingham and Rebecca Smith "Swine flu: Eight confirmed cases in Britain", The Daily Telegraph. April 30.

Doshi, P. (2005). "Are US Flu Death Figures More PR than Science?", British Medical Journal Dec: 14-17.

Forster, K. and Peterkin, T. (2009). "Search for Hundreds on Flu Plane", Scotland on Sunday. May 3.

Goldcare, B. (2009). “Swine Flu and Hype-A Media Illness”, The Guardian. April 29.

Gonzalez, Y., Moreano, G. and Nelson, A. (2009). “Trading Swine Flu: Winners and Losers”, CNBC.http://www.cnbc.com/id/30453051/

Griffin, F. (2009). [quoted in] Kurtz, H. 2009. “A Fierce Outbreak of Swine Flu Coverage: Sheer Extent of Attention Implies Full-Blown Crisis”, Washinton Post. April 28.

Gupta, S. (2009). [quoted in] Kurtz, H. 2009. “A Fierce Outbreak of Swine Flu Coverage: Sheer Extent of Attention Implies Full-Blown Crisis”, Washinton Post. April 28.

Hoffman, D. (2009). “Swine flu crisis creates market winners and losers”, Investment News. May 3.

Jaisinghani , Ashok T. (2009). “Pune has been made the Swine Flu Capital of India!”, Central Chronicle , November 29.

Kurtz, H. (2009). “A Fierce Outbreak of Swine Flu Coverage: Sheer Extent of Attention Implies Full-Blown Crisis”, Washinton Post. April 28.

Mackey, R. (2009). “Blaming ‘Media Hype’ for Swine Flu Fears”, The Lead Blog, NY Times.com. May 1.

Morales, L. (2009). “Americans Split on Media Coverage of Swine Flu”, Gallup. http://www.gallup.com/poll/118258/Americans-Split-Media-Coverage-Swine-Flu.aspx?CSTS=tagrss

Paul, R. (2009). “On the 1976 Swine Flu” CNN. May 3. http://www.youtube.com/watch?v=IvCVLkBKq1I&feature=response_watch

Ridgeway, J. (2005). “Capitalizing on the Flu”, The New York News. November 15.

Siu, A. and Wong, Y. C. Richard. (2004). Asian Economic Paper. 3(1): 62-83.

WHO (2009). Summary report of a High-LevelConsultation: new influenza A (H1N1)

Staff Reporter (2009). “Swine flu case detected in Bangladesh”, The New Nation, 20th June.

UNB (2009). “WHO provides Bangladesh 2 million antiviral capsules for Swine Flu preparedness, response: WHO official.” 11 May.

UNFPA (2009). “Safe Motherhood”, http://www.unfpa-Bangladesh.org/php/thematic_motherhood.php. 9 December.

Xinhua (2009). “World Tackles Swine Flu”, http://www.chinaview.cn/sf/, 9 December.

গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা
ওয়াচারদের ওয়াচ কেন জরুরি
রোবায়েত ফেরদৌস

প্রতিদিন সকালে কেমন সাপের মতো হিস্ করে দরজার নিচ দিয়ে পিছলে বাসায় ঢুকে পড়ে খবরের কাগজ। কিন্তু কই, জাত সাপের মতো বিষ কই তাদের? সবই কেমন বিষহীন পানিবাসী তথাকথিত নিরিহ গোছের ভালো সাপ। তাদের কোনো দংশন নেই, কামড়ে দেবার শক্তি নেই; বিষ নেই, জ্বালাও নেই; কিন্তু বেশ বড়াই আছে, আছে নিরপেক্ষতার ভং; ভালোমানুষীর আবরণ, আবডাল। এজন্যই কি কামড়ে ভয়? কাউকে দংশন করলে পাছে যদি কোনো পক্ষ হয়ে যাই; কিংবা নিদেনপক্ষে ভয় থাকে, কেউ যদি কোনো পক্ষে মার্জিন এঁকে দেয়। নিত্যদিন এত সব মুখোশে খবরের কাগজের মুখ মোড়া থাকা যে মুখোশ চিড়ে মুখ চেনাই মুশকিল হয়ে উঠে!

শুধু সংবাদপত্র নয়, বাংলাদেশে মূলধারার সকল গণমাধ্যমই মুক্তবাজার অর্থনীতিকে তাদের মতাদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে এ চরিত্র ধারণ করেছে। তারা সবাই নিঃশর্তভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে কোরাস করে চলে; বাংলাদেশে একটি কর্পোরেট সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে তাদের ওকালতি। আর এগুলোকে আড়াল করার জন্যই এত এত মুখোশের আয়োজন। বাংলাদেশে মূলধারার গণমাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী, অন্য ধর্মাবলম্বী আর আদিবাসীদের অবস্থান কেন প্রান্তিক—এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে মিডিয়ার চরিত্র আর মালিকানার কাঠামো বিশ্লেষণ করলেই। সরকারি বা বেসরকারি কোনো টিভি চ্যানেলে প্রচারিত নাটকে নায়ক/নায়িকা বা অন্য কোনো ভূমিকায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না কোনো আদিবাসী চরিত্রও। কারণ মিডিয়ার মালিকানা তাদের হাতে নেই। গণমাধ্যমের অনুষ্ঠানে নারীর যে 'বিকৃত' আর 'বিক্রিত' ইমেজ প্রতিফলিত হয়, তার কারণ পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ কাঠামো, যেখানে মিডিয়ার মালিকানা নারীর হাতে নেই। খেটে খাওয়া দরিদ্র গ্রামীণ নারী-পুরুষের সংগ্রামের কাহিনী মূলধারার মিডিয়ায় কখনোই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ট্রিটমেন্ট পায় না। কারণ মিডিয়ার মালিকানা থাকে শহুরে ধনীক এলিটগোষ্ঠীর হাতে। কেউ কেউ তাই এ প্রশ্ন খুব যুৎসইভাবেই তোলেন যে, এটা কি তবে 'ম্যাস মিডিয়া' না 'ক্লাস মিডিয়া'—যা কেবল সমাজের বিশেষ শ্রেণীর কথা বলে; এটা কি তবে 'ম্যাস মিডিয়া' না

'মেল মিডিয়া'—যা সর্বত্র পুরুষকে প্রধান/ঘটনার কর্তা করে তোলে, দিনের পর দিন নারীর পরাজিত, অধস্তন আর খণ্ডিত ইমেজ উৎপাদন আর পুনরুৎপাদন করে চলে।

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায় যে বিষয়টি খেয়ালে রাখা দরকার তাহলো বাংলাদেশে গত এক দশকে গণমাধ্যমের মালিকানার ধরন পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এখন আর কোনো ব্যক্তি বা একক সংস্থা নয়, রেডিও টিভি বা সংবাদপত্রের মালিক হচ্ছেন কোনো ব্যবসায়ীক গোষ্ঠী বা গ্রুপ অব কোম্পানিজ। পশ্চিমের মতো একই হাউজ থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক আর টিভি চ্যানেল বের হচ্ছে। 'মহান' পেশায় অবদান রাখা বা সমাজ উন্নয়নের চিন্তা নয় বরং মুনাফা অর্জন, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কিংবা কোম্পানির অন্য ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এখন কাগজ বেরুচ্ছে, টিভির চ্যানেল গজাচ্ছে। গণমাধ্যম নিজেই পরিণত হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিতে। তবে যে বিষয়টি দুঃখজনক তা হলো, আমরা দেখছি, মিডিয়ার মালিকানা চলে যাচ্ছে মাস্তান, দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক আর দুষ্ট লোকদের হাতে। এসব টিভি আর সংবাদপত্রের বেশিরভাগই আর্থিকভাবে লাভজনক না হলেও মালিকরা তা চালিয়ে যাচ্ছেন মাসের পর মাস। মিডিয়া থেকে লাভ হচ্ছে না, আবার তা বন্ধও হচ্ছে না। অর্থনৈতিক লজিক দিয়ে কিন্তু এটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না; ব্যাখ্যাটা হচ্ছে 'নষ্ট' রাজনীতিক আর 'দুষ্ট' ব্যবসায়ীরা তাদের অন্যসব ব্যবসায়ীক আর রাজনৈতিক স্বার্থে সংবাদপত্র আর টিভি চ্যানেলের মালিক হচ্ছেন। মিডিয়ার মালিক হলে সামাজিক সম্মান আর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ে; অন্য ব্যবসা/প্রকল্প/প্রডাক্টের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। মিডিয়ার ব্যবসার ক্ষতিটা এভাবে মালিকগণ 'অন্য উৎস' থেকে সুদে-আসলে তুলে নেন। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অন্তত এক ডজন মিডিয়ার মালিক দুর্নীতির অভিযোগে কারাগারে ছিলেন। এদের মধ্যে বিএনপির সাবেক সাংসদ, যার বিরুদ্ধে কারচুপির ভোটে সাংসদ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, সেই এক মোসাদ্দেক আলী ফালুর মালিকানাতেই ছিল ৩টি মিডিয়া—এনটিভি, আরটিভি, দৈনিক আমার দেশ; আছে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু চ্যানেল ওয়ানের মালিক গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, বৈশাখীর তৎকালীন মালিক মির্জা আব্বাস, দৈনিক যুগান্তরের মালিক নুরুল ইসলাম বাবুল, ফাল্গুন মিউজিকের কর্ণধার ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, দৈনিক জনকণ্ঠের মালিক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ, দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্টের মালিক সালমান এফ রহমান। অন্যরা ইতোমধ্যে ছাড়া পেয়ে গেলেও এদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন আল মামুন এখন কারাগারে রয়েছেন। খেয়াল করার বিষয় যে, এসব মিডিয়ার মালিকরা কিন্তু স্বাধীন আর সাহসী সাংবাদিকতার জন্য জেলে যাননি; এদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বিশাল

বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, অভিযোগ রয়েছে জোর খাটিয়ে হাজার হাজার বিঘা জমি দখল করে নেওয়ার, মানি লন্ডারিং ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করার; এছাড়া গেল ১৫ মার্চ ২০০৭ তথ্য মন্ত্রণালয় অনুমতি বা অনাপত্তি ছাড়াই অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করায় ৭টি চ্যানেল—রূপসী বাংলা, এসটিভি ইউএস, টিভি-৫, ফাল্গুন মিউজিক, চ্যানেল এস, মাই টিভি ও বিজয় টিভি বন্ধ করে দিয়েছে। এদের মধ্যে একটি যুক্তরাষ্ট্র, একটি যুক্তরাজ্য এবং বাকি ৫টি থাইল্যান্ড থেকে তাদের প্রোগ্রাম আপলিংক করতো। তবে এদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচারের অভিযোগ ছাড়াও মানি লন্ডারিং-এর অভিযোগও রয়েছে। একই সময়ে এসটিভি ইউএস-এর একজন অন্যতম কর্ণধারকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আদম পাচার, মানি লন্ডারিংসহ অন্যান্য অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। অর্থপাচারে তারেক জিয়াকে সহযোগিতা করার অভিযোগে রেডিও ফুর্তির মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিস আহমেদ গোর্কীকে কিছুদিন আটক করে রাখা হয়। আরো ভয়ংকর যে, ২০০৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা নয়া দিগন্তের মালিকানার বিরুদ্ধে ব্রিটেনে হেরোইন পাচারের অভিযোগ উঠেছিল এবং তাদের অন্যতম মাদার সংগঠন বিডি ফুডের কর্ণধারসহ কয়েকজনকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এছাড়াও এপ্রিল ২০০৭-এ রূপসী বাংলা টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হায়দারকে প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আর সরকারি মালিকানাধীন টিভি ও রেডিওর অবস্থা তাহলে কেমন? আমরা দেখেছি, সব সরকারই নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনকে 'যুক্তিহীনভাবে' ব্যবহার করেছে। এ দুটো গণমাধ্যম বরাবরই সরকারের 'বশংবদ প্রচারাস্ত্র' হিসেবে কাজ করে গেছে। অডিয়েন্সের কাছে এ দুটো গণমাধ্যমে পরিবেশিত সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। জেনারেল এরশাদ, শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়া—প্রত্যেক সরকারই তাদের প্রোপাগান্ডা মেশিন' হিসেবে রেডিও টিভিকে যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করেছেন। অধিকন্তু এ দুটো মাধ্যমে কে খবর পাঠ করবেন, কোন শিল্পী গান করবেন, কার নাটক বা অনুষ্ঠান কেনা হবে, কোন প্রোগ্রাম প্রচার হবে বা হবে না, টক শো'তে কারা আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত হবেন, আর কারা হবেন না—এর সব সিদ্ধান্তই নেওয়া হতো রাজনৈতিক বিবেচনা মাথায় রেখে। বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় রেডিও-বিটিভিতে তখন থাকে বিএনপির শিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা, খবর পাঠকদের প্রাধান্য; আর আওয়ামী লীগের সময় থাকে আওয়ামী আদর্শের শিল্পী-অভিনেতাদের। বিএনপি সরকারের সময় আওয়ামী আদর্শের শিল্পীরা নির্বাসিত; আর আওয়ামী লীগের সময় বিএনপির শিল্পীরা দ্বীপান্তরিত। বিটিভির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন উত্থাপন

হওয়ার খবরও শোনা গেছে যে, তাফসির-তরজমা করার জন্য যে আলেমকে ডাকা হচ্ছে তিনি কি 'আওয়ামী মাওলানা' না 'বিএনপি-জামায়াতের মাওলানা'। দলীয়করণের মাত্রা তাহলে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! আর যারা আওয়ামী বা বিএনপি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শেই অবস্থান করেন না, তারা পড়েন সবচেয়ে বিপদে—তারা দু দলের কাছেই শত্রু হয়ে পড়েন। (মামুনুর রশীদ, 'বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন : আমরা কি ভুলতে বসেছি', দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৩ জানুয়ারি ২০০৭)

বাংলাদেশে বেসরকারি আর সরকারি পর্যায়ে মিডিয়া মালিকানার এই হচ্ছে হাল-হকিকত। অথচ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মিডিয়ার কাজ সরকার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে চোখে চোখে রাখা, তাদের ভুলচুক-ত্রুটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। মানুষ প্রত্যাশা করে সরকারি, বেসরকারি, বহুজাতিক বা ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠান—যাদের কাজের সঙ্গে জনগণের স্বার্থ জড়িত গণমাধ্যম তাদের কাজের ওপর নজরদারি রাখবে, জনবিরোধী বা কোনো অন্যায় অনিয়ম দুর্নীতি হলে সেসবের সমালোচনা করবে। মিডিয়াকে তাই 'আই অন গভর্নমেন্ট' বলে। কিন্তু বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিকদের এই যদি হয় অবস্থা, তারা নিজেরাই যদি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকেন, তাহলে কী করে তারা অন্যের কাজের সমালোচনা করবেন। মহাভুত সে তো সর্ষের ভেতরেই। যে মিডিয়ার মালিক নিজেই গডফাদার সেজে বসে আছে, সরকার বা অন্যের কাজের সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার তো সেই মিডিয়ার থাকে না। বাংলাদেশে রাজনীতি যেমন পচে গেছে, প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক গণমাধ্যমেরও কি এর সমান্তরালে পচন ধরেছে? যদি বিষয়টি তাই হয়, তবে রাজনীতির মতো, মিডিয়ার মালিকানাতেও গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। কালো টাকার মালিক, নষ্ট ব্যবসায়ী আর দুষ্ট রাজনীতিকদের খপ্পর থেকে বেসরকারি মিডিয়াকে যেমন বাঁচাতে হবে, বিটিভি আর বাংলাদেশ বেতারকে তেমনি সরকারের একচ্ছত্র মালিকানা থেকে বাঁচাতে হবে। তবে মিডিয়ার বাঘা বাঘা মালিকদের গ্রেপ্তার হওয়ার মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে তাহলো, এক. মিডিয়ার মালিক হলে সরকারকে চাপে রাখা যায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়, মিডিয়াকে ঢাল বানিয়ে অবৈধভাবে অন্য ব্যবসা করে হাজার কোটি টাকা বানানো যায়, গ্রেপ্তার-জেল এড়ানো যায়—এই ধারণাটি ভেঙে গেছে। দুই. বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ করলেই প্রভাবশালী আর পাঠকপ্রিয় কাগজ/টিভি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

এদেশে নতুন একটি ভালো কাগজের জায়গা নাকি এখনও ফাঁকা আছে—'সম্ভব না'র বিপরীতে 'সম্ভাবনা'র কথার কথা শোনাতে চান কেউ কেউ! কিন্তু কই, তেমন নতুন কাগজ কে বের করবে? সংবাদপত্র নিজেই তো কর্পোরেট

গোলামীতে নিজের স্বাধীন অস্ড়িত্ব ডুবিয়ে রাখতে ভালোবাসে। মাথা তুলে দাঁড়াবে সে কীভাবে?

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো তাই শুর" করতে হবে আমাদেরকে শুর" থেকেই। ছোট্ট কিন্তু সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যে পরিবার—গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির নির্মিতি আর র"চির প্রতিষ্ঠা শুর" হওয়া দরকার সেখান থেকেই। পরিবারের জমিতে গণতন্ত্র আর র"চির কর্ষণে সংবাদপত্রের থাকা চাই প্রভাববিস্ড়ারকারী ভূমিকা; পাঠক-ব্যবহারকারীর ভাষাকাঠামো নির্মাণেও তার অবদান অনপনেয়। বাংলা অঞ্চলের কোনো কাগজের আছে কোনো দূরচিন্ড়ার পরিকল্পনা এসব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার?

প্রকৃতপক্ষে, সংবাদপত্র বের হওয়ার আগেই যখন এর মালিকের সঙ্গে সম্পাদকের দেন-দরবার চলে, আমার বিবেচনায় তখনই প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্পাদকের মৃত্যু ঘটে। মহাআপোষরফাটি তখনই সম্পাদিত হয়ে যায়। পরে আর কিছুই করার থাকে না, বেতনভোগী সম্পাদক তাঁর পেশাদারিত্ব দেখাবেন কোথায়?

সংবাদপত্র/সাংবাদিক রাষ্ট্র ও সমাজের বিবিধ ঘটনা 'ওয়াচ' করেন। ওয়াচ করেন রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি আর সাহিত্য-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি। তাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ লেখা আর পরিবেশিত শব্দ/ইমেজ থেকেই নির্মিত হয় নিত্যদিনের ইতিহাস; মিডিয়া সবাইকে ওয়াচ করে ঠিক, কিন্তু মিডিয়াকে কে ওয়াচ করে? প্রতিদিন সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় সাংবাদিককে, ফলে যে সাত তাড়াতাড়ির মধ্যে তারা কাজ করেন, সেখানে থেকে যায় ভুলচুক-বিভ্রান্ড়ি আর একপেশে পর্যবেক্ষণ। এ ধারণা থেকেই সাংবাদিকতায় 'ওয়াচারদের ওয়াচ' করার বিষয়টি আজ প্রতিষ্ঠিত যেখানে সাংবাদিকদের প্রতিদিনকার দেখার বাইরে গিয়ে আরেকটি দল তাদের দেখা-লেখা-পরিবেশন কৌশলের যৌক্তিকতা নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করবেন। বলা যায় সংবাদপত্রের জন্য এরা 'থার্ড আই' হিসেবে কাজ করে, কাজ করে প্রফেশনাল পর্যবেক্ষক/এক্সটারনাল পরামর্শক হিসেবে। গুণগত মান, সুর"চি আর দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা চর্চার জন্য ওয়াচারদের ওয়াচ করাটা তাই জর"রি।

অশ্লীল সাহিত্য থেকে নীলছবি
পর্নোগ্রাফির বিবর্তন ও জেন্ডারপ্রসঙ্গ

ফাহমিদুল হক

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম, বিশেষত ইন্টারনেটের কারণে, পর্নোগ্রাফি সবচেয়ে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। পর্নোগ্রাফি এখন আর 'অপরাধী-মনোভাবে-দেখা/পড়া ব্যক্তির বা বন্ধুগোষ্ঠীর গোপন অথচ উত্তেজিত' অভিযানের বিষয় নয়। বরং ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা, বা সিডি-ডিভিডি আকারে পর্নোগ্রাফি সংগ্রহ করা এতটা সহজ হয়ে গিয়েছে যে, তা সমাজে এখন গোপন অথচ বহুদৃষ্ট প্রপঞ্চে পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটে এখন এমনকি ইন্টারঅ্যাক্টিভ পর্নেরও দেখা মেলে। একসময় পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে দেখা বা পাড়ার ভিডিও ক্লাব থেকে ভাড়া করার কারণে সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তা চারদেয়ালের গৃহে নিরাপদে ও অনায়াসে উপভোগ করা যায়। তাই পর্নোগ্রাফিকে বোঝা এখন জর"রি হয়ে পড়েছে। এর ব্যক্তিক-সামাজিক প্রভাব ও নৈতিক বিপর্যয়ের দিকটি যেমন বোঝার দরকার আছে, পাশাপাশি একটি 'মতাদর্শিক যন্ত্র' হিসেবে পর্নোগ্রাফি কী বার্তা বহন করে, তা উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। তবে আজ যেমন আমরা চলচ্চিত্রকেই ব্যাপক অর্থে পর্নোগ্রাফিক মাধ্যম হিসেবে মনে করছি, এর অস্ড়িত্ব পেইন্টিং, আলোকচিত্র ও বিশেষত সাহিত্যে অনেক আগেই দেখা গিয়েছে। এই প্রবন্ধে সাহিত্যের বিশেষত পশ্চিম সাহিত্যের অশ্লীলতা ও চলচ্চিত্রের পর্নোগ্রাফির ইতিহাস, বিবর্তন এবং এর লক্ষ্য বা শিকার কে বা কারা তা বিচারের পাশাপাশি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে এসবের জেন্ডার প্রসঙ্গের দিকে।

আন্দ্রিয়া দোরকিন (দোরকিন, ২০০৩: ৩৮৭) বলছেন, 'পর্নোগ্রাফি' (pornography) শব্দটি এসেছে গ্রিক 'পর্ন' (porne) ও 'গ্রাফোস' (graphos) শব্দদ্বয় থেকে যার অর্থ "বেশ্যাদের (whores) নিয়ে লেখালেখি"। পর্ন অর্থ বেশ্যা, বিশেষত অতি নিচু স্ড়রের বেশ্যা, যাদের প্রাচীন গ্রিসের বেশ্যালয়গুলোতে পাওয়া যেত এবং সব পুর"ষ নাগরিকের জন্য সহজপ্রাপ্য ছিল। সুজান হেওয়ার্ড-এর মতে, [চলচ্চিত্রে] পর্নোগ্রাফি হলো একপ্রস্থ ইমেজসারি যা যৌনকামনা জাগিয়ে তোলার জন্য হাজির করা হয় এবং যাতে নগ্নতা ও যৌনকর্ম সরাসরি চিত্রায়িত হয় (হেওয়ার্ড, ২০০৬: ২৮৯)।

পর্নোগ্রাফির অস্ড়িত্ব অনেক আগে থেকে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকলেও, কেবলমাত্র ভিক্টোরীয় যুগে একে ঘিরে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা শুর" হয়, বিশেষত একে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশে। ঔপনিবেশিক সময়ে ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়া পৃথিবীব্যাপী শাসন করেন ১৮৩৭ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ড় যে সময়ে প্রধানত ভারতশোষণের মাধ্যমে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসন এক ধরনের সংস্কারাভিযান চালায়। ধীরে ধীরে তৈরি হয় ভিক্টোরীয় নৈতিকতা, যার রেশ ধরেই পর্নোগ্রাফিকে নিয়ন্ত্রণের চিন্ড়া শাসকদের মাথায় আসে।

পর্নোগ্রাফি, ইংরেজি শব্দ ইরোটিকা বলতে যা বোঝায়, তা থেকে আলাদা। ইরোটিকার উদ্দেশ্য হতে পারে, যৌনতার মতো স্বাভাবিক ও মৌলিক বিষয় নিয়ে, ও তাকে ঘিরে মানবিক সম্পর্কের ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে কোনো পেইন্টিং বা চলচ্চিত্র বা সাহিত্যকর্ম নির্মাণ। কিন্তু পর্নোগ্রাফির উদ্দেশ্য দর্শক-পাঠকের যৌনকামনাকে জাগ্রত করা। সাহিত্য, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র উভয়ক্ষেত্রেই পর্নোগ্রাফির প্রয়োগ দেখা যায়। পর্নোগ্রাফিনির্ভর অনেক পত্র-পত্রিকায় যেমন স্থিরচিত্র প্রকাশিত হয়, তেমনি সেলুলয়েড বা ভিডিও ফরম্যাটে অনেক পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়ে থাকে, যার বিপণন ইন্টারনেট কিংবা সিডি-ডিভিডির মাধ্যমে বিস্ড়ৃত হতে পারে। সত্যি বলতে, পর্নোগ্রাফি একটি বিরাট শিল্প এবং বিলিয়ন ডলার এখানে বিনিয়োগ হয়। পশ্চিমা দেশগুলোতেই এই শিল্পের প্রসার সবচেয়ে বেশি, তবে এর গ্রাহক বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান। তবে পশ্চিমা দেশসমূহে পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্র গ্রেডিং পদ্ধতিতে আইনের আওতায় প্রকাশ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর বাংলাদেশের মতো দেশে পর্নোগ্রাফির নির্মাণ ও পরিবেশনা গোপনে পরিচালিত হয়, তবে এর উৎপাদন খুব সীমিত। জনপ্রিয়ধারার চলচ্চিত্রে নব্বই দশকের শেষ থেকে ও শূন্য দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ড় 'কাটপিস' আকারে পর্নোগ্রাফির এক ধরনের বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতে সচিত্র কামসূত্রের অস্ড়িত্ব পাওয়া যায়, যা একধরনের সেক্স-ম্যানুয়েল বলে বিবেচিত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্ড়তরূপে লিবিডো বা কামভাবনানির্ভর কবিতা রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মতো কামকাব্য। আধুনিক সময়ের বাংলা সাহিত্যেও কামনির্ভর কাব্য-উপন্যাস-গল্প রচিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে পর্নোগ্রাফির ব্যাপক বিস্ড়ার ঘটেছে পশ্চিমা দেশসমূহে। ঐসব দেশে পর্নোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা ও বিশেণ্ডষণও হয়েছে বিশদভাবে এবং ঐসব বিশেণ্ডষণকে আশ্রয় করেই এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে পর্নোগ্রাফিক বা অশ্লীল সাহিত্যের প্রেক্ষাপটটা বিশেণ্ডষণ করা হবে পশ্চিমা রেনেসাঁ-পরবর্তী সাহিত্য অবলম্বনে এবং চলচ্চিত্রের বিশেণ্ডষণটি হবে

আধুনিক সময়কে ধরে। অবশ্য মাধ্যম হিসেবেও সাহিত্য প্রাচীন এবং চলচ্চিত্রের বয়স এক শতকের একটু বেশি মাত্র। চলচ্চিত্রের আগমণে পর্নোগ্রাফি বিষয়টা চলচ্চিত্রের একলার অধিকারে চলে গেছে যেন। পুরনো ইউরোপীয় সাহিত্য বিচার করলে দেখা যাবে সেখানে পর্নোগ্রাফি এসেছে একধরনের প্রতিরোধের জায়গা থেকে—বিশেষত রাজতন্ত্র ও চার্চকে আঘাত করার জন্য সাহিত্যে যৌনতার মতো বিষয়কে বেছে নেয়া হয়েছে। পুর"ষপ্রাধান্যের সেসব সাহিত্যে অবশ্যই নারীর অবমাননা হয়েছে, কিন্তু এসব সাহিত্যের রাজনৈতিক দিকটিকে উপেক্ষা না করে আমলযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। আর কারও কারও 'অশ"ীল' সাহিত্য দার্শনিক একটি পর্যায়েও উপনীত হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নিরেট পর্নোগ্রাফি, নারী-পুর"ষের যৌনকর্মের সরাসরি চিত্রায়ণ। নারী-পুর"ষের যৌনতানির্ভর সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের জটিলতাকে ঘিরে মনোদৈহিক একটি ন্যারেটিভ এসব ছবিতে পাওয়া যায়না। পর্নোগ্রাফি হলো মূলধারার বা বিকল্পধারার বাইরে চলচ্চিত্রের একটি পৃথক জঁরা (genre)। ফলে পুর"ষদর্শকদের জন্য নির্মিত এবং পুর"ষ প্রযোজক-পরিচালক দ্বারা সৃষ্ট এসব চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান চরমভাবে অবমূল্যায়িত হয়।

পর্নোগ্রাফির কাঁচামালই হলো নারী ও তার শরীর, যা পুর"ষের যৌনকামনা জাগ্রত করার জন্য ও পুর"ষপ্রযোজকদের মুনাফার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি এই দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে গিয়ে কীভাবে নারী পুর"ষের আধিপত্য-পীড়ন-অধ"স্তনতার শিকার হচ্ছে, পর্নোগ্রাফির সেই মতাদর্শিক নির্মাণের দিকটিকে এই প্রবন্ধে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরাই পর্নোগ্রাফির বির"দ্ধে, বিশেষত সেখানে নারীর অধ"স্তন রূপায়ণের বির"দ্ধে, উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। ভ্যালেরি মাইনার-এর মতে, "পর্নোগ্রাফি যতটা না যৌনতার প্রকাশ তার চাইতে বেশি করে [পুর"ষের] ক্ষমতার চর্চা" (স্টার্ন উদ্ধৃত, ১৯৯২: ১৯৯)।

একসময় মনে করা হতো পর্নোগ্রাফি কেবলই যৌনকর্মের খোলামেলা উপস্থাপন, এমনকি নারীরাও পর্নোগ্রাফি থেকে যৌনতাকে আস্বাদন করতে পারেন, তাকে কেবল পুর"ষ-ভয়ারের[১] জায়গায় নিজেকে স্থাপন করতে হবে। রেপ্রিজেন্টেশনের আলোচনায় মিশেল ফুকো বলেন,

[১] ভয়ার বলতে এমন একজনকে বোঝায় যিনি গোপন কোনো স্থান থেকে কিছু দেখার সুবিধা পেয়ে থাকেন। আদি অর্থে ভয়ারিজম হলো এমন একটি ক্রিয়া যেখানে একজন ব্যক্তি গোপন কোনো স্থান থেকে কারও যৌনক্রিয়া অনুমতি ছাড়াই দেখে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের দর্শকদেরও ভয়ার আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে, কারণ তারা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্রিয়াকর্ম চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের পর্দায় দেখে থাকেন। [Timm O'Sulivan et al eds. (1994), Key Concepts in Communication and Cultural Studies, Routledge, London, p. 331]

পুর"ষদের-জন্য-তৈরি পর্নোগ্রাফি নারীদের জন্য 'কাজ' করবে তখনই, যখন নারী কোনো-না-কোনো ভাবে নিজেকে 'কাঙ্ক্ষিত পুর"ষ ভয়ার'-এর আসনে বসাতে পারবে; পুর"ষ-পর্নোগ্রাফির ডিসকোর্স যে-আদর্শ-কর্তা-আসন তৈরি করে তা আসলে একটি 'কাঙ্ক্ষিত পুর"ষ ভয়ার'-এর আসন, যার মাধ্যমে পুর"ষতান্ত্রিক পুর"ষ-আসন থেকে পর্নোগ্রাফির পাত্র-পাত্রীদের দেখা হয়ে থাকে (হল উদ্ধৃত, ১৯৯৭: ৫৬)।

অনেক নারীবাদী তাত্ত্বিক মনে করেন, পর্নোগ্রাফি কেবলই পুর"ষদর্শকের জন্য নির্মিত যৌনকর্মের প্রদর্শনী নয়। এর সঙ্গে লৈঙ্গিক সম্পর্কের বিষয় জড়িত রয়েছে, রয়েছে ক্ষমতা-প্রশ্নও, ফুকোও যেদিকটার কথা উলেণ্ঢখ করেছেন। লরা কিপনিস-এর মতে পর্নোগ্রাফি প্রতিষ্ঠা করে, "পুর"ষতান্ত্রিক ক্ষমতা এবং নারীর অধ"স্তনতা ও পীড়নের ধারাবাহিকতা" (কিপনিস, ১৯৯৮: ১৫৩)। তবে তৃতীয় তরঙ্গের[২] ও উত্তরাধুনিক নারীবাদীদের একটি অংশ পর্নোগ্রাফিবিরোধী নন; তারা মনে করেন, পর্নোগ্রাফি দেখা ও তাতে অংশ নেয়া একজন নারীর ব্যক্তিগত র"চি ও অধিকারের মধ্যে পড়ে, পুর"ষতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক বিধিনিষেধ বা নৈতিকতা দিয়ে তাকে আটকানো যাবে না। পর্নোগ্রাফির পক্ষের অনেকে হার্ড ও সফট পর্নোগ্রাফিকে অনুমোদন করলেও, চাইল্ড পর্নোগ্রাফিকে অনুমোদন করেননা। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হাইকোর্ট চাইল্ড পর্নোগ্রাফির বির"দ্ধে একটি রায় দিয়েছে।

কিন্তু এখন পর্যন্ড় পর্নোবিরোধী নারীবাদীদের দাবিই শক্তিশালী। পর্নোবিরোধী নারীবাদীদের মধ্যে আবার দুটি ধারা আছে। একপক্ষ মনে করেন পর্নোগ্রাফি পারিবারিক মূল্যবোধ ও বৈবাহিক যৌনতার ধারণার ওপরে আঘাত। আরেক পক্ষ পর্নোগ্রাফিকে নারীর অবমূল্যায়ন ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আখড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রবন্ধ দ্বিতীয় পক্ষের অবস্থানের আলোকে পর্নোগ্রাফিকে বিশেণ্ঢষণ করতে চেয়েছে। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধের

[২] যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগ পর্যন্ড় যে নারীবাদী চিন্ড়র প্রকাশ ঘটে তার প্রবক্তাদের প্রথম তরঙ্গের নারীবাদী বলা হয়। তারা প্রথমত নারীদের ভোটাধিকারের মতো মৌলিক বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীদের চিন্ড়র প্রকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দির ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ড় । এই ধারায় অর্থনীতি থেকে প্রজনন পর্যন্ড় নানা ইস্যুতে সমাধিকারের আন্দোলন হয়। আশির দশক থেকে এখন পর্যন্ড় যে নারীবাদী চিন্ড়র প্রকাশ তাকে তৃতীয় তরঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়। তারা বর্ণ, শ্রেণী ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে নারীবাদকে সংযুক্ত করেন এবং যেকোনো ধরনের বৈষম্যের বির"দ্ধেই কথা বলেন। বলাবাহুল্য দ্বিতীয় ও তৃতীয়, উভয় তরঙ্গের নারীবাদীরা পূর্ববর্তী নারীবাদীদের নানা ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করেছেন। [www.en.wikipedia.org (Third Wave Feminism)]

চাইতে এর জেন্ডারপ্রসঙ্গকে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

ক. সাহিত্যের পর্নোগ্রাফি

পশ্চিমা সাহিত্যে পর্নোগ্রাফির বিশ্লেষণ অংশটির আলোচনার জন্য আমি ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছি মারিয়ানা বেকের 'দ রুটস্ অব ওয়েস্টার্ন পর্নোগ্রাফি' শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধের ওপর (বেক, ২০০৩)। বেক পশ্চিমা সাহিত্যে পর্নোগ্রাফির বিকাশের জন্য মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার, উপন্যাসের আবির্ভাব, ইউরোপে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব, ভিক্টোরীয় এনলাইটেনমেন্ট, ফরাসি বিপ্লব ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে, সাহিত্যের পর্নোগ্রাফির ভূমিকা ছিল 'সীমালঙ্ঘনকারী'র। বিশেষত রাজতন্ত্র ও চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আঘাত করার জন্য পর্নোগ্রাফির আশ্রয় নেয়া হতো। দেখা যেত চার্চের ফাদার ও নানের মধ্যকার যৌনসম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ হাজির করা হচ্ছে। কিংবা ফরাসি বিপ্লবের পরে দেখা গেছে রানি মেরি-আন্তোয়ানেতকে নিয়ে বহু পাম্ফলেট রচিত হয়েছে, যেখানে অঙ্কিত চিত্রে রানিকে হাজির করা হয়েছে নানা যৌনকর্মের আসনে, নানা পুরুষের সঙ্গে। রানিকে উলঙ্গ করার মাধ্যমে বিপ্লবীরা প্রকারান্তরে পুরো রাজতন্ত্রকেই উলঙ্গ করতে চেয়েছে, অবমাননা করতে চেয়েছে। বিংশ শতকে এসে পশ্চিমা পর্নোগ্রাফিতে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এর রাজনৈতিক ভূমিকা অপসৃত হয়েছে এবং কেবলই যৌনতার নানা অনুষঙ্গকে নিয়ে রচিত হয়েছে।

আই মোদি

পশ্চিমা সাহিত্যে পর্নোগ্রাফির শেকড় খুঁজতে গেলে আদি নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যাবে পিয়েত্রো আরেতিনোর আই মোদি (I Modi) নামক কাব্যগ্রন্থকে, যার অর্থ 'পন্থাসমূহ'। এটি ছিল কামকাব্যবিশেষ, বা আরও স্পষ্টভাবে বললে কামসনেটগুচ্ছ যার সঙ্গে তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ১৬টি চিত্র ছিল, ১৬টি সনেটের সঙ্গে। চিত্রগুলোতে দেখা যায় নানা আসনে মৈথুনরত নারী ও পুরুষযুগলকে। আরেতিনো ভেনিসে ১৪৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখতেন। তিনি সাংবাদিক ও পুস্তক প্রকাশকও ছিলেন। আই মোদি অন্তত দু'টি উদ্দেশে রচিত হয়েছিল: এক, লাগামহীন যৌনতার চিত্রায়ণ, যেজন্য আরেতিনো সুশীল যৌনতাসম্পর্কিত শব্দ বাদ দিয়ে একেবারে আঞ্চলিক ও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন; দুই, রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা।

এছাড়া কাব্যগ্রন্থটির আরও একটি দিক ছিল যে, নারীচরিত্রদের এখানে ব্যাপকমাত্রায় যৌনক্ষুধার্ত হিসেবে হাজির করা হয়েছে, যা প্রকারান্তরে যুগ যুগ ধরে চাপিয়ে-দেয়া চার্চীয় নৈতিকতাকে ব্যঙ্গ করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দির

'ইউরোপর্ন'গুলোতে নারীকে সক্রিয় ও ক্ষুধার্ত ভূমিকাতেই দেখা যায়। ল'একল দেস ফিলেস (১৬৫৫) ও ল'একল একাদেমিয়া দেস দেমস (১৬৮০) নামক দু'টি প্রাথমিক ফরাসি পর্নোসাহিত্য নারীচরিত্রের সংলাপের ভিত্তিতেই রচিত। পর্নোসাহিত্যের এটাই একটা শক্ত রীতি হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় যা পরবর্তী সময়ে জন ক্লেল্যান্ডের মেমোয়ার্স অব এ ওম্যান অব পেণ্ঢজার কিংবা মার্কুয়িস দি সাদ-এর জুলিয়েটসহ অনেক পর্নোসাহিত্যে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। আরেতিনো একাই ইউরোপে যৌনসাহিত্যের একটি বাজার সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তী পর্নোগ্রাফি-লেখকেরা আরেতিনোর দেখানো পথ ধরেই এগিয়েছেন। ফ্রান্সে ফরাসি বিপণ্ঢবের পূর্বে ও পরে পর্নোসাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। চার্চ ও রাজতন্ত্রকে আঘাত করা ও নারীচরিত্রের সক্রিয় ভূমিকা—এই দুইটি বড়ো বৈশিষ্ট্য এসব সাহিত্যে লক্ষ করা যায়।

ফ্রান্স : রাজনৈতিক পর্নোসাহিত্য ও সাদ

ল'একল দেস ফিলেসকেই ফ্রান্সে পর্নোসাহিত্যের শুর বলে গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থটি ১৬ বছর-বয়েসী ফ্যানি এবং তার বয়সে বড়ো ও অভিজ্ঞ কাজিন সুজানের মধ্যকার আলাপচারিতাবিশেষ। গ্রন্থটি ধর্ম বা পিতা-মাতার শেখানো সব নৈতিক শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এর নারীচরিত্রগুলো আলাপে খুবই খোলামেলা ও যৌনতাবিষয়ে উৎসাহের সঙ্গে এরা আলাপ করে। গ্রন্থের লেখক মিচেল মিলত ও জাঁ ল'আনে গ্রন্থটির জন্য অল্প কিছুদিনের জেলভোগ করেন। ধারণা করা হয়, গ্রন্থটির সত্যিকারের লেখক অন্য কেউ এবং রাজনৈতিক কোনো হোমরাচোমরা হবেন। গ্রন্থটির সঙ্গে অনেক লেখকই নাকি জড়িত ছিলেন—এরকম একজন হলেন রাজা চতুর্দশ লুইয়ের রক্ষিতা মাদাম দি মেইন্টেনন ও রাজার অর্থমন্ত্রি নিকোলাস ফুকেত। চতুর্দশ লুইয়ের স্বৈরাচারিতার সময়ে ল'একল দেস ফিলেস যৌনতা ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্যে একধরনের ফিউশন তৈরি করে যার প্রভাব ও রীতি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দির সাহিত্যে ব্যাপকমাত্রায় দেখা যায় এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপণ্ঢব পর্যন্ড় যা একটা গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে ফরাসি বিপণ্ঢবের পরেও পর্নোসাহিত্যের আয়তন ও মাত্রা আরও বেড়ে যায়, এবং এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক আঘাতের হাতিয়ার হিসেবে পর্নোকে ব্যবহার করা হয়। তবে এই জায়গায় এসে নারীচরিত্রের যে সক্রিয় ও প্রাধান্যশীল ভূমিকা ছিল, তা চলে গিয়ে আক্রান্ড্রের ভূমিকায় তাকে দেখা যায়। অবশ্য আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে রাজা ষোড়শ লুইসহ কোনো অভিজাতই বাদ যাননি। ষোড়শ লুইয়ের রানি মারি-আন্ড্রিনিওতের ওপর আক্রমণ হয় সবচেয়ে বেশি। তাকে দেখানো হয় রীতিমতো বেশ্যার ভূমিকায়, সমকামিতায় এবং চিত্রমালায় তাকে নিম্নবিত্তের লোকজনের সঙ্গে সঙ্গমরত দেখানো হয়েছে।

এমনকি তার সঙ্গম-সাথী হিসেবে তার ছোট ছেলেকেও দেখানো হয়েছে। ১৭৯৩ সালে তার মৃত্যুদ কার্যকর হবার আগ পর্যন্ড় এই আক্রমণ চলতে থাকে। এইসব কষ্টকল্পিত আক্রমণের মাধ্যমে লেখক-চিত্রকররা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে রাজা যদি তার স্ত্রীকেই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তবে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে কীভাবে আনুগত্য প্রত্যাশা করেন?

ফরাসি বিপণ্ঢবের কিছুকাল পরে পর্নোসাহিত্যের উচ্চকিত রাজনৈতিক বক্তব্যের দিকটি ক্রমশ দূরীভূত হয় এবং বিশেষত মার্কুইজ দি সাদের সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণ সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাদ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য না করে প্রথাগত সব সামাজিক নৈতিকতাকে আক্রমণ করতে পর্নোসাহিত্য অবলম্বন করেন। যৌনতৃপ্তির জন্য শরীরে সর্বোচ্চ পীড়ন বা বিনাশ—সাদের সাহিত্যে এই ভাবনার প্রয়োগ দেখা যায়। এজন্য তিনি নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেন—বেপরোয়া কামুক, উন্মত্ত লম্পট, মেধাবি দার্শনিক এরকম নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাদ তার যৌনদর্শন সৃষ্টি করেন। বুর্জোয়া সংবেদনশীলতায় আস্থাবান থাকা এবং সামাজিক কিংবা যৌন নৈতিকতার সম্পূর্ণ ধ্বংস করাই সাদের লক্ষ্য ছিল। জাস্টিন ও জুলিয়েট নামক দু'টি উপন্যাসে সাদের সব জগত-ওল্টানো ভাবনা বেশিমাত্রায় বিধৃত ছিল। পর্যবেক্ষকরা বলেন বিংশ শতাব্দির অস্ড়িত্ববাদ (এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম) ও নাস্ড়িবাদ (নিহিলজিম) দর্শন সৃষ্টিতে সাদের ঐ দুইটি উপন্যাসের অবদান রয়েছে। ১৭৪০ সালে অভিজাত পরিবারে জন্ম নেয়া সাদ ফরাসি বিপণ্ঢবের পূর্বের রাজা ও বিপণ্ঢবী, উভয় শাসক দ্বারাই টানা ২৭ বছর কারাভোগ করেন। তার সাহিত্য এতটাই বিধ্বংসী ছিল যে বিংশ শতাব্দির আগ পর্যন্ড় তার বেশিরভাগ সাহিত্যকর্মই পাঠসুলভ ছিলনা। কেউ কেউ মনে করেন সাদের ম্যানিয়া ছিল যৌনতা নয়, ধর্ম নিয়ে—ধর্মকেই তিনি আঘাত করেছেন বেশি। তবে বিষমকাম, সমকাম, বিকৃতকাম—যৌনতার এমন কোনো ধরন নাই যার চর্চা তিনি তার সাহিত্যে করেননি। বরং বলা যায় তার পরের সময়কার পর্নোসাহিত্য তার নির্দেশিত পন্থাই ঘুরেফিরে ব্যবহার করেছে।

ইংল্যান্ড : ফ্যানি হিল ও ভিক্টোরীয় যুগের পর্নোসাহিত্য

ইংরেজরা ফরাসিদের বৈপণ্ঢবিক রাজনীতি ও পর্নোসাহিত্যকে ভয় পেত। তবে ১৭৪৮ সালেই তারা তাদের প্রথম উলেণ্ঢখযোগ্য পর্নোসাহিত্য পেয়ে যায়। জন ক্লেল্যান্ডের মেমোয়ার্স অব এ ওম্যান অব পেণ্ঢজার, পরে ফ্যানি হিল নামে পরিচিত এ-হলো সেই উপন্যাস যা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার পুনঃমুদ্রিত ও অনূদিত হয়। তবে দুই শতক ধরে এটার প্রকাশনা বেআইনি ছিল, ইংল্যান্ডে কেবল ১৯৭০ সালে প্রথম উপন্যাসটি আইনি আওতায় প্রকাশিত হয়। ১৭৪৮ সালে এটা প্রকাশিত হবার পর তার প্রতিক্রিয়া এতই

ব্যাপক হয় যে তার নমুনা হিসেবে বলা যায়, লন্ডনের বিশপ ইংল্যান্ডে দু'-দু'বার ভূমিকম্পের জন্য এই বইটিকেই দায়ী করেন। বইটি প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই ক্লেল্যান্ড ও তার প্রকাশক গ্রেফতার হন। কারামুক্তির পর ক্লেল্যান্ড বইটির এক-তৃতীয়াংশ ছেঁটে ফেলেন—যার মধ্যে যৌনসংক্রান্ড় আপত্তিকর বিষয়ই বেশি ছিল—পুনর্লিখিত বইটির নাম দেয়া হয় ফ্যানি হিল। এটি প্রকাশের পর ক্লেল্যান্ড আবার গ্রেফতার হন, তবে এবার কোনো সাজা হয়নি।

প্রকাশক ফ্যানি হিল-এর প্রকাশনা চালিয়ে যান কিন্তু অকর্তিত মেমোয়ার্স-এর পাইরেটেড সংস্করণের চাহিদাই ইউরোপজুড়ে বেশি ছিল। যুগ যুগ ধরে, এমনকি দুই শতক জুড়ে এই সংস্করণটি আন্ডারগ্রাউন্ড-সংস্করণ হিসেবে গোপনে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাটি যৌনতার জয়গান করে আর সমাজ ও ধর্মের চাপিয়ে দেয়া নৈতিকতার পাহাড়কে আঘাত করে। উপন্যাসটি মূলত জনৈতি 'ম্যাডাম'-এর কাছে উত্তম পুর"ষে লেখা ফ্যানির পত্রাবলি, যাতে ফ্যানির নানা যৌনকেলেঙ্কারির স্বীকারোক্তি বিধৃত রয়েছে। কিন্তু তার এই দুঃসাহসিক দুষ্কর্মের স্বীকারোক্তিতে ফ্যানির কোনো অনুশোচনা নেই, বরং পাঠককে যৌনপুলক দেবার মাধ্যমে সেসবের জয়গান গাওয়া হয়েছে। ক্লেল্যান্ড অবশ্য তার উপন্যাসে যৌনাত্মক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা পথের-মুখের ভাষা ব্যবহার না করে র"চিবান ও সৃষ্টিশীল শব্দাবলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। এক পুংদরেই তিনি ৫০টি পরিভাষা ব্যবহার করেন। যেমন, তুষ্টির যন্ত্র (ইন্সট্রুমেন্ট অব পেণ্ডজার)। আর স্ত্রীলিঙ্গের পরিভাষা হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন 'প্রেমের নরম পরীক্ষাগার'-এর (সফট ল্যাবরেটরি অব লাভ) মতো পরিভাষা।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে পর্নোসাহিত্যের কেন্দ্র ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে স্থানান্ড়রিত হয় এবং একটি বাণিজ্যিক চেহারা পায়। তবে সাদপ্রদর্শিত পথেই ইংরেজি পর্নোসাহিত্য বিকশিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দি হলো ভিক্টোরীয় নৈতিকতার শতক, অথচ এই শতকেই সবচেয়ে বেশি পর্নোসাহিত্য বিকাশ লাভ করে। এই শতকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৈতিকতার একটি মানদ" ঠিক করে দেয়া হয়, যে-নৈতিকতা ছিল রক্ষণশীল ও নিরাপদ। নারী ও কমবয়েসীদের সমস্ড় কলুষতা থেকে রক্ষা করার জন্য সাহিত্যকে সকল ধরনের 'অনিরাপদ' উপাদান থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এমনকি ১৮১৮ সালে থমাস বোডলার নামের এক ডাক্তার শেক্সপিয়রের পারিবারিক সংস্করণ প্রকাশ করেন যা দি ফ্যামিলি শেক্সপিয়র নামে পরিচিত ছিল। আপত্তিকর অংশগুলো বাদ দিয়ে একটি 'পরিশুদ্ধ' শেক্সপিয়র প্রকাশ করা হয়, এবং মনে করা হয় এ হলো এমন এক শেক্সপিয়র, যা একজন বাবা তার মেয়েকে নিয়ে উচ্চস্বরে আস্থার সঙ্গে পড়তে পারবেন। বোডলারের এই সংস্করণ খুব জনপ্রিয় হয় এবং পাশাপাশি

'বোডলারীকরণ'ও জনপ্রিয় হয়। নিরাপদ সাহিত্য দিয়ে কতটুকু নারী ও কমবয়েসীদের নিরাপদ রাখা গিয়েছিল তা প্রশ্নসাপেক্ষ, তবে পুর"ষদের জন্য এই যুগেই ব্যাপকমাত্রায় পর্নোসাহিত্য রচিত হতে থাকে। তাই এটা একটা পরিহাস যে, নিরাপদ সাহিত্য সৃষ্টির সচেতন প্রচেষ্টার বিপরীতে এই সময়েই সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ সাহিত্য রচিত হতে থাকে। ১৮৩৪ সালের একটি পরিংখ্যান বলে যে, লন্ডনের কেবল একটি রাস্ড়াতেই ৫৭টি পর্নোবিক্রয়কেন্দ্রের অস্ড়িত্ব ছিল।

এই সময়ের একটি উলেণ্টখযোগ্য উপন্যাস হলো দি লাস্টফুল টার্ক এবং এর লেখক ছিলেন মহাজনপ্রিয় জনৈক (এনোনিমাস)। সাদবাদ প্রভাবিত এই উপন্যাসে দেখা যায় এক কুমারি ধর্ষিত হবার পরে ব্যাপকভাবে যৌনক্ষুধায় তাড়িত হয়ে পড়ে থাকে। কুমারিদের এরকম কামক্ষুধায় তাড়িত হয়ে পড়া এই শতাব্দির পর্নোসাহিত্যের একটি সাধারণ থিমে পরিণত হয়। এরকম আরও কয়েকটি উপন্যাস হলো এ সিক্রেট লাইফ, দি রোমান্স অব লাস্ট, দি অ্যামাটরি এক্সপেরিয়েন্সেস অব এ সার্জন, দি অটোবায়োগ্রাফি অব ফ্লিয়া ইত্যাদি।

উনবিংশ শতকের পর্নোসাহিত্য আর রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণাগুলোকে আঘাত করে না, কিন্তু যৌনতা সম্পর্কিত ধারণায় প্রবলভাবেই আঘাত করে। ভিক্টোরীয় যুগের সামাজিক সংস্কার বিষমকামকেই একমাত্র যৌনতা-রীতি বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। বিশেষত সমকামিতাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয়না। কিন্তু সাদ-প্রভাবিত পর্নোসাহিত্যে যৌনতার সম্ভাব্য সকল ধরনের দেখা মেলে। আর এই সময়ের পর্নোাহিত্যেও নারীচরিত্রগুলোকে খুব যৌনতা বিষয়ে আগ্রাসী ও প্রবলভাবে কামতাড়িত দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দির পশ্চিমা পর্নোসাহিত্য

বিংশ শতাব্দিতে ভিক্টোরীয় নৈতিকতার মতো কোনো আরোপিত বিধিনিষেধ পশ্চিমে ছিলনা। তবুও অশণ্টীলতার দায়ে ডি এইচ লরেন্স, হেনরি মিলার, নরমান মেইলার, ভণ্ডাদিমির নবোকভ, জেমস জয়েস, র‍্যাডক্লিফ হলের মতো অনেক লেখককেই আইন-আদালতে বিচারাধীন থাকতে হয়েছে। 'অশণ্টীল' সাহিত্যের এই ধারায় ডি এইচ লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার (১৯২৮) কিংবা ভণ্ডাদিমির নবোকভের লোলিতা সবচাইতে আলোচিত। জেমস জয়েসের মাস্টারিপস ইউলিসিসও (১৯২২) অশণ্টীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। নবোকভের লোলিতা (১৯৫৫) হলিউডে দুইবার চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে, একবার স্ট্যানলি কুব্রিক (১৯৬২) এবং আরেকবার এড্রিয়ান লিন (১৯৯৭) ছিলেন এর পরিচালক। এবং দ্বিতীয়বার মুক্তি পাবার সময়ও ছবিটি উপন্যাসের মতোই অভিযুক্ত হয়েছে। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারও দুবার ইংরেজি ভাষায় ও একবার ফরাসি ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দিতে পর্নোসাহিত্য বিষয়ে প্রতিষ্ঠান ও পাঠকের সহনশীলতা অনেক বেড়েছে, কিন্তু অশ্লীলতার অভিযোগ সবসময়ই উঠেছে, কখনো কখনো আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হয়েছে লেখক-প্রকাশককে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দির মতো এই শতকে পর্নোসাহিত্যের রাজনৈতিক ভূমিকা নেই, নারী-পুরুষের যথেচ্ছ যৌনজীবনকেই অবলম্বন করা হয়েছে। তবে এই শতাব্দির শেষের দিকে পর্নোসাহিত্যের নতুন কিছু ধারার সৃষ্টি হয়। যেমন সমকামী সাহিত্য ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে বিকশিত হয়। গে ও লেসবিয়ানদের পৃথক সাহিত্য ও পৃথক বুকস্টোরের জন্ম নিয়েছে বিংশ শতাব্দিতে। এসব সাহিত্যের সিংহভাগজুড়ে যৌনতা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর অশ্লীলতা সম্পর্কিত ধারণা এই শতকের মধ্যেই বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। এক প্রজন্মে যা নোংরা (ডার্ট) সাহিত্য বলে নিন্দিত হয়েছে, আরেক প্রজন্মে তা নান্দনিক (আর্ট) সাহিত্য বলে নন্দিত হয়েছে। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার কিংবা লোলিতা নিয়ে পাঠকের আর সেই অভিযোগ নেই।

পর্নোসাহিত্য নিয়ে বিংশ শতাব্দিতে পাঠকের মনোভাব পরিবর্তিত হবার একটি কারণ বোধহয় নতুন মাধ্যম চলচ্চিত্রে পর্নোগ্রাফির ব্যাপক উপস্থিতি। সাহিত্যে পর্নোগ্রাফি হলো ফিকশন, কিন্তু চলচ্চিত্রে পর্নোগ্রাফি যেন প্রায়-বাস্তব। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম হবার কারণে পর্নোগ্রাফি আর পর্নো চলচ্চিত্র প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। পর্নোসাহিত্যে সাহিত্যের মাত্রা বেড়ে গিয়ে প্রায় মূলধারার সাহিত্য হয়ে ওঠে, আর পর্নো চলচ্চিত্র কেবলই সব ধরনের সঙ্গমদৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করতে থাকে।

পশ্চিমা পর্নোসাহিত্যে নারীর অবস্থান কোথায়?

পর্নো চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান একতরফাভাবে অবমাননামূলক হলেও, পর্নোসাহিত্যে নারীর অবমূল্যায়নই কেবল একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। বিশেষত সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দিতে পর্নোগ্রাফির লক্ষ্য ছিল চার্চ ও রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করা। তবে এজন্য লেখকেরা নারীর শরীরকে ব্যবহার করেছেন, নারীকে যৌনকাতর মাংসপি হিসেবে হাজির করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, সমাজ নারীকে যেরকম অক্রিয় ও পুত-পবিত্র মনে করে, নারীকে এসব সাহিত্যে কামকাতর ও আগ্রাসী হিসেবে দেখানোর মাধ্যমে সেই প্রথাগত ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়। সাদের সাহিত্যে নারীকে কখনও কখনও এতটাই আগ্রাসী দেখানো হয়েছে যে, পুরুষরা নারীতে গমন করতে সাহস পায়না, নিজেদের মধ্যেই তারা পায়ুপথে সঙ্গম করতে থাকে। জুলিয়েট এমনকি পোপের সঙ্গেও যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু নারীশরীরকে যেমাত্রায় নিপীড়ন করে সাদিজম, তা চরমভাবে পুরুষতান্ত্রিক। সাদের ধর্ষকামিতা পুরুষের যৌনভাবনায় একটি দার্শনিক ভিত্তি গেড়ে দিয়েছে চিরতরে। আর

ফরাসি বিপ্লবের পরে রানিকে যে আক্রমণ করা হয়েছে তা সর্বাংশে একটি পুরুষতান্ত্রিক আক্রমণ। এক্ষেত্রে মূল আক্রমণের লক্ষ্য রাজাকে সাহিত্যে হেনস্থা না করে, রানিকে বেশ্যার পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে এই ভাবনা থেকে যে এতে রাজাই শেষপর্যন্ত জব্দ হবে। বিংশ শতাব্দির নন্দনমুখী অশ্লীল সাহিত্য, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, নারীকে নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক যথেচ্ছাচারের প্রকাশমাত্র। লোলিতা উপন্যাসে দেখা যায় মধ্যবয়সী নায়ক হামবার্টের প্রতি লোলিতার মা আকৃষ্ট, কিন্তু হামবার্ট আকৃষ্ট বালিকা লোলিতার প্রতি। নায়ক মাকে বিয়ে করে এজন্য যে লোলিতাকে এর মাধ্যমে কাছে পাওয়া যাবে। এই কাহিনী আসলে পুরুষ লেখকের মনোস্তাত্ত্বিক পারভারশনের নান্দনিক প্রকাশমাত্র।

খ. চলচ্চিত্রে পর্নোগ্রাফি

পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য বা আলোকচিত্রের অস্তিত্ব বহুকাল ধরে দেখা গেলেও, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, ১৯২০-এর দশক থেকে এর অস্তিত্ব দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রই হয়ে ওঠে পর্নোগ্রাফির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যবহৃত মাধ্যম। পর্নোগ্রাফি বলতে অনেকে পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্রই বুঝে থাকেন। তবে পশ্চিমা দেশগুলোতে ষাটের দশকের শেষ থেকে চলচ্চিত্রে সেন্সরপ্রথা ধীরে ধীরে উঠে গেলে পর্নোগ্রাফি ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে। গ্রেডিং-প্রথার আওতায় কেবল 'এক্স' রেটিং নিয়েই এধরনের চলচ্চিত্র অবাধে নির্মিত হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পর্যায়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পর্নো-চলচ্চিত্র হলো বিহাইন্ড দ্যা গ্রিন ডোর (মিশেল ব্রাদার্স, ১৯৭১)। ১৯৭০ দশকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ফ্রান্সে পর্নোগ্রাফির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। ফ্রান্সে এসময়ে মোট চলচ্চিত্রের প্রায় অর্ধেকই ছিল পর্নো ছবি (হেওয়ার্ড, ২০০৬: ২৯০)।

তবে এধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে উচ্চহারের কর নির্ধারিত ছিল। ১৯৭০ দশকের শেষে ভিডিও প্রযুক্তি আগমণের ফলে করের ঝামেলাও আর থাকল না, ভিডিও-ছবি করের আওতামুক্ত থাকে। ভিডিও-মাধ্যমে ছবি নির্মাণের ব্যয়ও অনেক কম। ১৯৮০-র দশকে দেদারে ভিডিওতে পর্নো-ছবি নির্মিত হতে থাকল। হলিউড ভিডিওর একচ্ছত্র আধিপত্যের সঙ্গে পালণ্ডা দিতে গিয়ে নিজস্ব পথ বের করার চেষ্টা চালিয়ে গেল। 'আর' বা 'রেস্ট্রিক্টেড' সনদ নিয়ে পর্নোর কাছাকাছি উপাদান মিলিয়ে হলিউডে চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকল। ফিল্ম নোয়া[৩] ও পর্নের সংকর-জঁরা সৃষ্টি হলো, নাম দেয়া

[৩] ১৯৪০ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত সময়কালে নির্মিত হলিউড থেকে নির্মিত তথাকথিত 'কালোদের ছবি', যে-ছবিগুলো বিশেষত থ্রিলারধর্মী। ফরাসি তাত্ত্বিকদের দেয়া নামানুসারে ভরষস হড়রৎ-এর বৈশিষ্ট্য হলো: (১) হতাশাব্যঞ্জক বর্ণনা ও (২) একমাত্র আলোকউৎস ব্যবহার করে আলোকচিত্রিক কায়দায় সাদা-কালোর বৈপরীত্য বাড়িয়ে তোলা। ফিল্ম নোয়ায় সাধারণত নারী-

হলো 'ইরোটিক থ্রিলার'। অ্যাড্রিয়ান লিনের ফ্যাটাল অ্যাট্রাকশন (১৯৮৭) এই ধারার প্রথম বিখ্যাত ছবি। এই ধারায় পরে আনফেইথফুলসহ (২০০২, এই ছবিরও পরিচালক অ্যাড্রিয়ান লিন) আরও বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। আনফেইথফুল অবলম্বনে বলিউডে নির্মিত হয়েছে মার্ডার (২০০৪)। এভাবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলো পর্নোগ্রাফি ও ইরোটিকার মধ্যে যাওয়া-আসার মাধ্যমে বিরাট দর্শকশ্রেণীকে আকৃষ্ট করে চলেছে। ইউরোপ-আমেরিকার পাশাপাশি এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে হংকং বা জাপানেও পর্নোগ্রাফির বিরাট বাজার রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতেও পর্নোগ্রাফি নির্মিত হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে 'কাটপিস' আকারে হার্ডকোর পর্নো ও মূল ছবিতে সফট পর্নের প্রকোপ দেখা গিয়েছিল বিগত এক দশকে। তবে ভিডিও-প্রযুক্তি সহজলভ্য হয়ে যাবার কারণে পৃথিবীর সব দেশেই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে পর্নোছবি নির্মিত হচ্ছে ও পরিবেশিত-প্রদর্শিত হচ্ছে। আর ইন্টারনেট-প্রযুক্তি পৃথিবীর প্রতিটি দেশের যেকোনো গৃহে-অফিসে পর্নোগ্রাফি দেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। উলেণ্ঢখ্য যে ভারতীয় উপমহাদেশে পর্নো চলচ্চিত্র বণ্ঢু ফিল্ম নামেও পরিচিত।

এখন পর্নোগ্রাফি নারীর ইমেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে কী কী মতাদর্শিক ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার দিকে আলোকপাত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্যাথরিন এ. ম্যাককিনন (১৯৮৭, ১৯৮৯) ও আন্দ্রিয়া দোরকিনের (১৯৮১, ১৯৯৩) মতামত ও তাত্ত্বিক অবস্থান আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

লৈঙ্গিক বৈষম্যের প্রায়োগিক প্রদর্শনী

পর্নো চলচ্চিত্র কি কেবল নিরেট যৌনকর্মের প্রদর্শনী? নাকি তা কোনো না কোনো মতাদর্শ বহন করে? তাত্ত্বিকরা বিশেণ্ঢষণে দেখিয়েছেন যে, পর্নোগ্রাফি নারীকে বস্তুকরণ করে, পীড়ন করে, অপদস্ড় করে। অন্যদিকে পর্নোগ্রাফি পুর"ষের সহিংসতা, প্রাধান্য ও ক্ষমতার বন্দনা করে। আর নারীর একটি যৌনকেন্দ্রিক বা যোনীকেন্দ্রিক ইমেজ উপস্থাপন করে : সে যৌনাবেদনময়ী, সমর্পিত, অক্রিয়, অনুগত। পর্নোগ্রাফির সঙ্গে লৈঙ্গিকতার সম্পর্ককে তাই তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ যেমন আছে, তেমনি তা অতি প্রয়োজনীয়ও।

ক্যাথরিন ম্যাককিনন এবং আন্দ্রিয়া দোরকিন এই দুইজন নারীবাদী তাত্ত্বিক বলতে চেয়েছেন যে পর্নোগ্রাফি নারীর ওপরে পুর"ষের লৈঙ্গিক প্রাধান্যকে রেপ্রিজেন্ট করে। ম্যাককিনন বলেন, পর্নোগ্রাফি লৈঙ্গিক বৈষম্যকে যৌনরূপে প্রকাশ করে, তাকে তুষ্টিদায়ক হিসেবে তুলে ধরে, এবং জেন্ডার প্রেক্ষাপটে একে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দেয়। দোরকিন বলছেন যে এই পুর"ষপ্রাধান্য

চরিত্রের প্রাধান্য থাকে। [Anthony Easthope ed. (1993), Contemporary Film Theory, Longman, London, p. 204]

পর্নোগ্রাফিতে পুর"ষানন্দ রূপে হাজির হয়। তার মতে, পুর"ষপ্রাধান্যের লৈঙ্গিক নির্মাণ, পর্নোগ্রাফিতে এসে ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিয়ে দেয়। ম্যাককিননের মতে, পর্নোগ্রাফির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হচ্ছে সহিংসতাকে যৌনরূপে এখানে হাজির করা হয়, যা নারীর ওপরে পুর"ষের আগ্রাসী আচরণের একধরনের স্বীকৃতি দেয়। আর দোরকিন বলছেন যে, যৌনকর্মের একটি রূপ হিসেবে পর্নোগ্রাফি সহিংসতার একটি জগত নির্মাণ করে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সহিংস অপরাধের জন্ম দিতে সহায়তা করে। তার মতে, পুর"ষের প্রাধান্যশীল যৌনক্ষমতা আসে সমাজে বিদ্যমান সংস্কৃতির প্রতিফলন হিসেবে।

স্বরবিহীন ও বস্তু-নারী

পর্নোগ্রাফি নারীর অবমাননা করে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে। পর্নোগ্রাফির গ্রহীতা না হয়েও নারী লৈঙ্গিক বৈষম্যের দিক থেকে ফলভোগকারী, কারণ পর্নোগ্রাফির মাধ্যমেই ঐ বৈষম্যের পুনঃউৎপাদন হয়ে থাকে। যেসব নারীর আলোকচিত্রে বা চলচ্চিত্রে ধৃত হন, তারা সরাসরি এই বৈষম্যের শিকার হন। তার ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবন পর্নোগ্রাফিতে তার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হয়। আর যেভাবে নারীকে পর্নোগ্রাফিতে উপস্থাপন করা হয় তা হলো বৈষম্যেরই যৌনকরণ।

পর্নোগ্রাফি নারীকে বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, নিরন্ড়র বস্তুকরণের অনুমোদন এখানে ঢালাওভাবে দেয়া আছে। এখানে নারী হলো পুর"ষের যৌনাকাঙ্ক্ষার একতাল মাংস। পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিনে বা বণ্ঢু ফিল্মে নারী একজোড়া স্ড়ন, কিংবা একটি মেলে-ধরা যোনী ছাড়া আর কিছুই না— পুর"ষকামনার বস্তুমাত্র সে। ম্যাককিননের মতে, পুর"ষ যৌনতাকে যে যে ভাবে পেতে চায়, পর্নোগ্রাফি তার ব্যবস্থা করে দেয় (ম্যাককিনন, ১৯৯৭: ১১৭)।

পর্নোগ্রাফিতে নারী তাহলে কেমন? পুর"ষ যেমন চায়, তেমন। পর্নোগ্রাফিতে এটা কিছুতেই আশা করা হয় না যে নারী 'না' বলবে। পুর"ষ যেভাবে চাইবে, তাকে সেভাবেই আসনগ্রহণ করতে হবে। এখানে নারীর ভূমিকা কেবলই পুর"ষসঙ্গীকে তৃপ্তিপ্রদান। কিন্তু বিপদের দিকটা হলো এই স্বরবিহীন, সদাপ্রস্তুত নারী কিন্তু বাস্ড়বে পাওয়া যাবেনা। পর্নোগ্রাফির সহজপ্রাপ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা যদি পুর"ষ বাস্ড়ব সমাজে ফলাতে যায়, তখন এটা খুব স্বাভাবিক যে তাকে মাঝে মাঝে 'না' শুনতে হবে। আর এই 'না'ই জন্ম দেয় ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের। অথচ পর্নোগ্রাফির অভিজ্ঞতা ধর্ষণকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে। পর্নোগ্রাফি বাস্ড়বসমাজে, ধর্ষণের বৈধতাপ্রদানের পক্ষে কাজ করে।

স্বাধীন নারী?

লিন্ডা মারচিয়ানো অভিনীত ডিপ থ্রোট (১৯৭২) ছবি নিয়ে কয়েক দশক আগে বেশ হৈ চৈ হয়েছিল। ছবিটির প্রচার এভাবে হয়েছিল যে এখানে একজন নারীকে তার যৌনতার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভূমিকায় দেখা গেছে। যে লিন্ডা লাভলেস (ছবিতে এই নাম ছিল) একজন স্বাধীন নারী, যার ভগাঙ্কুর যোনীতে নয়, জিহ্বার গভীরে অবস্থিত—সে মৌখিক সঙ্গম বা ওরাল সেক্সে যৌনসুখ পায়। যৌনসুখ বিষয়ে তার এই নিজস্ব পছন্দ তাকে একজন স্বাধীন নারী হিসেবে প্রতিপন্ন করে। পুরুষরা তাদের বান্ধবী বা স্ত্রীদের নিয়ে দলে দলে এই ছবি দেখতে যায় এই মনে করে যে লিন্ডার 'যৌনস্বাধীনতা' তাদের সঙ্গিনীরা পছন্দ করবে।

কিন্তু বাস্ড্রবের লিন্ডা ও পর্দার লিন্ডার (দুজনেরই একই নাম) এই স্বাধীনতা কীভাবে এসেছে? ম্যাককিনন (১৯৮৭) বলছেন, এক্ষেত্রে লিন্ডার 'যৌনস্বাধীনতা' এসেছিল তার ওপরে করা নির্যাতন, মৃত্যুহুমকি ও ধর্ষণের বরাতে। তার তৎকালীন স্বামী ও পর্নোগ্রাফার-প্রযোজক চাক ট্রেইনরই ছিলেন এসবের হোতা। প্রায়ই তাকে পিস্ড়লের মুখে এসব করতে হয়েছে, কিন্তু পর্দায় দেখা গেছে সতেজ ও যৌনস্বাধীন একজন লিন্ডাকে। যৌনস্বাধীনতার বিষয়টি তার ব্যক্তিজীবনের নিজপছন্দের বিষয় ছিল না। এটি ছিল গতানুগতিক অভিনয়মাত্র। কিন্তু মিথ্যাপ্রচারের জোরে ছবিটি দেদার ব্যবসা করে।

পর্নোগ্রাফি নারীকে একটি ভূমিকা দেয় : তোমার পুরুষটির সঙ্গে যৌনকর্ম কর, তোমার ব্যথা লাগুক বা শারীরিক ক্ষতি হোক, যেভাবে সে চায় তাকে সেভাবেই দাও; আঘাত পেলে হাসো এবং বলো যে তোমার ব্যথা লাগছে না, আর সবচেয়ে ভালো এসব কিছুই বলো না। পরিবর্তে সে যা বলে তাই কর, দায়িত্বশীল বান্ধবী বা প্রেমময় স্ত্রীর মতো। লিন্ডার কেসটির সূত্রে মেরেডিথ এ ম্যাডেন বলেন, খেলাটা হলো ভানের। ভাবো, তুমি একটা পুতুল। সুতোটা দিয়ে কেউ একজন তোমাকে নিয়ে খেলছে, তুমি বন্দি, তুমি ব্যথাতুর, এবং তোমার কিছুই করার নেই। কেবল হাসো এবং অভিনয় করো, যে তুমি তৃপ্তি পাচ্ছো (ম্যাডেন, ২০০১)।

ডিপ থ্রোট-এর মতো ছবি বা হাসলার-এর মতো ম্যাগাজিনের মাধ্যমে নারীর জন্য কিছু ভুয়া প্রত্যাশা স্থাপন করা হচ্ছে। কিছু নারী এসব প্রত্যাশা সহজেই গ্রহণ করে, বাকিরা করেনা। কোনো কোনো নারী এই ব্যথাদীর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই যৌনতুষ্টি পেয়ে থাকেন; আর বাকিরা সঙ্গমশেষে, 'অবেশেষে মুক্তি পেলাম' বলে হাঁফ ছাড়ে।

ওপরে আলোচিত 'ইরোটিক থ্রিলার' ধারার ছবিগুলোতে নারীর ভূমিকা ও ক্ষমতা পর্নোগ্রাফির অক্রিয় নারীদের চাইতে অনেক বেশি থাকে। হলিউড-উদ্ভাবিত এই ছবিগুলোতে নারীর, সুজান হেওয়ার্ডের (২০০৬) মতে, যেন একধরনের এজেন্সি থাকে। সে ক্ষমতাধর, তার ব্যক্তিত্ব ও যৌনক্ষমতার সুবাদে। ফাইনাল এনালাইসিস (১৯৯২), বডি অব এভিডেন্স (১৯৯৩), বেসিক ইন্সটিঙ্কট (১৯৯৩) এধরনের কয়েকটি ছবি। নারীকে ক্ষমতাপ্রদান করা হয় যাতে সে বদলা নিতে পারে, এমনকি খুন করতে পারে—কিন্তু এটাও শেষপর্যন্ড় পুরুষতান্ত্রিক ফ্যান্টাসি। এসব ছবিতে শেষপর্যন্ড় পুরুষই জয়লাভ করে। সুজান হেওয়ার্ড বলছেন, এজেন্সিপ্রদান মানেই এজেন্সি থাকা নয় (হেওয়ার্ড, ২০০৬: ২৯১)।

পর্নোগ্রাফিতে অভিনয়ের মাধ্যমে অনেক নারী পর্নোস্টারের মর্যাদা পেয়ে যান। পশ্চিমা অভিজ্ঞতায় অনেক নারী স্বেচ্ছায় এধরনের পেশা বেছে নেন। নারীঅধিকারের দৃষ্টিতে এও নারীর একধরনের অগ্রগতি, কারণ এই পেশা তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত জেসমিন বর্তমানে আমেরিকায় একজন পর্নোস্টারের মর্যাদা উপভোগ করছেন। তবে এই স্বাধীনতা হয়তো এতটা সরলরৈখিক হিসেবের বিষয় নয়। হয়তো ডিপ থ্রোট-এর লিন্ডার মতোই বাধ্য হয়ে এপথে এসেছে একজন পর্নো-অভিনেত্রী। পারিবারিক দৈন্য বা দায়িত্ব, শিক্ষাগত অযোগ্যতা তাকে আরও ভালো কোনো পেশার পরিবর্তে এধরনের পেশায় আসতে বাধ্য করে। আর এক্ষেত্রে তার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে তার উন্মোচিত যৌনাঙ্গসমূহ, যা তার নিজস্ব অর্জন নয়, প্রকৃতির গড়ে দেয়া সম্পদমাত্র।

আর এই নারীদেহকে পুঁজি করে বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছেন পুরুষ-ব্যবসায়ীরা। ম্যাককিননের (১৯৮৯) মতো তাত্ত্বিকেরা পর্নোগ্রাফির অর্থনৈতিক দিকটিকেও সামনে এনেছেন এবং বলছেন যে এখানে 'নারীপাচার'-এর মাধ্যমে পুরুষরা ব্যবসায়িক মুনাফা করছে। আমেরিকা এবং পশ্চিমা অন্যান্য দেশে বিলিয়ন ডলারের যে পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি, তার কাঁচামাল হলো নারীদেহ। ম্যাককিনন বলছেন :

সাম্প্রতিক শিল্পসমাজে পর্নোগ্রাফি হলো একটি শিল্প, যেখানে নারী ব্যবহৃত হচ্ছে যৌনক্ষেত্র হিসেবে এবং পুরুষকর্তৃক, পুরুষের মুনাফার জন্য। এখানে যৌন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে মুনাফার জন্য। পর্নোগ্রাফি নারীকে পুরুষের প্রয়োজনীয় যৌনবস্তু হিসেবে বিক্রি করছে। এ হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীপাচার (ম্যাককিনন, ১৯৮৯: ১৯৫)।

পুরুষ ওপরে : যৌনতাসম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা

বৈষম্যের যৌনকরণের এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া হয়, তাদের যৌনতা ও যৌনানন্দের মাত্রা সম্পর্কেও ভুল তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। দোরকিন এ প্রসঙ্গে বলেন, পর্নোগ্রাফি বলে নারী বিক্ষত, ধর্ষিত, মর্দিত হতে চায়; ... সে পীড়িত হতে চায়, সে ব্যাথা পেতে চায় (দোরকিন, ১৯৯৩: ২০৩)। পর্নোগ্রাফি পুরুষকে তার গায়ের জোরের বরাতে এভাবে একটি বিপজ্জনক ভূমিকায় অবতীর্ণ করে এবং যৌনতার একটি ভুল মান নির্ধারণ করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো নারী সবসময়, সঙ্গমকালে এভাবে উৎপীড়িত বা বিক্ষত হতে চায় না। পুরুষ ওপরে, নারী নিচে; পুরুষ উৎপীড়ক, নারী (সোৎসাহে) উৎপীড়িত—পর্নোগ্রাফি এরকম কিছু ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। অথচ যৌনপুলকের জন্য অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান সক্রিয়তা (ওপর-নিচ সমান অংশগ্রহণ) দরকারি।

পুরুষ নারীর চাইতে সবদিক থেকে অগ্রগামী, তাই নারীর ওপরে তার প্রাধান্য জৈবিক ও স্বাভাবিক—সমাজের এই ধারণাকে যৌনতার মাধ্যমে পুনঃদৃঢ় করে পর্নোগ্রাফি। পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্রের একটি সাধারণ সমাপ্তি হয় এভাবে যে, দণ্ডায়মান পুরুষ বীর্যের স্খলন, বসা বা শায়িত নারীর মুখমন্ডলে বা শরীরের অন্য কোনো স্থলে ঘটাচ্ছে। এইখানে এসে নারীর মর্যাদার চরম অবমূল্যায়ন ঘটে, যে সে বা তার শরীর পুরুষের বর্জ্য নিক্ষেপের স্থল। এইখানে 'দণ্ডায়মান' পুরুষ সবিশেষে নিশ্চিতভাবে বোঝাতে সক্ষম হয় যে 'নিচের' নারীটি তার অধীন। আর বর্জ্যনিক্ষেপের মাধ্যমে এটাও নিশ্চিত করা হয় যে নারী এখানে মোটেও নারী নয়—সে বেশ্যা, নোংরা মেয়েমানুষ। ম্যাককিনন বলছেন, পর্নোগ্রাফি এই বৈষম্যের (পুরুষ ওপরে, নারী নিচে) ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এটা ছাড়া পুরুষের নারীর ওপরে পীড়ন ও দমন ষোলকলা পূর্ণতা পায়না। বৈষম্য ছাড়া পুরুষের কামভাব জাগ্রত হয় না (ম্যাককিনন, ১৯৮৯: ২১১)। পর্নোগ্রাফি কেবল এই বৈষম্যকে রূপায়িতই করে না, তা জেন্ডারসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে আনন্দদায়করূপে হাজির করে এবং এটাই স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করে।

প্রয়োজন যৌনতা সম্পর্কে নারীর দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তি

পর্নোগ্রাফিতে নারীশরীরের যথেচ্ছ ব্যবহার তার শরীরকে যেমন অপমান করে, তেমনি তার আত্মমর্যাদাকে তলায় নামিয়ে আনে—যে সে মানুষ নয়, স্তন-যোনীসমেত একতাল মাংসপিণ্ড। এই অবমাননা থেকে রক্ষা পাবার একটা উপায় হতে পারে যে পর্নোগ্রাফির উৎপাদন-বিপণন-প্রদর্শন বন্ধের জন্য আওয়াজ তোলা। কিন্তু সেটা সম্ভবত খুব বাস্তবানুগ কোনো কর্মসূচি হবে না। কারণ সমাজে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, পুঁজিতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে এর

ব্যবসায়িক বৈধতাও রয়েছে। বরং পর্নোগ্রাফিতে নারী-পুরুষের যৌনতাসম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার প্রদর্শন কমিয়ে আনার ব্যাপারে কাজ করা যেতে পারে। আর যৌনতাকে নারী কীভাবে দেখে, পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে নারীর কী দৃষ্টিভঙ্গি বা কী সাড়া, পর্নোগ্রাফিক টেক্সটে তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তবে বিকৃতকামের বিষয়গুলোকে (শিশু পর্নোগ্রাফি) প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের দৃষ্টিতেই মোকাবেলা করা দরকার।

তথ্যসূত্র

দোরকিন, আন্দ্রিয়া (২০০৩)। Pornography, The Feminism and Visual Culture Reader, Routledge. London.

হেওয়ার্ড, সুজান (২০০৬)। Pornography, Cinema Studies: The Key Concepts (3rd edn), Routledge, London.

স্টার্ন, লেসলি (১৯৯২)। 'The Body is Evidence', The Sexual Subject: A Screen Reader in Sexuality, Screen-Routledge; London.

হল, স্টুয়ার্ট (১৯৯৭)। The Work of Representation, Representation: Cultural Representation and Signifying Practices, Stuart Hall ed., Sage, London.

Wkcwbm, jiv (1998). 'Pornography', The Oxford Guide to Film Studies, John Hill and Pamela Church Gibson eds., Oxford University Press, Oxford.

বেক, মারিয়ানা (২০০৩)। http://www.libidomag.com/nakedbrunch/archive/europorn07.html

ম্যাককিনন, ক্যাথরিন এ. (১৯৮৭)। Feminism Unmodified, Harvard University Press, Cambridge.

ম্যাককিনন, ক্যাথরিন এ. (১৯৮৯)। Toward a Feminist Theory of State, Harvard University Press, Cambridge.

ম্যাককিনন, ক্যাথরিন এ. (১৯৮৯)। Toward a Feminist Theory of State, Harvard University Press, Cambridge.

দোরকিন, আন্দ্রিয়া (১৯৮১)। Pornography: Men Possessing Women, The Women's Press, London.

দোরকিন, আন্দ্রিয়া (১৯৯৩)। Letters From A War Zone, Lawrence Hill Books, Brooklyn.

ম্যাডেন, মেরেডিথ এ. (১৯৯২)। 'Pornography : The Epitome of Sexuality', http://www.gwu.edu/~medusa/2001/porn.html

বাংলা সিনেমার ‘শণ্টীলতা’ বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক পণ্যের আর্থ-রাজনৈতিক তাৎপর্য

আ. আল মামুন

সপরিবারে দেখার অনুপোযোগী চলচ্চিত্রের বির“দ্ধে লড়াইয়ে ‘আমরা’ জয়ী হয়েছি। এই ‘আমরা’ মানে তথাকথিত সংস্কৃতি কর্মী, সমাজের বিবেকস্বরূপ মিডিয়া কর্মী, আর ‘সুস্থ’ বুদ্ধিজীবীরা। এরা এখন ‘সমাজ-সংস্কৃতির’ উন্নতি দেখে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। এই লেখাখানি পড়ে তাদের ঢেকুরে কিঞ্চিত অম্বলের সন্নিবেশ ঘটার আশঙ্কা থেকে গেলেও লিখতে বসেছি সোজা বাংলায় দু’একটা প্রশ্ন তুলবো বলে।

আমি ভাত কিনে খাই, টিকেট কিনে সিনেমা দেখি, আর পত্রিকাও পড়ি কিনে। তাই বাংলা সিনেমাও সোজা কথায় আমার কাছে প্রথমত একটা ‘সাংস্কৃতিক পণ্য’। এই পণ্যের বাজার আছে, উৎপাদক আছে, হকার-ক্যানভাসার আছে, আছে আমার আপনার মতো বিচারক ও ক্রেতা। প্রতিক্ষণে চলছে লড়াই- ‘সংস্কৃতি’র এই বাজারটি কার দখলে থাকবে, কারা পণ্য উৎপাদন করবে, কে বেশি কথা বলবে, কে নীতিকথা বলবে সবকিছুই জটিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক হিসেব-নিকেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে।

যেমন ধরেন, যারা ‘সংস্কৃতি’ বেচাবিক্রি করে বা উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা নিজেদেরকে ‘সংস্কৃতি কর্মী’ বলে পরিচয় দিতে গরিমা বোধ করেন। কেন এই অহমিকা? কেন রিক্সা চালনা বা ধান লাগানোর চেয়ে ‘সংস্কৃতি’ উৎপাদন ও বেচাকেনাকে আমরা উচ্চমার্গীয় ভাবি? এভাবে ভাবার ইতিহাস কতোকালের? আর এর রাজনৈতিক তাৎপর্যই বা কী? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাববার অবকাশ রয়েছে সমাজের নীতি নির্ধারণের বেলায়। কারণ, সংস্কৃতিকে দৈনন্দিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্ড়বতা থেকে বিযুক্ত করে ভাবা যায় না।

সামাজিক বিজ্ঞানে যাদেরই অক্ষরজ্ঞান আছে, তাদের পড়তে হয়েছে- মানুষ হলো রাজনৈতিক জীব। আমরা ভাবি শুধু রাস্ড়ায় স্লোগান দেয়া, পোস্টার সাঁটানো, দলের পক্ষে ভোট বা চাঁদা সংগ্রহই যেন রাজনীতি, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা বলবেন এগুলো হলো রাষ্ট্র ও সমাজে ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক কলাকৌশল মাত্র। রাজনীতির পরিসর সর্বব্যাপী। প্রতিটা মানুষের

প্রতিটা পদক্ষেপ, প্রতিটা প্রকাশ, প্রতিটা সিদ্ধান্ড় একটা রাজনৈতিক/ক্ষমতার অবস্থান ও পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে।

পাঠক, আপনারা যারা ঢাকায় বাস করেন তাদের নিশ্চয় হাজারবার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে—গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি-কর্তা রিক্সাওয়ালাকে পেটাচ্ছে। কখনো কি চোখে পড়েছে, রিক্সাওয়ালা কোনো গাড়ির মালিককে পেটাচ্ছে আচম্বিতে? এখন আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আচ্ছা বলেনতো কেন কখনোই দেখা যায় না, রিক্সাওয়ালা এক্সিডেন্টের পরে একজন গাড়ির মালিককে বের করে নিয়ে পেটাচ্ছে। এর রাজনীতি কি? আমি বলবো, এটাই রাজনীতি, এটাই ক্ষমতার ভাষা। সামাজিক সম্পদের বণ্টনের সাথে সমাজিক মর্যাদার বণ্টন ও শ্রেণীবিভাগও ঘটে। মনে রাখতে হবে, শুধু অর্থনীতি দিয়ে সামাজিক সম্পদ পরিমাপ করা যায় না। এই সম্পদের দাপটে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর ওপরে খবরদারী করার মতো ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। একই কথা প্রযোজ্য ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। ভাষা-সংস্কৃতিভিন্ন মানুষের অস্ড়িত্ব নাই। ভাষার ব্যবহারে শ্রেণীভেদ আছে। ভাষাতো বটেই আমাদের উচ্চারিত প্রতিটা শব্দও একটা লড়াইয়ের ময়দান। শব্দগুলো উচ্চারিত হয়ে সমাজে অর্থ-নির্ধারণের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। ভাষা ও শব্দের লড়াই অন্যান্য লড়াই থেকে বিযুক্ত নয়।

এখন বাংলা সিনেমা ‘উদ্ধারকারীরা’ ‘সপরিবারে দেখার উপযোগী সুস্থ সিনেমার ধারা’ সমাজে কায়েম করতে পেরেছেন। এবং ভাবছেন তারা সমাজে ‘মহৎ’ এক অবদান রেখেছেন। আচ্ছা ‘অশণ্টীলতার’ ধারণা কি স্থির? একশ বছর আগে সমাজে ‘অশণ্টীলতা’ বলে যা বুঝাতো এখনো কি তাই বুঝায়? আর ‘পরিবার’ বলতেই বা এখন কী বুঝব? আমাদের বাপদাদারা তাদের যুবক বয়সে কি আমাদের মতোই ‘পরিবার’ বুঝত, আমাদের মতো একইরকম পরিবারে বাস করতো? এই কথা বলা যায় যে মানুষভেদে, সময়ের ঐতিহাসিকতায়, স্ড় রভেদে, অবস্থানভেদে ধারণার তারতম্য ঘটে।

তাহলে, কোন একদল মানুষ ‘অশণ্টীলতা’র বির“দ্ধে লড়াই করছেন, কোনসব পরিবারের জন্য, কী প্রকারের বিনোদনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন? প্রশ্ন করবো, এই ‘মহৎ’ অবদানের তাৎপর্য কী? কেনইবা একদল মানুষ এই ‘সুস্থ’ সিনেমা উদ্ধার করবার মতো ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছেন? আমি শুধু বলবো, বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মতাদর্শিক কাঠামোর ভিতরে ‘অশণ্টীলতা’ ধারণার অর্থ নির্মিত হয়। আমি আপনি অর্থ নির্মাণে, সমাজে আমাদের স্বার্থনুকূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লড়াইয়ে সামিল হই।

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, শণ্টীল-অশণ্টীল বর্গকরণ এবং অশণ্টীলতা-বীভৎসতার কবল থেকে বাংলা চলচ্চিত্র ‘উদ্ধার কারবার’ প্রকল্পটিও ছিল একটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ। বলা যায়, রাঙা বৌ সিনেমা থেকে নতুনভাবে

'শণ্টীলতা/অশণ্টীলতা' বিতর্কের শুর"। এসময় মূলধারা মিডিয়া ও সংস্কৃতি-ইন্ডাস্ট্রির বুদ্ধিজীবীরা 'সুস্থতা' পরিমাপক মানদ" নির্ধারণে সোচ্চার হয়ে ওঠে, এবং রায় দিতে থাকে। আমার মনে হয়েছে, সুস্থ-অসুস্থ বা শণ্টীল-অশণ্টীল বর্গকরণের বিশেষ যোগসূত্র আছে এদেশের বিকাশমান ভোক্তাসমাজ গঠন-প্রক্রিয়ার সাথে। এর তলায় একটা বাণিজ্যভাবনা আছে।

'সুস্থতার' সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত দুটো সিনেমার—হুমায়ূন আহমেদের চন্দ্রকথা আর মোস্ড়ফা সরয়ার ফার"কীর ব্যাচেলর-এর টেক্সট বিচার করে আমি দেখিয়েছিলাম: অপরাধী বাংলা-সিনেমাকে খারিজ করে দেওয়ার পক্ষে যে-দুটি প্রধান অভিযোগ—যৌনতা ও সহিংসতা—পেশ করা হয়, তা ব্যাচেলর-চন্দ্রকথার মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে, যদিও স্বতন্ত্রভাবে। (বিস্ড়ারিত জানার জন্য যোগাযোগ, সংখ্যা ৮; ফেব্র"য়ারি ২০০৭-এ "বাংলাসিনেমা উদ্ধারপ্রকল্প : চন্দ্রকথা, ব্যাচেলরদের পোয়াবারো" শীর্ষক লেখাটি পড়তে পারেন।) একারণেই আমি দাবি করছি, এদেশে মিডিয়া-বিজ্ঞাপন-বুদ্ধিজীবী-সাংস্কৃতিক আমলা সকলে মিলে বাংলা সিনেমার সুস্থতার একটা 'ধোঁয়াচ্ছন্ন' সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এখানে আসে ক্ষমতার প্রশ্নটি। ক্ষমতাবানদের দাপুটে ডিসকোর্স নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করার যোগ্যতা রাখে।

আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে যৌনতা, ভালগারিটি, অসঙ্গতি, সহিংসতা প্রভৃতি যেসব অভিযোগ ঢাকাই সিনেমার বির"দ্ধে করা হয় তা 'সুস্থতার' সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছবিতেও ষোলআনা হাজির থাকে। তবে প্রকাশ-ঢঙ আলাদা। কারণ তার লক্ষ্য শ্রেণী আলাদা। তার লক্ষ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের লেখাপড়া আছে, অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমগুলো এদের হাতের মুঠোয় এবং এরা শহুরে বাবুসুলভ মানসিকতা ধারণ করে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত ঢাকাই সিনেমা নির্মিত হয় মূলত নিম্নবিত্ত দর্শকদের জন্য। যাদের বিনোদনের সকল মাধ্যম হাতছাড়া এবং প্রতিনিয়ত যারা এই মধ্যবিত্ত বাবুদের হেনস্থার শিকার হয়। ফলে, তাদের জন্য নির্মিত সিনেমায় আমরা বাড়তি রংঢঙ দেখি। বস্ড়ির জীবনের কদর্যতা দেখি; আর তাদের জীবনের অপূরণীয় স্বপ্নগুলোকে পূরণ হতে দেখি অদ্ভুত এবং অযৌক্তিক কায়দায়। আবার একেবারে অসহনীয় 'কাটপিসের'ও আবির্ভাব ঘটে। যদিও, আমাদের ঘরে ইন্টারনেট মারফত, অন্যান্য মাধ্যমে বেশ অবাধেই পর্ণোগ্রাফি এসে হাজির হতে পারে; আমাদের পঞ্চতারকা হোটেলগুলোতে মধ্যরাতে উদ্দাম 'পার্টিও' চলতে পারে। আর তাদের বেলায় এরকম কোনো 'সুযোগ' সমাজ রাখে না।

অবশ্য আমাদেরই একদল দুষ্টু 'সংস্কৃতি-ব্যবসায়ীরা' তাদের জন্য 'কাটপিস' বানায়। এই 'অসুস্থ' ব্যবসায়ীরা বেশ কিছুকাল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিকে দখল করে রেখেছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক ইন্ডাস্ট্রির এই মাধ্যমকে এখন উদ্ধার

করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ক্রেতাসমাজটাকে 'সুস্থ' ব্যবসায়ী-সংস্কৃতিকর্মী-বুদ্ধিজীবীদের পছন্দমতো নির্মাণ করার জন্য। আর এদের সুবিধের কথা মাথায় রেখেই অর্থনীতি, শিক্ষা-বিনোদন আর রাষ্ট্রের আইন সজ্জিত হয়। কাটপিসনির্ভর সিনেমাগুলো এই গোষ্ঠীর স্বার্থকেন্দ্রীক মতাদর্শের অনুকূল ছিল না।

নিজের ঢোল নিজেকেই পেটাতে হয়। তাই 'সংস্কৃতি' বিক্রেতারা সিনেমা-ইন্ডাস্ট্রি উদ্ধারের প্রকল্প হাতে নেন। কিন্তু উদ্ধার করে কোথায় সংস্কৃতিকে নিয়ে যাচ্ছেন তা অনুচ্চারিত থেকে যায়।

এই সমাজে বাজাবার মতো ঢোল কিনবার সামর্থ্য সবার থাকে না!

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ কি খ্যাপা বিজ্ঞানী, বিন লাদেন, নাকি ভিনগ্রহের প্রাণী?

সেলিম রেজা নিউটন

(ক) স্বাধীনতা-প্রতিমার দেউলিয়াত্ব এবং মিডিয়ায় টম অ্যান্ড জেরি খেলা

> অ্যাসাঞ্জ হয়ত একজন দুইজন সুইডিশ নারীকে ধর্ষণ করেছেন কিংবা করেননি (যেটা জানার জন্য হঠাৎ করে ব্যস্ড় হয়ে পড়েছে মের্দন্ডহীন সরকার), কিন্তু এ নিয়ে কোনো প্রশ্নই নাই যে তিনি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিকে বিবস্ত্র করে ফেলেছেন এবং সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কেমন বেশ্যা [দেউলিয়া] সে হয়েছে ইদানিং। (শেরউড রস, ২০১০; অনুবাদ : সরন)

'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' ভাস্কর্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সুদীর্ঘ, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত। 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' তাঁদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তির অবাধ বিকাশ ও বাকস্বাধীনতার প্রশ্নাতীত প্রতীক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাযুদ্ধের এই সারসত্তা-প্রতীমাটি বাকস্বাধীনতার সর্বজনিন মার্কিন স্পিরিট হারিয়ে আজ দেউলিয়ার মতো করে ক্ষমতাবানদের তল্পীবহন করছে, এই অবস্থার রূপক হিসেবে (বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রেই হোক) 'বেশ্যা' শব্দের প্রয়োগ আমার জন্য অস্বস্ড়িকর ও আপত্তিকর। তথাপি, আমার মনে হয়, স্বাধীনতার নারী-প্রতিমাটির বিবস্ত্র ও বেশ্যা হয়ে পড়ার আগ্রাসী রূপকের মাধ্যমে যেন পুরো মার্কিন রাষ্ট্র-প্রণালীর ক্রমাগতভাবে ফ্যাসিস্ট-বলশেভিক হয়ে ওঠার ভীতিকর ও অধিকতর আগ্রাসী পরিস্থিতিটাকেই প্রতীকায়িত করতে চেয়েছেন *শিকাগো ডেইলি নিউজ* এর প্রাক্তন রিপোর্টার, মিডিয়া-অ্যাক্টিভিস্ট শেরউড রস।

কিন্তু, আমাকে কেউ বলুন, কখনো কি আপনারা এমন দেখেছেন যে ধর্ষণ-মামলার কোনো আসামীকে ধরার জন্য বিশ্বজোড়া লাল পরোয়ানা জারি করা হয়েছে? কখনো কি আমরা দেখেছি যে, একটি সাংবাদিকতা-প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ করার জন্য বিশ্বের প্রায় সমস্ড় পরাশক্তি ও বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্র প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে? এঁরা কেউ তালেবান নয় কিন্তু-সভ্য ও উন্নত, আধুনিক সব রাষ্ট্র। একের পর এক এরকম রাষ্ট্রের চাপে ডোমোইন-নামের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানটির অসম্ভব গুর্ত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তার *পে-পল* অ্যাকাউন্ট। প্রকাশ্যে আহবান জানাচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধরাষ্ট্র, যেন দেশেবিদেশে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো সংস্রব না রাখে উইকিলিকস

নামক মিডিয়া-সংগঠনটির সাথে। জনগুর্ত্বসম্পন্ন ও সঠিক তথ্য প্রকাশ ও পরিবেশনের দায়ে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পর্যন্ড় অভিহিত করা হচ্ছে একটি মিডিয়াকে। যে-তথ্য প্রকাশের ওপর সারা পৃথিবীর জনসাধারণের মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করে সেই তথ্য প্রকাশের নৈতিকভাবে ন্যায্য ঘটনাকে নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর হামলা হিসেবে গণ্য করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরকম কখনো ঘটতে দেখেছি কি আমরা?

অতিশয় লক্ষণীয় : উইকলিকসের তথ্যপ্রকাশকে এ পর্যন্ড় বেআইনি বলে কেউ অভিযোগ তুলতে পারেননি। এরকম অভিযোগও কেউ করতে পারেননি যে, তাদের প্রকাশিত তথ্য বেঠিক। তাহলে কীসের দোষে তাদের বির্দ্ধে বিশ্বক্ষমতাধরদের এই যুদ্ধঘোষণা? সাংবাদিকতা করা কি বেআইনি কাজ? মহাজনগুর্ত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ে সরকারগুলো বিশ্বসমাজের সাথে প্রকাশ্যে মিথ্যাচার করেছে, সেগুলো প্রকাশ করা কীভাবে অসাংবাদিকতাসুলভ হতে পারে? ইন্টারনেট কি তাহলে স্বাধীন একটা তথ্যক্ষেত্র হিসেবে নিজের জন্মবৈশিষ্ট্য বহাল রাখতে পারবে না? পরাশক্তির মিথ্যাচার কি চির অপ্রকাশিত থেকে যাবে? বিশ্বের জনসাধারণকে সত্য জানানোর অধিকার কি অপরাধ বলে গণ্য হবে?

এত এত প্রশ্ন আমি এই জন্যই তুলছি যে আমাদের অধিপতি ধারার মিডিয়া এই প্রশ্নগুলো তুলছেই না, যদিও প্রশ্নগুলো প্রশ্নাতীত রকমের গুর্ত্বপূর্ণ। অথচ উইকিলিকসের প্রকাশিত তথ্য নিয়ে, তার ভালোমন্দ নিয়ে, প্রকাশের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা নিয়ে গাড়ি গাড়ি কথামালা দিয়ে পাতা ভরানো হচ্ছে প্রতিদিন। আর থাকছে উইকিলিকস সংক্রান্ড় ঝালমুড়িচানাচুর-খবরাখবর। অ্যাসাঞ্জ কোথায় পালিয়ে আছেন, তিনি হ্যাকার ছিলেন কিনা, তার চুলের রঙ কি রকম, তিনি রাগী মানুষ কিনা, কথা বলেন কীভাবে (শান্ড় স্বরে), এইসব খুচরা তথ্যে মিডিয়া সয়লাব। একটি পত্রিকা তো এমনকি জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ খ্যাপাটে ধরনের মানুষ কিনা সেই প্রশ্নও তুলেছে। আমাদের সাংবাদিক বন্ধু মশিউল আলম তো তাঁর 'হ্যাকার'-পরিচয়টাকেই শেষ পর্যন্ড় বহাল রাখলেন (মশিউল আলম, ২০১০)। নিজের পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের রাজনীতি সম্পর্কে জুলিয়ানের নিজের বিশেণ্ডষণ অনুধাবনযোগ্য। অ্যাসাঞ্জের নিজের ভাষায়:

> এটা একটু বিরক্তিকরই আসলে। কেননা [হ্যাকার থাকা অবস্থায়] আমি একটা বইয়ের যৌথ লেখক হিসেবে কাজ করেছিলাম। এটা নিয়ে ডকুমেন্টারি আছে। লোকজন এটা নিয়ে প্রচুর কথা বলে। এটা থেকে তারা কাট-পেস্ট করতে পারে। কিন্তু সেগুলো সব ২০ বছর আগের কথা। আজকের দিনের প্রবন্ধে আমাকে কম্পিউটার হ্যাকার বলা হচ্ছে, এটা দেখা খুবই বিরক্তিকর।

> এটা নিয়ে আমি লজ্জিত নই। আমি এটা নিয়ে রীতিমতো গর্বিতই বটে। কিন্তু, কেন তারা এখন আমাকে কম্পিউটার হ্যাকার বলে চালাতে চায়, আমি তার কারণ বুঝতে পারি। কারণটা খুবই সুনির্দিষ্ট।
>
> অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম যাঁরা আইএসপি চালু করেছিলেন আমি তাঁদের অন্যতম ছিলাম। সেটার নাম ছিল সাবআর্বিয়া। ১৯৯৩ সালে। তখন থেকে আমি প্রকাশক হিসেবে এবং কখনো কখনো সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছি। আমরা এখন যা করছি তা যে প্রকাশনা-পেশার কাজ নয় এই মর্মে তাকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা আছে। অনেক দেশেই প্রকাশনা-পেশাটাকে সুরক্ষিত রাখা হয়ে থাকে। কিংবা সাংবাদিকতার কাজকর্মও অন্য নানাভাবে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু সচেতন প্রচেষ্টাটি হচ্ছে আমাদের কাজকে এমন কিছু (যেমন কম্পিউটার হ্যাকিং) হিসেবে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা যার কোনো সুরক্ষা নেই। উদ্দেশ্যটা হলো, সাংবাদিকতা জগতের বা প্রেসের বাকিদের কাছ থেকে এবং আইনি সুরক্ষাগুলো থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। (ফোর্বস, ২০১০; অনুবাদ: স.র.ন.)

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, উইকিলিকসকে বোঝার জন্য এবার যখন মন দিয়ে পত্রপত্রিকা দেখা শুর করলাম, তখন দেখি উইকিলিকস জিনিসটা আদতে কী, এরা কী চায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর নথি প্রকাশ করে তাদের লাভ কী, এদের কাজের পদ্ধতি কী, 'তথ্যফাঁস' কথাটার মানেই বা কী (কথাটা কেমন যেন ফাঁসানোর অপগন্ধমাখা একটা কথা), এসব কোনোকিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দুই-একজন শিক্ষিত মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদেরও একই কথা: বিস্তারিত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। উইকিলিকসের মতো আনকোরা নতুন ধারার সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা তোলার সময় একথা খেয়াল না-করা কঠিন যে আমাদের দেশের সাংবাদিকতার এ এক জাত বৈশিষ্ট্য: সামগ্রিক ধারণাগত বিশেণ্ডষণ তাদের কাভারেজ থেকে উদ্ধার করা কঠিন।

আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং-এর সামগ্রিক কাভারেজও এরকমই ইঙ্গিত দেয়: জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ যেন বিপথগামী কোনো অতিপ্রতিভা কিংবা ভিন্ন গ্রহের প্রাণী যে নাকি পাগল-বিজ্ঞানীর মতো একাই সমস্ত পরাশক্তিকে ধ্বংস করার কৌতুককর খেলায় মেতেছে, আর আস্ফালন করে বলছে "জারজদেরকে ধ্বংস করতে আমি মজা পাই" (স্পিগেল, ২০১০)। জার্মানির বিখ্যাত *স্পিগেল* পত্রিকাকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে অ্যাসাঞ্জ অত্যন্ত সিরিয়াস সব কথাবার্তা তুলেছেন। (একটু পরে আমরা সেখান থেকে উদ্ধৃতিও দেব।) কিন্তু গুর তর সব কথাবার্তা বাদ দিয়ে *স্পিগেল*-এর মতো একটা পত্রিকাও তাঁদের শিরোনামটা কী করল দেখুন: "জারজদেরকে ধ্বংস করতে আমি মজা পাই"। কী মজার একটা খেলা! মহাপ্রতিভাধর (এবং অবশ্যই বিপথগামী) একটা খ্যাপাটে লোক হঠাৎ করে দুনিয়ার সব বাঘা বাঘা জারজদেরকে ধ্বংস করার জন্য খেপেছে। সে আবার হ্যাকার জাতীয় বিপজ্জনক ও বেআইনি একটা প্রাণী।

সে আবার রেপিস্টও বটে। (তা তো বটেই। এমন একটা লোক ধর্ষকামী না-হয়েই যায় না।)

এইসব কাভারেজ থেকে কি মনে হয় না, কেমন মজার একটা টম-অ্যান্ড-জেরি খেলা! জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ কোন গহীন আত্মগোপনে লুকিয়ে আছেন। সারা দুনিয়ার পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। আর তারই মধ্যে অ্যাসাঞ্জ তাঁর নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্য ভুস করে ভেসে উঠছেন মাঝে মাঝে, ইন্টারনেট টেলিফোনির মাধ্যমে বড় বড় হুংকার দিচ্ছেন, 'তথ্যযুদ্ধ শুর হয়ে গেছে' ঘোষণা দিচ্ছেন। আবার দেখছি, বৃটিশ পুলিশ জানে যে অ্যাসাঞ্জ বৃটেনেই লুকিয়ে আছেন, কিন্তু তাঁকে তাঁরা ধরতে পারছেন না, কারণ তাঁর নামে ইস্যু করা বহুল আলোচিত সেই আন্তর্জাতিক লাল পরোয়ানা জারির খোদ আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্যেই নাকি ভ্রান্তি আছে। অবস্থাটা কী! (৮ ডিসেম্বর ২০০১০ তারিখে একটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় শিশিরের কার্টুনটিতে সার্বিক এই টম-জেরি অবস্থারই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক প্রকাশ ঘটেছে।)

যে আইনের শাসন নিয়ে এত বড়াই যে ধর্ষণ-মামলার একজন আসামীকে ধরতে পৃথিবীব্যাপী লাল পরোয়ানা জারি করা হচ্ছে, অথচ তার নিজেরই আইনের ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কী তাড়াহুড়া! এক্ষুণি জেরি-ইঁদুর অ্যাসাঞ্জকে ঠেকাও, নইলে টম-বিড়ালের লেজের লোম ফুলে-ফুঁসে উঠছে। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং তাঁর সমস্ত মিত্রদের তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে (হিলারী বলছেন)। অ্যাসাঞ্জ যেন নতুন ওসামা বিন লাদেন, টেররিস্ট তো বটেই, রীতিমতো ভয়ংকর শত্র। তাঁর বির দ্ধে তথ্যপ্রকাশের অভিযোগ আইনগতভাবে তোলাই যাচ্ছে না, তাতে কী? তাঁর প্রকাশিত-পরিবেশিত তথ্যকে অসত্য বলে দাবি পর্যন্ত করা যাচ্ছে না, তাতেই বা কী? কিছু না-পেলে অ্যাসাঞ্জের পরিচিতা নারীকে দিয়ে এক-দুইটা ধর্ষণের মামলা লাগাও, তারপর সেই মামলার অজুহাতে লাল পরোয়ানা জারি করো। এখন সেই পরোয়ানা নিয়েই প্রশ্ন, নতুন করে আবার জারি করতে হচ্ছে। তবু অ্যাসাঞ্জ এবং তাঁর সংগুপ্ত, আন্ডারগ্রাউন্ড কাল্ট 'উইকিলিকস'কে ঠেকাতে হবে! নইলে সাম্রাজ্যের পতন।

(খ) সাম্রাজ্যের ভয় : উইকিলিকস কোনো গুপ্তকাল্ট নয়

> অ্যাসাঞ্জ হয়ত একজন দুইজন সুইডিশ নারীকে ধর্ষণ করেছেন কিংবা করেননি (যেটা জানার জন্য হঠাৎ করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মের দণ্ডহীন সরকার), কিন্তু এ নিয়ে কোনো প্রশ্নই নাই যে তিনি স্ট্যাচু অফ লিবার্টিকে বিবস্ত্র করে ফেলেছেন এবং সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কেমন বেশ্যা [দেউলিয়া] সে হয়েছে ইদানিং। (শেরউড রস, ২০১০; অনুবাদ: স.র.ন.)

আসলে ভয় পেয়েছে সাম্রাজ্য। ভয় পেয়েছে তার সামরিক-বেসামরিক কর্পোরেট-রাষ্ট্র, মিডিয়া এবং সমগ্র শাসকশ্রেণী। সেই কারণেই উইকিলিকসের বির"দ্ধে এত সব বেআইনি রাষ্ট্রীয় চাপ, আস্ফালন ও আক্রমণ। সেই কারণেই মূলধারার মিডিয়ার বড় একটা অংশের কাভারেজের এই বিকৃতি। সেই কাভারেজে সবার আগে আড়ালে যাচ্ছে এই ঘটনা যে পুরো ব্যাপারটা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ বনাম সাম্রাজ্যের কোনো ব্যাপারই নয়। লাগাতার, নির্লজ্জ, সাম্রাজ্যিক মিথ্যাচার, গণহত্যা এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধবিরোধী শক্তিশালী জনমতকে ধারণ করে গড়ে ওঠা একটা সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলনের ডুবোপাহাড়ের দৃশ্যমান চূড়ার ডাক নাম 'জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ'। ডাক নামটা 'উইকিলিকস' হওয়াটাই ন্যায্য ছিল, এবং ঘটনাটা আদতেই ছিল তা-ই। কিন্তু, মিডিয়ার কৌশলী অপপ্রচার জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে সামনে-আনা খোদ উইকিলিকসকে এবং আরো পশ্চাদপটে বিরাজমান সামাজিক প্রতিরোধের শক্তিশালী ধারাটিকে আড়াল করতে সক্ষম হয়েছে।

উইকিলিকস যে গোপন কোনো কাল্ট নয়, এটা যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সামাজিকভাবে সুপরিচালিত বেতনহীন স্বেচ্ছাসেবীদের একটা মিডিয়া-সংস্থা, যাদের সমস্ড় কাজ চলে সামাজিকভাবে সংগৃহীত ডোনেশনের সাহায্যে, খোদ এই ব্যাপারটাকে উধাও করে দিতে না-পারলে এটা পশ্চিমের টোকনোপ্রিয় সমাজের তর"ণতর ব্যক্তি-গোষ্ঠীবর্গের কাছে অত্যন্ড় জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারার সম্ভাবনাসম্পন্ন চরম বিপজ্জনক একটা সামাজিক 'প্রযুক্তির-সাহায্যে-প্রতিরোধ' ধরনের আন্দোলনে পরিণত হতে পারে, এই আশঙ্কাটাই আসল। এই আশংকাকে আড়াল করার জন্যেই এরকম টম-অ্যান্ড-জেরি রিপোর্টিং-এর রমরমা। অর্থাৎ, আমাদের দেশের মিডিয়া এক্ষেত্রে মোটের ওপর বিশেষ কোনো ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ড় দেখিয়েছে, তা নয়।

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি সাংবাদিক। আমি জানি, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাকে এই কথার সপক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ দাখিল করতে হবে। চেষ্টা করা যাক।

লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা-বিভাগস্থ 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা-কেন্দ্র' (সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম, সিআইজে) অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অংশ হিসেবে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ এবং উইকিলিকসের কাজকর্মকে সমর্থন জোগায়। তো, এই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা-কেন্দ্র তাদের ওয়েবসাইটে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের পরিচিতি-পাতায় কী পরিচয় দিয়েছে, পড়ুন :

> জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ একজন অ্যাক্টিভিস্ট, সাংবাদিক, এবং উইকিলিকসের সম্পাদক। জন্মসূত্রে অস্ট্রেলীয় অ্যাসাঞ্জ জীবনযাপন করেছেন, কাজ করেছেন, এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁকে আড়ি পাতা হয়েছে, তাঁকে সেন্সর করা হয়েছে, তাঁর বির"দ্ধে ব্যর্থ মামলা করা হয়েছে চীন, ইরান, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ আরো অনেক দেশে।
>
> নতুন ধারার মিডিয়া হিসেবে, বিচারবহির্ভূত গুপ্তহত্যা উন্মোচন করার সুবাদে তিনি জিতেছেন ২০০৯ সালের 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া-অ্যাওয়ার্ড' এবং ২০০৮ সালের 'ইকনমিস্ট ইনডেক্স অন সেন্সরশিপ অ্যাওয়ার্ড'। পড়াশোনা করেছেন তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান এবং মেডিসিন বিষয়ে। (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা-কেন্দ্র, ২০১০)

কৌতূহলবশত অ্যামনেস্টির ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা গেল, যে কারণে জুলিয়ানকে তারা মিডিয়া-পুরস্কার দিল সেটা ছিল উইকিলিকসেই প্রকাশিত একটা দলিল: "Kenya: The Cry of Blood-Extra Judicial Killings and Disappearances"। অ্যামনেস্টির কথা থাক।

বরং চলুন, এবারে আমরা একে একে কয়টা দিক খেয়াল করি। ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে, ক] একেবারে মূলধারার আন্ড়র্জাতিক সাংবাদিকতা সংক্রান্ড় চর্চা ও শিক্ষার একটা কেন্দ্র হলো সিআইজে; খ] সিআইজে, অ্যামনেস্টি, এবং আইএফজে (সাংবাদিকদের আন্ড়র্জাতিক ফেডারেশন) উইকিলিকসকে সাংবাদিকতা ও প্রকাশনাগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করছে, আর জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে বিবেচনা করছে সাংবাদিক-প্রকাশক হিসেবে; এবং গ] মূলধারার এই সাংবাদিকতার ধ্যানধারণার মধ্যে জনগুর"ত্বসম্পন্ন গোপন খবর প্রকাশ করে সবাইকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার (বিপদবাঁশি-বাদনের) মতো ব্যাপার স্বাভাবিক ও ন্যায্য তাহলে আমরা উইকিলিকস সংক্রান্ড় যাবতীয় অন্ড়সারশূন্য অপপ্রচারের রাজনীতির স্বরূপটা বুঝতে পারব। এখন, এই 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা-কেন্দ্র' সম্পর্কে আরেকটু জানতে জানতে আমরা এ ব্যাপারে গুর"ত্বপূর্ণ কিছু তথ্য-ইশারা পেয়ে যাব আশা করি:

> ...সিআইজে একটা মুনাফাবিমুখ প্রতিষ্ঠান। এরা সাংবাদিক, গবেষক, প্রোডিউসার এবং শিক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অনুশীলন ও পদ্ধতি বিষয়ে।...
>
> কেন্দ্রটি তথ্যের স্বাধীনতা, কম্পিউটারভিত্তিক রিপোর্টিং, এবং সতর্কীকরণের বাঁশি-বাজানো মানুষদের নিরাপত্তার ব্যাপারগুলোর প্রতি উৎসাহ ও সমর্থন জোগায়। বিশেষত এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যাঁদেরকে কাজ করতে হয় যেখানে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন এবং যেখানে সত্য সাংবাদিকতা করাটা হয়ে উঠতে পারে অত্যন্ড় বিপজ্জনক একটা পেশা।
>
> সিআইজে-র প্রশিক্ষণসূচি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন অবিচার, দুর্নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সততা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে অন্ড়র্ভেদী রিপোর্টিংকে উৎসাহিত করা যায় এবং ক্ষমতাবানদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা যায়।
>
> সিআইজে-র সমর্থকদের মধ্যে আছে সানডে টাইমস ইনসাইট টিমের রিপোর্টারবৃন্দ, ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশনের প্রোডিউসারগণ, বিবিসি রেডিও ও

টেলিভিশন, চ্যানেল ফোর, প্রাইভেট আই, চ্যানেল পণ্ডাস (প্যারিস), সিবিএস সিক্সটি মিনিটস এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস।

২০০৭ সালে সিআইজে রেজিস্টার্ড চ্যারিটির মর্যাদা অর্জন করে এবং একগুচ্ছ ফাউন্ডেশনের সাহায্য-সমর্থন লাভ করে যাদের মধ্যে আছে ওপেন সোসাইটি ইন্সটিটিউট, ডেভিড অ্যান্ড ইলেইন পটার ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, পার্ক ফাউন্ডেশন, লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটি, এবং বেশ কিছু প্রাইভেট ট্রাস্ট। (উইকিপিডিয়া, ২০১০ক; অনুবাদ: স.র.ন.)

লক্ষণীয় : "সতর্কীকরণের বাঁশি-বাজানো মানুষদের নিরাপত্তার" যে ব্যাপারটাকে সিআইজে উৎসাহিত করে থাকে, ঠিক সেই কাজটাই অত্যন্ড় দক্ষতা ও নিরাপত্তার সাথে সমাধা করার একটা ব্যবস্থারই নাম উইকিলিকস। কীভাবে, তা বলার আগে বলতে হবে এই বাঁশি বাজানোর ব্যাপারটা কী। যখন পুরো সম্প্রদায়ের চরম বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন যে-ব্যক্তি চিৎকার করে, বাঁশি বাজিয়ে, ঢোল পিটিয়ে সবাইকে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, মারাত্মক বিপদ অত্যাসন্ন, তখন সেই ব্যক্তিকে ইংরেজিতে বলে 'হুইসিল-বেণ্ঢায়ার' বা 'সতর্কীকরণের বাঁশি-বাজানো মানুষ'।

বিপদবাঁশি বাজানোর কাজটাকে শুধু সিআইজে-ই প্রমোট করে না, খোদ সাংবাদিকদের আন্ড়র্জাতিক ফেডারেশন পুরোদস্ড়ুর এর পক্ষে। ইন্টারন্যালশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্টস বা আইএফজে নামে সমধিক পরিচিত এই সংগঠন কিন্তু যে-সে সংগঠন নয়। এটা সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন। এর আদি প্রতিষ্ঠা ১৯২৬ সালে। এখন একশোটা দেশে এর সদস্যসংখ্যা ছয় লাখ। আসুন একটু ধৈর্য্য ধরে আইএফজে-র ২ ডিসেম্বরের বিবৃতিটা পড়ি :

সাংবাদিকদের আন্ড়র্জাতিক ফেডারেশন (আইএফজে) আজ বিপদবাঁশি-বাদক ওয়েবসাইট উইকিলিকসের বির"দ্ধে ক্ষতিকর রাজনৈতিক বিরোধিতা ঘনিয়ে তোলার নিন্দা করেছে। সাইটটিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইটটির মূল সার্ভারের ওপর যুক্তরাষ্ট্র গতকাল চাপ প্রয়োগ করার ঘটনার পরে আইএফজে এই মর্মে অভিযোগ করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

আইএফজে-র সাধারণ সম্পাদক জনাব অ্যাইড্যান হোয়াইট বলেছেন, "জনসাধারণের জানার অধিকার প্রত্যাখ্যান করার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়।... [উইকিলিকসের বির"দ্ধে] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জবাব অত্যন্ড় বেপরোয়া ও বিপজ্জনক কেননা তা স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালার বির"দ্ধে যায়।"

হোয়াইট বলেন, [উইকিলকসের প্রকাশিত] "এইসব তথ্য সিরিয়াস, পেশাদার সাংবাদিকদের দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। জনগণের প্রতি এবং প্রকাশিত তথ্যের সাথে সংশিণ্টষ্ট লোকজনের প্রতি নিজেদের দায়দায়িত্বের ব্যাপারে এই

সাংবাদিকেরা পূর্ণ সচেতন। কিছু লোক যেমনটা দাবি করছেন সেরকম দাবি করাটা স্রেফ সমর্থনযোগ্য নয় যে এখানে জানমালের ঝুঁকি আছে। যা এখানে ক্ষতির শিকার হতে পারে তা হচ্ছে কেবল গোপনীয়তার সংস্কৃতি, যা জনজীবনের অর"চিকর দিকটার চারপাশ দিয়ে অতি দীর্ঘকাল যাবৎ পর্দা ফেলে রেখেছে।"

উইকলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ এবং তথ্যপ্রকাশের সাথে জড়িত সন্দেহে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকযুদ্ধের সেই সৈনিক ব্র্যাডলি ম্যানিং-এর মঙ্গল ও কুশলের ব্যাপারেও আইএফজে উদ্বিগ্ন। ...

অ্যাসাঞ্জকে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করা হয়েছে...

হোয়াইট আরো বলেন, "বিপদবাঁশি-বাদকদের অধিকারকে এবং জনস্বার্থে দায়িত্বপূর্ণ রিপোর্টিং-এর অধিকারকে আইএফজে এবং এর সদস্যরা সমর্থন করেন"। (আইএফজে, ২০১০; অনুবাদ: স.র.ন.)

এরকম বিপদবাঁশি বাজিয়ে সমগ্র মার্কিন জনসাধারণকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে অত্যন্ড় সফলভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন নিক্সন-প্রশাসনের কর্মকর্তা ড্যানিয়েল এলসবার্গ। তাঁর উন্মোচিত অধিকতর গুর"ত্বপূর্ণ বিপুলসংখ্যক দলিল তখন *পেন্টাগন পেপার্স* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। চলুন, এই বিপদবাঁশি-বাদক সম্পর্কে না-হয় স্বয়ং প্রফেসর নোম চমস্কির মুখ থেকেই শুনি। যুক্তরাষ্ট্রের *ডেমোক্রেসি নাও* রেডিওর সঞ্চালক অ্যামি গুডম্যান চমস্কিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "*পেন্টাগন পেপার্স*-এর সাথে আপনার কী যোগাযোগ ছিল?" উত্তরে চমস্কি :

ড্যান এবং আমি বন্ধু ছিলাম। টনি র"শোও ছিলেন। তিনিও কাগজগুলো তৈরি করেছিলেন এবং সেগুলোর উন্মোচনে সাহায্য করেছিলেন। ড্যান এবং টনির কাছ থেকে আমি প্রস্ড়ুতপ্রায় অবস্থায় দলিলগুলোর কপি পেয়েছিলাম। আর, তখন কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা সেগুলো প্রেসের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন। আমি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলাম। তারপর আমি হাওয়ার্ড জিনের সাথে মিলে, আপনি যেমনটা বললেন, এক ভলিউম প্রবন্ধ সম্পাদনা করি এবং দলিলগুলোকে সূচিবদ্ধ করি।

আমরা কিন্তু কোনো কিছু বদলাইনি। দলিলগুলো সম্পাদনা করা হয়নি। সেগুলো তাদের আদি রূপেই বহাল ছিল। আমি আর হাওয়ার্ড জিন যেটা করেছিলাম সেটা হলো একটা পঞ্চম খ" তৈরি করেছিলাম, আর, দলিলগুলো বেরিয়েছিল বাকি চার খ"ে। পঞ্চম খ"টিতে দলিলগুলোর অর্থ, তাৎপর্য ইত্যাদির ওপর বহু প"িতের বিচারবিশেণ্ঢষণমূলক প্রবন্ধ ছিল। সাথে ছিল একটা নির্ঘণ্ট। দলিলগুলো ভালোমতো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেটা ছিল অপরিহার্য। তো, এই ছিল 'বিকন প্রেস' সিরিজের প্রকাশিত পঞ্চম খ"।

অ্যামি গোল্ডম্যান : এখন আপনার ভাবনা কী? যেমন ধর"ন, এই মাত্র আমরা নিউ ইয়র্ক রিপাবলিক্যান কংগ্রেসের সদস্য পিটার কিং-এর কথা বাজিয়ে শুনিয়েছি; তিনি বলছিলেন উইকিলিকসকে বৈদেশিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা উচিত।

নোম চমস্কি : আমার মনে হয় এটা একটা অবান্ড়র কথা। আমাদের বোঝা উচিত (*পেন্টাগন পেপার্স*ও এরকমই আরেকটা ঘটনা ছিল), প্রধান প্রধান যেসব কারণে

> সরকারের গোপনীয়তার দরকার পড়ে তার মধ্যে একটা কারণ হলো, নিজের দেশের জনসাধারণের হাত থেকে সরকারকে রক্ষা করা। যেমন ধরুন ... *পেন্টাগন পেপার্স*-এর দলিলগুলোর দিকেও আপনি যদি তাকান তো দেখবেন ওখানে এমন সব জিনিস আছে মার্কিনীদের যা আগে থেকেই জানা থাকা উচিত ছিল অথচ অন্যরা তাদেরকে তা জানতে দিতে চাননি। ... এখনকার [উইকি-] উন্মোচনগুলো, আমি যত দূর দেখেছি, প্রথমত এই জন্য আগ্রহোদ্দীপক যে এগুলো আমাদেরকে কূটনৈতিক সার্ভিসের কাজকর্ম কীভাবে চলে সে সম্পর্কে জানায়। (ডেমোক্রেসি নাও, ২০১০; অনুবাদ: স.র.ন.)

বিপদবাঁশি-বাদকদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে উইকিলিকস এমন একটা সংবাদ-এজেন্সির মতো প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়েছে যাঁদের মূল স্লোগানই হচ্ছে: "আমরা সরকারকে উন্মোচন করি"। কীভাবে উন্মোচন ঘটানো হয় সে সম্পর্কে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের মুখ থেকেই শোনা যাক:

> গোপনীয়তার একটি বৈধ ভূমিকা আছে। উন্মোচনেরও একটি বৈধ ভূমিকা আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মানবতার বিরুদ্ধে বা আইনের বিরুদ্ধে যারা অপকর্মে লিপ্ত, বৈধ গোপনীয়তার দোহাই দিয়ে নিজেদের অপকর্ম আড়াল করাটাকে তারা খুব সহজ কাজ মনে করে থাকে। বিবেকসম্পন্ন মানুষেরা সুতীব্র সমালোচনা উপেক্ষা করে চিরকালই অপকর্মের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। কোনোকিছু উন্মোচন করা হবে কিনা সেটা উইকিলিকস নির্ধারণ করে না। প্রকাশের সিদ্ধান্তটা নেন কোনো একজন বিপদবাঁশি-বাদক বা কোনো ভিন্নমতাবলম্বী মানুষ। ঐ মানুষেরা যাতে নিরাপদে থাকেন, জনসাধারণের যেন তথ্য জানা থাকে এবং ঐতিহাসিক কোনো দলিল যাতে প্রত্যাখ্যাত না-হয়, এটুকু নিশ্চিত করাই আমাদের কাজ। (স্পিগেল, ২০১০; অনুবাদ: স.র.ন.)

উইকিলিকস আসলে এক ধরনের নিরাপদ ড্রপবক্স প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে। ব্যাপারটা 'আপনার অভিযোগ এই বাক্সে ফেলুন' জাতীয় একটা ইলেকট্রনিক বাকশোর মতো। সরকারের ও কর্পোরেটের মিথ্যাচার ও দুর্নীতির প্রমাণ সংক্রান্ত দলিলপত্র বা কোনো গোপন নথি পুরোপুরি গোপনে কেউ চাইলে সেই ড্রপবক্সে ফেলে দিয়ে আসতে পারেন। পরে উইকিলিকস যাচাই-বাছাই-সম্পাদনা (যথাসম্ভব কম সম্পাদনা) করার পর তাঁদের ওয়েবসাইটে এসব তথ্য প্রকাশ করে। উইকিলিকসের আসল সাফল্যটা এইখানে যে, গোপনীয়তার শতভাগ নিশ্চয়তা দেওয়ার মতো কম্পিউটার-নিরাপত্তা-প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন তারা।

মার্কিন নৌবাহিনীর পাসওয়ার্ড রচনার কৌশল অনুসরণ করে ও তাকে আরো বিকশিত করে নিরাপত্তাব্যূহ রচনা করার বুদ্ধি জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে দেন বৃটিশ কম্পিউটার এনক্রিপশন বিশেষজ্ঞ বেন লরি। বৃটেনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকার সুবাদে জানা যাচ্ছে, অ্যাসাঞ্জকে কম্পিউটারের সংকেতলিপি-লিখনের ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই লরি। রিপোর্টার ডেভিড লেই এবং জোনাথন ফ্র্যাংকলিনের রিপোর্টে অ্যাসাঞ্জ সম্পর্কে লরি বলছেন:

> "বলতে গেলে তিনি বেশ মডার্ন এক উদ্ভট মানুষ, যাঁর মধ্যে ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ে কিছু একটা করার মতো ব্যাপার ছিল। ... তিনি রীতিমতো একজন টেকি (প্রযুক্তি-দক্ষ লোক) এবং তিনি সংকেত লিখতে পারেন।"

অ্যাসাঞ্জের প্রথম দিকের স্কিমগুলোর মধ্যে একটা ছিল যাকে তিনি বলতেন "প্রত্যাখ্যানযোগ্য সংকেতলিপি-লিখন"। নির্যাতনের মধ্যেও ভিন্নমতাবলম্বীরা যেন গোপন তথ্য ফাঁস করে না দেন সে ব্যাপারে তাঁদেরকে সাহায্য করা যায় কিনা—চিন্তাটা ছিল এমন। টেক্সটগুলো স্তরে স্তরে সংকেতলিপিবদ্ধ করা হতো এমনভাবে যেন কেউ যদি পাসওয়ার্ড প্রকাশ করে দিতে বাধ্যও হন, নির্যাতক তবু বুঝতে পারবে না যে তথ্যের আরেকটা দ্বিতীয় স্তর থেকে গেছে, যা দ্বিতীয় আরেকটা পাসওয়ার্ড দিয়ে লুকানো।

অ্যাসাঞ্জ তারপর লন্ডনে হাজির হন এবং উইকলিকসের ব্যাপারে এই প্রস্তাব পেশ করেন যেন সেটা "একটা মুক্ত-সোর্স, গণতান্ত্রিক গোয়েন্দা এজেন্সি" হতে পারে। লরি বলেন : "প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, যত সব গরম গরম কথা।" পরে কিন্তু তিনি [লরি] উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এমন একটা সংকেতলিপি-লিখন-সিস্টেমের ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দেন, প্রথম যেটা তৈরি করেছিল মার্কিন নৌবাহিনী। এই সিস্টেম তিনটা আলাদা সার্ভার নিয়ে বানানো একটা চেইন হিসেবে কাজ করে এবং তথ্য-প্রকাশকদেরকে পরিচয় গোপন করে দলিল জমা দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

লরি ইন্টারনেট নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনসালট্যান্ট। আগে তার একটা ব্যবসা শুরু ছিল। সেটা শুরু হয় দুটো সামরিক বাংকার কেনার মাধ্যমে। দুটোই পরিত্যক্ত মার্কিন ঘাঁটি। একটা গ্রিনহ্যাম কমন-এ, আরেকটা কেন্ট-এ একটা রাডার স্টেশন। নিজেদের সার্ভারের নিরাপত্তা যারা চান সেসব ফার্ম ও ব্যাংকের কাছে তাঁর কোম্পানি বাংকারগুলো ভাড়া দেয়। কেন্টের বাংকারটা তো রীতিমতো মাটির অনেক গভীরে : "পারমাণবিক হামলার পরও রাডার-অপারেটররা সেখানে ৩০ দিন টিকে থাকতে পারবেন বলে মনে করা হতো"।

ওয়াশিংটন থেকে একটা ফ্লাইটে ফিরেই তিনি তাঁর অ্যাক্টনের এলোমেলো বাড়ির দরজায় খালি পায়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, এবং আগ্রহভরে বুঝিয়ে বলছিলেন কেন তিনি উইকিলিকসকে অনুমোদন করেন। "ইন্টারনেটের প্রাইভেসি নিয়ে আমার আগ্রহ অনেক দিনের। ইন্টারনেটে নজরদারির ক্ষেত্রে বিপুল সুযোগ আছে এবং তা ভালো জিনিস নয়। আবার, এটা মজার একটা কারিগরি সমস্যাও বটে: নিজের পাছায় লাথি না-খেয়ে কীভাবে আপনি ক্ষমতাবান লোকজন সংক্রান্ত বিষয়আশয় প্রকাশ করতে পারবেন? বিপদবাঁশি-বাদনের চর্চাকে আসলে উৎসাহিত করা উচিত।"

> "উইকিলিকসের সাফল্যে আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি। প্রচুর পরিমাণে আগ্রহোদ্দীপক কাজ তারা করেছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে মানুষজন ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।" (গার্ডিয়ান, ২০১০; অনুবাদ: স.র.ন.)

পাঠক চাইলে এই ফাঁকে গার্ডিয়ানের সাথে আমাদের পত্রপত্রিকার রিপোর্টিং-এর পার্থক্যটুকু দেখে নিতে পারেন। সাথে আমরা *গার্ডিয়ান* পত্রিকার ঐ একই রিপোর্টে উইকিলিকসের পরামর্শক-সভার আরেক সদস্যের কাছ থেকে উইকিলকসের বৈশিষ্ট্য আরো একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি:

পরামর্শক-সভার আরেক সদস্য হচ্ছেন প্রাক্তন একজন মার্কিন ড্রাফট রেজিস্ট্রার সি জে হিংক। থাইল্যান্ডে তাঁর বাসা থেকে তিনি বললেন:

"উইকিলিকস একটা বিকেন্দ্রীকৃত প্রপঞ্চ। আর তার মানে হলো, বারোটারও বেশি দেশে তাঁদের স্বেচ্ছাসেবীরা আছেন। এই স্বেচ্ছাসেবীরা খুব ঢিলেঢালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগঠিত থাকেন যেন সরকার কাউকে শনাক্ত করতে না-পারে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে না-পারে।

আমার মনে হয়, প্রায় যেকেনো মানুষের পক্ষেই এরকম উন্মোচনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব। (গার্ডিয়ান, ২০১০)।

(গ) সাম্রাজ্যের মোকাবেলা এবং ন্যায়পথ অবলম্বনের বিপদ

> আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কারোর পক্ষে বিপদকে এড়িয়ে ন্যায়পথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যথার্থই অলৌকিক ঘটনা।
>
> পেণ্টটো, রিপাবলিক

> সাম্রাজ্যকে মোকাবেলার জন্য এই যে মানুষজনের প্রস্তুত হয়ে ওঠা, এটাই নোম চমস্কি নিরলসভাবে বলে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে: একমাত্র মার্কিন জনসাধারণই পরিস্থিতিকে বদলে দেবার মতো অবস্থায় আছেন, তারাই পারেন যুক্তরাষ্ট্রকে বদলে দিতে; এবং আজ সাধারণ মার্কিনীদের গর্ব করার মতো সময় এসেছে, কেননা তাদের সমাজ ড্যানিয়েল এলসবার্গের মতো মানুষকে বিকশিত করে তুলেছে (নিকোস রাপ্টিস, ২০১০)।

জেনেভা ও সিয়াটলের বিশ্বায়নবিরোধী সংগ্রাম, বিশ্ব জুড়ে সততা-স্বচ্ছতা-স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধ্যানধারণার ব্যাপক প্রসার, এবং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুক্তিপরায়ণ প্রতিরোধ-আন্দোলনের অজস্রধারা-বিকাশেরই ধারাবাহিকতায় আজ গোটা পশ্চিমা সমাজের সর্বোচ্চ জ্ঞান-প্রযুক্তি-মুক্তিস্পৃহাকে আত্মস্থ করে রাষ্ট্রের কেন্দ্রিকতার বিপরীতে সমুদ্রস্রোতের মতো সদাবিকেন্দ্রীকৃত যে মহা-সমাজসমুদ্র জেগে উঠছে তারই গর্জন আজ শোনা যাচ্ছে উইকিলিকসের উন্মুক্ত উন্মোচনের মধ্যে।

প্রযুক্তিমনস্ক সামাজিক প্রতিরোধের ধারায় ভীত, শংকিত ও দিশেহারা শাসকশ্রেণী স্বাধীনতার মানসভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিন দিন একটা প্রকাশ্যনির্লজ্জ, মিথ্যাচারী দানবে রূপান্তরিত করে ফেলছে। মার্কিন সাংবাদিক

শেরউড রস (২০১০) সেই বিপদের কথাই তুলে ধরেছেন শিউরে ওঠার মতো ভাষায় :

> মার্কিন প্রভু-প্রজাতির দ্বারা পরিচালিত নতুন সাহসী পৃথিবীতে বৈদেশিক কূটনীতিকরা বিনম্র তদ্বিরকারী মাত্র, সমকক্ষ কেউ নন; চাইলেই তাদের সাথে যেকোনো ধরনের মর্যাদাবিনাশী আচরণ করা যায়। এবং (সাবাশ!) মার্কিন জনসাধারণের সাথেও তা করা যায়। তাঁদের শরীর এখন এক্সরে করা হচ্ছে; বিমানবন্দরগুলোতে ছানাছানি করা হচ্ছে তাঁদের শরীর। তাঁদের টেলিফোনে আড়িপাতা হচ্ছে, এবং পড়া হচ্ছে তাঁদের ফ্যাক্স ও ইমেইল। তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রেডিট কার্ড গোপনে দেখা হচ্ছে। কোনো একটা রিপাবলিকান কনভেনশনে অথবা একটা বাণিজ্য সম্মেলনে প্রতিবাদ করার মতো সাংবিধানিক অধিকার চর্চা করার কারণে মার্কিনীদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে। প্রাইভেট ব্যাংকারদেরকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে জনসাধারণের খাজনার প্রায় সমস্তটাই হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের সন্তানদেরকে এখন আগ্রাসন-যুদ্ধ লড়তে বলা হচ্ছে। যে যুদ্ধের ভিত্তি হলো গিয়ে সেইসব মিথ্যা, উইকিলিকস যা উন্মোচন করার মতো সাহসটুকু অন্তত দেখিয়েছে এবং মিসেস ক্লিনটন যা লুকাতে চাচ্ছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বাধীনতার জন্য আর আমেরিকার দিকে তাকায়ও না। সে এখন কোয়ান্টিকো ব্রিগেডের ভেতরে [সেনাবাহিনীর] পিএফসি ব্র্যাডলি ম্যানিং-এর সাথে বন্দি হয়ে আছে।" (শেরউড রস, ২০১০; অনুবাদ : সরন)

বন্দি আমেরিকাকে মুক্ত করার সংগ্রাম পরিচালনা করতে চিরস্বাধীনতাপ্রিয় মার্কিন জনগণ নিজেদের মতো করে সংগঠিত হচ্ছেন, প্রযুক্তি শিখছেন প্রতিরোধের জন্য। চলুন, আমরা তাঁদের সহযোগী হই, তাঁদেরকে সমর্থন করি, তাঁদের কাছ থেকে শিখি। সেই সাথে চলুন, আমরা আমাদের নিজেদের বাকস্বাধীনতার বিদ্যমান সীমা প্রসারিত করার প্রচেষ্টায় ধীরস্থিরভাবে সংগঠিত হতে শুরু করি, এবং তার পাশাপাশি একটি পূর্ণ স্বচ্ছ সরকার ও বেসামরিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা তুলি। দূর করি নিজেদের মানসবন্দিত্ব।

৭ ডিসেম্বর ২০১০
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

হদিস

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা-কেন্দ্র (২০১০)। "Julian Assange", Centre for Investigative Journalism (http://www.tcij.org/about-2/teachers-and-speakers/julian-assange), (Retrieved on December 3, 2010).
আইএফজে (২০১০)। "IFJ Condemns United States "Desperate and Dangerous" Backlash over WikiLeaks", 02 December 2010, http://

www.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-united-states-desperate-and-dangerous-backlash-over-wikileaks; http://www.tcij.org/whistleblower-guidelines/wikileaks (Retrieved on December 6, 2010).

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (২০১০)। "Amnesty announces Media Awards 2009 winners". AmnestyInternational. 2 June 2009. http://amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18227 (Retrieved on December 3, 2010).

অ্যালেক্স মেসি (২০১০)। Alex Massie, "Yes, Julian Assange is a Journalist", http://www.spectator.co.uk/alexmassie/6437594/yes-julian-assange-is-a-journalist. html, Tuesday, 2nd November 2010, (Retrieved on December 6, 2010).

উইকিপিডিয়া (২০১০ক)। "Centre for Investigative Journalism", http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_investigative_journalism (Retrieved on December 6, 2010).

উইকিপিডিয়া (২০১০খ)। "Julian Assange", http://en.wikipedia.org/wiki/ (Retrieved on December 6, 2010).

গার্ডিয়ান (২০১০)। David Leigh and Jonathan Franklin, "Whistle While You Work", The Guardian,Saturday 23 February 2008, http://www.guardian.co.uk/theguardian/2008/feb/23/internet.usa (Retrieved on December 6, 2010).

ফোর্বস্ (২০১০)। Forbes, "An Interview With WikiLeaks' Julian Assange", 29 November 2010, http://blogs.forbes.com/andygreenberg/ 2010/11/29/an-interview-with-wikileaks-julian-assange/6/ (Retrieved on December 6, 2010).

মশিউল আলম (২০১০), "হাটে হাঁড়ি ভাঙা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ", সম্পাদকীয় পাতা, প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর ২০১০।

ডেমোক্রেসি নাও (২০১০)। Noam Chomsky Interviewed by Amy Goodman: "WikiLeaks Cables Reveal ÒProfound Hatred for Democracy on the Part of Our Political Leadership", http://www.commondreams.org/headline/ 2010/11/30-7, Published on Tuesday, November 30, 2010 by Democracy Now! (Retrieved on December 6, 2010).

নিকোস রাপ্টিস (২০১০)। Nikos Raptis, "The Lists of Death and Shame", August 08, 2010, http://www.zcommunications.org/the-lists-of-death-and-shame-bynikos-raptis (Retrieved on December 6, 2010).

শেরউড রস, ২০১০। Sherwood Ross, "Assange is Headed for Prosecution for Publishing the Truth about U.S.", December 01, Z Net: www.zcommunications.org/assange-is-headed-for-prosecutionfor-pub lishing -the-truth-about-u-s-by-sherwood-ross (Retrieved on December 5, 2010).

স্পিগেল (২০১০)। Interview with Assange, "WikiLeaks Founder Julian Assange on the ÔWar LogsÕ: I Enjoy Crushing Bastards", SPIEGEL, 26 July, Germany, www.spiegel.de/international/world/0,1518,708518,00. html (Retrieved on December 5, 2010).

মিডিয়া ও মানুষের অভিযোজন : প্রসঙ্গ বাংলা বণ্ঢগ

সুদীপ্ত শর্মা

"Media and communication can be an immense and powerful instrument for change and empowerment in society."

The BBC World Service Trust

পৃথিবীতে কে কতকাল টিকে থাকবে কিংবা কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করবে তা মূলত তার অভিযোজন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। এ ক্ষমতার জন্যই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও প্রতিটি জীব নিজেকে সহজে মানিয়ে নেয়। শুধু তাই নয়, চেষ্টা চালিয়ে যায় প্রকৃতি থেকে সর্বোচ্চ সুফল আদায় করে নেওয়ার। আর এ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সে টিকে থাকে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। মানুষও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। আর তাই পৃথিবীতে মানুষের বয়স আজ প্রায় ছয় মিলিয়ন বছর। নিজেকে অভিযোজিত করতে করতেই সে তৈরি করেছে সভ্যতার একেকটা স্তর। চলে এসেছে আদিম যুগ থেকে আজকের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায়। স্বাভাবিকভাবেই এজন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঝরাতে হয়েছে অনেক ঘাম। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য আদিম গুহামানব আগুন আবিষ্কারের মাধ্যমে যে যাত্রা শুর" করেছিল তা আজ পারমাণবিক বোমায় এসে ঠেকেছে। ধারাবাহিক এ প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে আবির্ভাব ঘটে বর্তমান মিডিয়ার। মানুষ আশা করেছিল এ বস্তুটি তার স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রাকে আরো এক ধাপ বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু 'মহৎ' উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি হলেও পারমাণবিক শক্তির মতো মিডিয়াও এখন বরং অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষতির কারণ হচ্ছে। সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি প্রতিকূল পরিস্থিতির। আর তাই নিজের ধর্ম অনুযায়ীই মানুষ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মিডিয়াকে কিভাবে নিজেদের উপকারে নিয়ে আসা যায় তা নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা। আওয়াজ উঠেছে বিকল্প মিডিয়ার। তারই একটি মাধ্যম হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে বণ্ঢগের। অনেকের মতে বণ্ঢগ এতটাই সম্ভাবনাময় যে তা প্রথাগত মিডিয়ার ক্ষমতাকেও চূর্ণ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে অনেকেই আবার এর মধ্যে সম্ভাবনার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাননা। যাই হোক, আবেগের বশবর্তী না হয়ে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় বিকল্প মিডিয়া হিসেবে ব্লগ আসলে কতটা কী করতে পারে তা আলোচনার দাবি রাখে। যদিও এ সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের দেশে এখনো খুব একটা দৃশ্যমান নয়। এখানে সে চেষ্টাই করা হবে। তবে তা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে। সেজন্য পুরো আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম ভাগে বিকল্প মিডিয়া ও বণ্ঢগ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগে বিশ্বে এবং বাংলাদেশে বণ্ঢগের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার পর তৃতীয় ভাগে আমরা বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা খোঁজার চেষ্টা করব। চতুর্থ ভাগে শক্তিশালী বিকল্প মিডিয়া হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বণ্ঢগের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সবশেষে এসব সমস্যা সমাধানের কিছু উপায় বের করার চেষ্টা করা হবে।

বিকল্প মিডিয়া

বিকল্প শব্দটির মাঝেই বিকল্প মিডিয়া বলতে কী বোঝায় তা অনেকটা টের পাওয়া যায়। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, মূলধারার মিডিয়ার বিকল্প যে মিডিয়া তাই বিকল্প মিডিয়া। অর্থাৎ বিকল্প মিডিয়া হলো তাই যেখানে প্রতিদিনের মূলধারার মিডিয়ায় অনুপস্থিত বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়। তবে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বিকল্প মিডিয়ার চিত্র রূপায়নের চেষ্টা করেছেন। টিম ও সুলিভান যেমন বলেছেন, বিকল্প মিডিয়া অবশ্যই বিপণ্ঢবী পন্থায় সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে ওকালতি করবে (হক উদ্ধৃত, ২০১০)।

ইন্টারনেটভিত্তিক বিকল্প মাধ্যম *জিনেট*-এর প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল অ্যালবার্ট মনে করেন, মূলধারার মিডিয়া প্রতিষ্ঠান (সরকারি বা বেসরকারি) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রধান লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন এবং আয়ের উৎস হিসেবে এলিট অডিয়েন্সকে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করা। কিন্তু বিকল্প মিডিয়া প্রতিষ্ঠান মুনাফামুখী নয়, প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে অডিয়েন্সকে বিক্রি করতে চায় না (তাই বৃহত্তর ও নন-এলিট অডিয়েন্সই তার উদ্দিষ্ট) এবং সমাজকর্তৃক সংজ্ঞায়িত স্ড়রভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের ধারণাকে অতিক্রম করতে চায়। অ্যালবার্ট মনে করেন একটি বিকল্প মিডিয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে (হক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত) :

- বিকল্প মিডিয়ার কর্মচারীরা পদবী ব্যতিরেকেই সমান পরিমাণ কাজ করবে এবং সমান বেতন পাবেন;
- সিদ্ধান্ড়গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংগঠনের সবার অংশগ্রহণ থাকবে এবং সংগঠনটি স্ড় রভিত্তিক হবার চাইতে গণতান্ত্রিক হবে;
- কষ্টসাধ্য হলেও লিঙ্গ ও বর্ণনির্বিশেষে শ্রমবিভাজনের বিভেদরেখা উঠিয়ে দেয়া হবে;
- বিকল্প মিডিয়া প্রতিষ্ঠান যখন অডিয়েন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তা মিডিয়া পণ্য দিয়ে হোক বা ব্যবসাসূত্রে হোক, মিথস্ক্রিয়াটি উপরোক্ত অভ্যন্ড়রীণ মূল্যবোধভিত্তিক হবে;
- কেবল বিজ্ঞাপনদাতাদের কল্পিত এলিট-ক্রেতাদের কাছে নয়, বিকল্প মিডিয়া প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর ও সর্বস্ড়রের জনগণের কাছে পৌঁছাতে চাইবে এবং
- বিকল্প মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরকে নানাভাবে সাহায্য করবে।

মাইকেল অ্যালবার্ট বিকল্প মিডিয়ার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেই রকম মূলনীতির বেশ কিছু মিডিয়া রয়েছে সাইবারজগতে; যার মধ্যে অন্যতম হলো বণ্ঢগ।

বণ্ঢগ কী?

মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ার[১] মতে, বণ্ঢগ হলো ব্যক্তি পরিচালিত এক ধরনের ওয়েবসাইট যেখানে নিয়মিত মতামত, ঘটনার বর্ণনা কিংবা স্থির বা সচল চিত্র সংযোজন করা হয়। সংযোজিত বিষয়গুলো সাধারণত বিপরীত সময়ানুক্রমে সাজানো থাকে। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, বণ্ঢগ হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক এমন একটি মিডিয়া যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার চিন্ড্র-মতামত-দর্শন এবং বিভিন্ন চলমান বিষয় সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ উপস্থাপন করতে পারেন। এ কাজে তিনি প্রয়োজনে টেক্সট ছাড়াও ছবি এবং বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোন বণ্ঢগ কিংবা ওয়েবপেজের লিংক ব্যবহার করে থাকেন। বণ্ঢগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে মিথস্ক্রিয়ামূলক পরিবেশে যেকোন ব্যবহারকারীই মতামত প্রদান করতে পারেন। বেশিরভাগ বণ্ঢগই টেক্সটনির্ভর। তবে টেক্সট ছাড়াও আর্ট (আর্টবণ্ঢগ), স্থিরচিত্র (ফটোবণ্ঢগ), স্কেচ (স্কেচবণ্ঢগ), সচলচিত্র (ভিডিওবণ্ঢগ), সঙ্গীত (এমপিথ্রি বণ্ঢগ) এবং অডিও (পডকাস্টিং) নির্ভর বণ্ঢগও রয়েছে। এছাড়া মাইক্রো-বণ্ঢগিং নামে আরেক ধরনের বণ্ঢগ আছে যেখানে খুব ছোট আকারের পোস্ট পরিবেশন করা হয়। বণ্ঢগের প্রত্যেকটি টেক্সট বা চিত্রের সংযোজনকে একেকটি পোস্ট বলা হয়।

শুধু আধেয়ের বিভিন্নতার জন্যই নয় বরং তা পরিবেশনের বিভিন্নতার জন্যও বণ্ঢগ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তবে মোটা দাগে বণ্ঢগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট। পৃথিবীব্যপী বণ্ঢগ বলতে ব্যক্তিগত বণ্ঢগকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এটি ব্যক্তির চলমান ডায়েরির মতো। অন্যদিকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বণ্ঢগ হলো কর্পোরেট বণ্ঢগ। এটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ছাড়াও মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং কিংবা জনসংযোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলো ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক (রাজনীতি, ভ্রমণ, ফ্যাশন, শিক্ষা, সঙ্গীত, কুইজ, আইন ইত্যাদি), মিডিয়াভিত্তিক (ভণ্ঢগ, লিংকলগ, স্কেচবণ্ঢগ, ফটোবণ্ঢগ ইত্যাদি) এবং ডিভাইসভিত্তিক (যেমন মোবাইলনির্ভর মোবণ্ঢগ) বণ্ঢগও রয়েছে। তবে বাংলাভাষীদের কাছে বণ্ঢগ মানেই বণ্ঢগ কমিউনিটি বা বণ্ঢগীয় সমাজ। এটি একক কারো বণ্ঢগ নয়। অনেক বণ্ঢগার

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

এখানে সদস্য হয়ে থাকেন এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার একটি পণ্ঢাটফর্ম হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠেন।

বণ্ঢগ : শুর‍ুর কথা

ইংরেজি 'ওয়েবলগ' থেকে বণ্ঢগ শব্দটি এসেছে; যাকে ভেঙ্গে বলা যায় 'ওয়েব' (সাইট)-এর 'লগ'। এক্ষেত্রে 'লগ' শব্দটি এসেছে 'দৈনন্দিন কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করার রেকর্ড বই'-এর ধারণা থেকে, যা এর মূলগত অর্থ 'সমুদ্রযাত্রার সময় জাহাজের দৈনন্দিন কার্যকলাপের রেকর্ড' থেকে এসেছে। যতদূর জানা যায়, জন বার্জার নামের একজন আমেরিকান ১৯৯৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর তার অনলাইন জার্নাল *রোবোট উইজডম*-এ প্রথম 'ওয়েবলগ' শব্দটি ব্যবহার করেন (গুরাক ও অন্যান্য, ২০০৪)। তিনি বণ্ঢগ জগতের আদি পুরুষদের একজন এবং প্রথম দিককার বণ্ঢগ সাইটের উদ্যোক্তাও। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল-মের দিকে পিটার নামের এক ব্যক্তি 'ওয়েবলগ' শব্দটিকে ভেঙ্গে 'উই বণ্ঢগ' হিসেবে ব্যবহার করেন। বিবর্তনের ধারায় পরবর্তীতে তা শুধু 'বণ্ঢগ' নামেই পরিচিত হয়ে উঠে। শুর‍ুর দিকের বণ্ঢগাররা ছিলেন প্রযুক্তি-জ্ঞানী লোকজন, যেমন আইটি ইন্ড্রাস্ট্রিতে কর্মরত প্রোগ্রামার বা ডিজাইনার। ১৯৯৮ সালে আমেরিকায় *ওপেন ডায়েরি* প্রথম বণ্ঢগ পণ্ঢাটফর্ম হিসেবে যাত্রা শুর‍ু করে। পরের বছরই বিভিন্ন বণ্ঢগ পোর্টাল যেমন *পিটাস*, *বণ্ঢগার*, *গ্রোকসুপ*, *লাইভ জার্নাল*, *ডায়রিল্যান্ড*-এর আবির্ভাবে বণ্ঢগিং অনেক সহজ হয়ে ওঠে। লক্ষ্যনীয় হলো এগুলো ছিল বর্তমান বাংলা কমিউনিটি বণ্ঢগিং পণ্ঢাটফর্মগুলোর মতো। অর্থাৎ এদের একটি এগ্রেগেটর বা প্রথম পাতা ছিল যেখানে সবার লেখা আসত। পরে এই ডিজাইনের বিবর্তন শুর‍ু হয় এবং খুব সম্ভবত 'বণ্ঢগার' (বণ্ঢগস্পট) পণ্ঢাটফর্ম থেকেই বণ্ঢগগুলো স্বকীয়তা পাওয়া শুর‍ু করে। বর্তমানে বণ্ঢগ-এ পোস্ট করা, মতামত দেয়া কিংবা লেখা সম্পাদনা করা ইমেইল করার মতোই সহজ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সামাজিক যোগাযোগ ও মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন বণ্ঢগ সাইট বিপুল পরিমাণ লেখক-পাঠক-ভিজিটরদের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এর সাথে পালণ্ঢা দিয়ে সাইবারপরিসরে হু হু করে বাড়তে থাকে বণ্ঢগ সাইটের সংখ্যা। যার ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। তবে ইংরেজি বণ্ঢগের বিস্ফোরণটা হয় ২০০৩ সালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের সময়। বণ্ঢগ সার্চ ইঞ্জিন *টেকনোরাতি*[২] বণ্ঢগাবর্ত-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানায় যে, ২০০২ সালের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তারা ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ বণ্ঢগের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। আর সাইবারপরিসরে প্রতি ঘন্টায় ৯ লাখ বণ্ঢগ পোস্ট করা হয়ে থাকে। এসব পোর্টালে বণ্ঢগপাতা তৈরি করে বণ্ঢগিং চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোন অর্থ দিতে হয়না। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে নিজের মতামত,

[2] http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/

দর্শন ও কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণ অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য এর চেয়ে সহজ মাধ্যম আর নেই।

এখন আসা যাক বাংলা বণ্ঢগের কথায়। অন্য সবকিছুর মতো স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপ-আমেরিকার বণ্ঢগ বিস্ফোরণের ধাক্কা আমদের এখানেও লাগে। আর সে ধাক্কা থেকেই ২০০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্ম নেয় প্রথম বাংলা বণ্ঢগিং পণ্ঢাটফর্ম *বাঁধ ভাঙ্গার আওয়াজ (সামহোয়ারইন...বণ্ঢগ)*। প্রথমদিকে বাংলা লেখা নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও ২০০৬ সালে বণ্ঢগটি ইউনিকোড হলে পূর্ণতা পায়। শুর" হয় বাংলা সাইবার লেখকদের জয়যাত্রা। মূলধারার মিডিয়ার বিভিন্ন বাধার কারণে যারা এতদিন লেখালেখির ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রেখেছিলেন মতামত প্রকাশের এমন সহজ মাধ্যম পেয়ে তারা তা লুফে নিলেন। বাড়তে থাকে বণ্ঢগারদের সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন বণ্ঢগিং পণ্ঢাটফর্মের। সামহোয়ারইন ছাড়াও বর্তমানে বাংলা বণ্ঢগিং পণ্ঢাটফর্মের মধ্যে অন্যতম হলো *সচলায়তন*, *আমার বণ্ঢগ*, *প্রথম আলো বণ্ঢগ* ও *মুক্তাঙ্গন (নির্মাণ বণ্ঢগ)*। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো বাংলা বণ্ঢগ যে কতটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে তা এ জগতে *প্রথম আলো*র আগমন দেখেই বোঝা যায়। বণ্ঢগিংয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখেই যে তারা এদিকে হাত বাড়িয়েছে তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। কারণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতোই *প্রথম আলো* শেষ পর্যন্ত ব্যবসাটাই বোঝে। আর যেখানে লোকসমাগম বেশি সেখানে ব্যবসাও বেশি এটা সহজ কথা।

বণ্ঢগ : সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আলো?

মিডিয়া ফিলসফার য়ুর্গেন হেবারমাস-এর জনপরিসর তত্ত্ব (ফেরদৌস, ২০০৬) থেকে আমরা জানি আঠারো শতকে ইউরোপে সেলুন ও কফি হাউসগুলো মুক্ত আলোচনার জন্য আদর্শ স্থান ছিল। যাকে তিনি বলেছেন 'বুর্জোয়া পাবলিক স্ফেয়ার'। এসব স্থানে সমাজের সকল স্তরের মানুষদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তারা সেখানে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতেন এবং তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠতেন। তবে এসব আলোচনা-সমালোচনার এজেন্ডা নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করত সংবাদপত্র ও জার্নাল। হেবারমাসের মতে, আঠারো শতকে সংবাদপত্র ও সাময়িকী জনপরিসরের অভিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পরে, সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো বিজ্ঞাপন ও পণ্যবাণিজ্যের খপ্পরে পড়ে যায়; গণভোক্তা ও গণবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলে; ফলে জনগণের স্বার্থে সমাজের সত্যিকার ইস্যু নিয়ে আলোচনার এজেন্ডা যোগাতে ব্যর্থ হয়; তারা বরং যেকোনো প্রকারে কাটতি বাড়ানোর দিকে ঝুঁকে যায় এবং তাদের আধেয় নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞাপনদাতা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ভূমিকা রাখতে থাকে। হেবারমাসের মতে এভাবে জনপরিসর ক্ষীণ থেকে

ক্ষীণতর হতে থাকে। সেই যে শুর" তা আর থামেনি। বরং পুঁজি দ্বারা পরিচালিত এ মিডিয়া মুনাফার লোভে নতুন নতুন কায়দা-কানুন রপ্ত করে যাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে মধ্যযুগে যেখানে রাষ্ট্র ও চার্চ দ্বারা সমাজ পরিচালিত হতো সেখানে আজ চার্চের জায়গা দখল করেছে মিডিয়া। ফলে এসব মিডিয়া থেকে ক্ষুদ্র সংখ্যক পুঁজিপতি কিংবা আধিপত্যশীল গোষ্ঠীটাই কেবল উপকৃত হচ্ছে। মুষ্টিমেয় সাধারণ মানুষ হচ্ছে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ক্ষতির স্বীকার। আর তাই মূলধারার মিডিয়া আজ পৃথিবীজুড়েই সমালোচিত হচ্ছে। মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা অনুযায়ীই চেষ্টা করা হচ্ছে এ থেকে বেরিয়ে আসার। মিডিয়াকে কীভাবে প্রকৃতঅর্থেই মানুষবান্ধব করা যায় তা নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা। কথা উঠেছে বিকল্প মিডিয়ার। আর এর হাত ধরেই উঠে এসেছে কমিউনিটি মিডিয়া ও বণ্ঢগ-এর ধারণা। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে বিকল্প মিডিয়া হিসেবে অনেকে বণ্ঢগকেই প্রাধান্য দেন। তাদের এ ভাবনার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। উপরে জনপরিসর তত্ত্বে হেবারমাস আঠারো শতকের ইউরোপে যে জনপরিসরের কথা বলেছেন বর্তমানে সে জনপরিসরের ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা বণ্ঢগ সাইটগুলোর রয়েছে। আগেই বলেছি এখানে অর্থাৎ বণ্ঢগস্ফেয়ারে যে কেউ সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতিসহ যেকোন বিষয়ে তার মতামত, চিন্তা, দর্শণ কিংবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করতে পারেন। এমনকি সহবণ্ঢগারদের সাথে মেতে উঠতে পারেন তর্ক-বিতর্কে। ঠিক যেমনটি হেবারমাস 'বুর্জোয়া পাবলিক স্ফেয়ার' সম্পর্কে বলেছেন, প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চার জন্য যা অপরিহার্য। ব্লগ কী পরিমাণ সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে তা এ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

বিশ্বজুড়ে বিকল্প মিডিয়া হিসেবে বণ্ঢগ ইতোমধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা বণ্ঢগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার আগে উইকিপিডিয়া[3] থেকে তার কিছু নমুনা দেখা যাক।

- ২০০২ সালে মার্কিন সিনেট নেতা (মেজরিটি লিডার) ট্রেন্ট লট ১৯৪৮ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্টপ্রার্থী সিনেটর স্ট্রম থারমন্ডের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, থারমন্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরো ভালো হতো। সমালোচকরা এ মন্তব্যকে বর্ণবাদকে পরোক্ষভাবে বৈধতা দেয়া হিসেবে দেখে। কারণ উক্ত নির্বাচনে থারমন্ড বর্ণবাদের পক্ষে কথা বলে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। বণ্ঢগাররা বিভিন্ন বণ্ঢগ সাইটে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও সাক্ষাৎকার একের পর এক পোস্ট করতে থাকেন। যার ফলশ্র"তিতে লট মেজরিটি লিডারের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, লট উক্ত মন্তব্যটি মিডিয়ার সামনে করেছিলেন।

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

কিন্তু বণ্ঢগে বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার আগে মূলধারার কোন মিডিয়াই স্পর্শকাতর এ বিষয়টি নিয়ে কোন রিপোর্ট করেনি।

- ২০০৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল *সিবিএস*-এর 'সিক্সটি মিনিটস' অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ডেন রেদার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সামরিক কর্মকা ের কিছু জাল দলিল বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুমাস আগে। বণ্ঢগাররা উক্ত দলিলকে জাল বলে ঘোষণা করে তার পক্ষে তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করলেন। যার পরিণতিতে *সিবিএস* ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়। এটি 'রেদারগেট কেলেঙ্কারি' নামে পরিচিত।
- হাওয়ার্ড ডিন ও ওয়েসলি ক্লার্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে বলেন, ২০০৪ সালে বণ্ঢগ মূলধারার মিডিয়াকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। কারণ এ সময়টাতে রাজনৈতিক পরামর্শক, সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনীপ্রার্থীরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানো ও মতামত তৈরির জন্য বণ্ঢগকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুর করেন। রাজনীতিবিদরা যুদ্ধ ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য বণ্ঢগকে এমনভাবে ব্যবহার করা শুর করলেন যাতে সংবাদ উৎস হিসেবে বণ্ঢগ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

উইকিপিডিয়ার এই উদাহরণগুলোর বাইরে বণ্ঢগের সফলতার কথা বলতে গেলে যে উদাহরণগুলো এখন আর না দিয়ে কোনো উপায় নেই তা হলো তিউনিশিয়া ও মিশরের সফল গণআন্দোলন; যেখানে বণ্ঢগসহ অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমই মূল ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে দেশ দুটির প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তিউনিশিয়ার গণআন্দোলন সম্পর্কিত *বিবিসির* একটি প্রতিবেদনেও[4] বলা হয়েছে, এটা ঠিক যে, শ্রমিক ইউনিয়ন ও প্রথাগত রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো কিছুটা ভূমিকা রেখেছে; কিন্তু ইন্টারনেটভিত্তিক নতুন প্রজন্মই ওই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বহির্বিশ্বে ব্লগের এ চিত্র মাথায় রেখে এখন আসা যাক বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। বণ্ঢগের সম্ভাবনা নিয়ে *সামহোয়ারইন...বণ্ঢগ* সাইটের একজন বণ্ঢগার (রাসেল, ২০০৯) বলেন, "অতীত কাল: মানুষ সম্পদশালী হলে সম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পুষতো। বর্তমান কাল: মানুষ সম্পদশালী হলে সংবাদপত্র পুষে। ভবিষ্যৎ কাল: মানুষ সম্পদশালী হলে পয়সা দিয়ে বণ্ঢগার পুষবে।" কথাটা যে একবারে উড়িয়ে দেবার মত না তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি পরিসংখ্যান থেকে। আগেই বলেছি, ওয়েবে বাংলা লেখার জন্য ফোনেটিক কিবোর্ড উদ্ভাবনের মাধ্যমে *সামহোয়ারইন...বণ্ঢগ* অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখন এ জনপ্রিয়তার মাত্রা এতটাই যে বর্তমানে বণ্ঢগসাইটটির রেজিস্টার্ড

[4] http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12180954

বণ্ঢগারের সংখ্যা ৬৫ হাজার। (ফাইভ, ২০১০) প্রতি ছয় মিনিটে সেখানে একটি নতুন পোস্ট এবং প্রতি ২০ সেকেন্ডে একটি নতুন মন্তব্য সংযোজিত হচ্ছে। (Star, 2008) দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার যেখানে মাত্র ০.৪%[5], সেখানে এই পরিসংখ্যানটা যথেষ্ঠ উৎসাহব্যাঞ্জক। সামহোয়ারইন...বণ্ঢগ ছাড়াও *সচলায়তন*, *আমার বণ্ঢগ*, *প্রথম আলো বণ্ঢগ*, *নির্মান বণ্ঢগ* ইতোমধ্যে বাংলাভাষী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এসব সাইটগুলোতে এখন শুধু দেশীয় বণ্ঢগাররা নয়, প্রবাসী বাংলাভাষী বণ্ঢগাররাও নিয়মিত তাদের যাপিত জীবনবোধ-মতামত-চিন্ড়া-দর্শন-অভিজ্ঞতা ও ঘটনার নিজস্ব বিচার বিশেণ্ঢষণ তুলে ধরছেন। এক হিসেবে দেখা যায় ২০১০ সালে ১৯২ টি দেশ থেকে বণ্ঢগার ও ভিজিটররা *সামহোয়ারইন...বণ্ঢগ* সাইটটি ভিজিট করেছেন। (ফাইভ, প্রাগুক্ত)

পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও প্রচলিত মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে বণ্ঢগ। আমরা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের যেসব সীমাবদ্ধতার কথা জানি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতা। সংবাদপত্রে যেমন স্থানের সীমাবদ্ধতা আছে তেমনি টেলিভিশনে রয়েছে সময়ের সীমাবদ্ধতা। নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের অতিরিক্ত কিছু মিডিয়া দুটিতে দেয়া সম্ভব নয়। বণ্ঢগের সবচেয়ে বড় সুবিধাটা এখানেই। বণ্ঢগাররা এসব নিয়ে চিন্তা না করে হাত খুলে লিখে যেতে পারেন। স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও মূলধারার মিডিয়ার নীতির কারণে অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুই আলোচনায় আসে না। মূলধারার মিডিয়ার এসব এড়িয়ে যাওয়া ইস্যুগুলোকে সবার সামনে নিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করেছে বণ্ঢগ। উন্নত বিশ্বের বণ্ঢগাররা ইতোমধ্যে সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক কাজ করেছেন যা উপরের উদাহরণগুলো থেকেই স্পষ্ট। এই অল্প সময়ে বাংলাদেশের বণ্ঢগ সাইটগুলোতে কিছু বিষয় ব্যাপক আলোচনার পর মূলধারার মিডিয়ায় স্থান পেয়েছে।

এছাড়া মূল ধারার সংবাদপত্রে একটি লেখা পাঠিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও তা আদৌ আলোর মুখ দেখবে কিনা সে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়না। অনেক লেখাই সম্পাদনার ছুরির কবলে পরে হারিয়ে যায় চিরতরে। অথচ বণ্ঢগে বড় কিংবা সাধারণ যেকোন মাপের লেখকই তার চিন্তা ও মতামত অনায়াসে তুলে ধরতে পারেন। *সামহোয়ারইন...বণ্ঢগ* সাইটের আরেকজন বণ্ঢগারের মতে,

> মান-নিম্নমান ধারণার আড়ালে শিল্প-সাহিত্যের জগতেও যে একটি কেন্দ্র-প্রান্ত মের করণ প্রক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবে টিকে আছে বণ্ঢগ সে প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রান্তিক লেখক-চিন্তকদের জন্য একটি পাটাতন তৈরি করেছে। ফলে

[5] http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia

বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চলের যেকোন অপ্রচলিত লেখক শুধু ইন্টারনেট সুবিধায় প্রবেশাধিকারের সুবাদে তুলে ধরতে পারছেন নিজের চিন্ড়া, মতামত ও সৃজনশীলতা। এভাবেই বাংলা বণ্ঢগ লেখালেখি জগতের প্রচলিত শহরকেন্দ্রিকতা, আরও সুস্পষ্টভাবে বললে ঢাকাকেন্দ্রিকতাকে অনেকখানি ভেঙ্গে দিয়েছে, বিপরীতে ঢাকা, ঢাকার বাইরের জেলা এবং প্রবাসের বাংলা ভাষাভাষী লেখক-পাঠকদের মধ্যে নিয়মিত মিথস্ক্রিয়া করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জায়গাটাকে আরও বিস্ড়ৃত করার ক্ষেত্রে একটি সুসংবাদ।...বাংলা বণ্ঢগ আমাদের প্রাণের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে যেমন নতুনভাবে সমৃদ্ধ করার একটি দিগন্ত খুলে দিয়েছে তেমনি একই পাটাতনে দাঁড়িয়ে বিতর্ক-প্রতর্ক করে সমাজ রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে আরও বেগবান করার অমিত সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছে। (শামীম, ২০০৮)

সমাজ রূপান্ড়রের আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক এক্টিভিজমেও বণ্ঢগ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বহির্বিশ্বে বণ্ঢগের সফলতার কাহিনী আলোচনার করার সময় আমরা দেখেছি বণ্ঢগসহ অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম তিউনিশিয়া ও মিশরের গণআন্দোলনের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা বণ্ঢগকেও ইতোমধ্যে সচেতন বণ্ঢগাররা সমচিন্ড়ার মানুষদের সংগঠিত হওয়ার পাটাতন হিসেবে ব্যবহার করতে শুর“ করেছে। যা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি, আড়িয়াল বিলে বিমানবন্দর নির্মাণের প্রতিবাদ, টিপাইমুখ বাধ বিরোধী আন্দোলন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন, বিমান বন্দরের সামনে থেকে বাউল ভাস্কর্য সরানোর বির“দ্ধে সংগ্রাম, বিশ্বায়নের মোড়কে কর্পোরেট শোষণের বির“দ্ধে প্রচারাভিযান, তহবিল গঠন, ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সহায়তা প্রদানসহ উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্যোগে বণ্ঢগারদের নিরবিচ্ছিন্ন সক্রিয় সংশিণ্ঢষ্টতা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ থেকে প্রমাণিত।

পথের কাঁটা

বাংলাদেশে বণ্ঢগিংয়ের সমস্যাগুলো আলোচনা করার আগে বহির্বিশ্বে বণ্ঢগ কী কী সমস্যা মোকাবেলা করছে উইকিপিডিয়া[৬] থেকে তার কিছু নমুনা দেখা যাক।

- মায়ানমারের জান্তা সরকার প্রধান থান সুয়ে-র একটি ব্যঙ্গ কার্টুন পোস্ট করার অপরাধে ২০০৮ সালের নভেম্বরে নে ফোন লট নামে এক বণ্ঢগারকে ২০ বছরের কারাদ— দেয়া হয়।
- ব্যক্তিগত বণ্ঢগ সাইটে মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ও একটি ইসলামিক প্রতিষ্ঠানকে অপমান করার অভিযোগে ২০০৭ সালে আবদেল করিম সোলাইমান (করিম আমির) নামে এক বণ্ঢগারকে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে চার বছরের কারাদ— প্রদান করে দেশটির আদালত।

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

- ব্যক্তিগত বণ্ঢগ সাইটে সুদানের সামরিক বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার অপরাধে ২০০৬ সালে দেশটিতে নিযুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি জেন প্রঁঙ্ক-কে তিন দিনের মধ্যে সুদান ত্যাগ করার নোটিশ দেয়া হয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বণ্ঢগারদের বির“দ্ধে মানহানি মামলা দায়ের ও শাস্তি হওয়া এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দেশটিতে মানহানি মামলায় ২০০৯ সাল পর্যন্ত বণ্ঢগারদের ১৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।
- নিজেদের বণ্ঢগে মুসলিম বিরোধী মন্ড়ব্য করার দায়ে সিঙ্গাপুরে দুজন আদিবাসী চাইনিজকে কারাদ— দেয়া হয়।

আমাদের দেশে বণ্ঢগিংয়ের জন্য এখনো এরকম অবস্থার মুখোমুখি কাউকে হতে হয়নি। কিন্তু কখনোই যে হতে হবে না দৃষ্টান্তগুলো দেখে তা আর বলার সুযোগ থাকছে না । এখনো পর্যন্ত বণ্ঢগ এখানে খুব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে না পারার কারণে এর প্রভাবের মাত্রাও কম। যত বেশি মানুষ বণ্ঢগের সাথে যুক্ত হবে তত বেশি এর ক্ষমতা বাড়বে। আর তখনই যে রাষ্ট্র মূলধারার মিডিয়ার মতো বণ্ঢগের ক্ষেত্রেও তার আসল রূপটা দেখাবে সে আশংকা করাই যায়। উপরোক্ত দেশগুলোতে বণ্ঢগ সেই অবস্থানে ইতোমধ্যে চলে যাওয়ার কারণে রাষ্ট্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে দেরি করছে না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নটা চলে আসে—লেখকের লেখার স্বাধীনতা না থাকলে মূলধারার মিডিয়ার সাথে বণ্ঢগের পার্থক্যটা আর রইলো কোথায়? আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এই পার্থক্যটা ভালোভাবেই রয়েছে। কিন্তু এ অবস্থা কতদিন থাকে এটাই দেখার বিষয়।

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বণ্ঢগের মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। আগেই বলেছি, প্রায় পনের কোটি মানুষের এ দেশে মাত্র ছয় লক্ষের মতো মানুষের ইন্টারনেট সুবিধা আছে। তাদের বেশিরভাগেরই আবার বণ্ঢগের সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে মাত্র অর্ধ লক্ষের মতো মানুষ কম-বেশি বণ্ঢগিংয়ের সাথে জড়িত। এত কম সংখ্যক মানুষ বণ্ঢগিংয়ে সম্পৃক্ত থাকার মূল কারণ হলো এখনো দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই অশিক্ষিত। তার ওপর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীটির বেশিরভাগেরই আবার কোন কম্পিউটার জ্ঞান নেই; যা বণ্ঢগিংয়ের অপরিহার্য শর্তও বটে। তাছাড়া ইন্টারনেট সুবিধা এখনো পুরোপুরি শহরকেন্দ্রিক। মোবাইল কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা সহজলভ্য হলেও তা ব্যবহার করার মতো সামর্থ্য দেশের খুব কম মানুষেরই রয়েছে। আসলে যতদিন পর্যন্ত দেশের বেশিরভাগ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করার মতো সামর্থ্যবান না হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও কারিগরীভাবে, ততদিন মূলধারার মিডিয়ার আধিপত্য বিনা বাধায় যে বলবৎ থাকবে তা বলাই যায়।

কারণ মূলধারার মিডিয়া ব্যবহারের জন্য কোন কারিগরী জ্ঞানের তো প্রয়োজন পরেই না পাশাপাশি খুব বেশি অর্থও খরচ করতে হয় না।

মূলধারার মিডিয়ার যে নতুন চরিত্রের জন্য আজ বিকল্প মিডিয়া হিসেবে বণ্ঢগের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কর্পোরেটাইজেশন। কিন্তু বণ্ঢগ যত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলোও তত বণ্ঢগের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে। বণ্ঢগের প্রকারভেদ আলোচনার সময়ই আমরা দেখেছি কর্পোরেট বণ্ঢগ নামে বণ্ঢগের একটি আলাদা ধরনই তৈরি হয়ে গেছে । উন্নত বিশ্বের বেশিরভাগ কর্পোরেট গোষ্ঠীরই নিজস্ব বণ্ঢগ সাইট রয়েছে। শুধু তাই নয় বিজ্ঞাপনের প্রলোভন দেখিয়ে এখন তারা কমিউনিটি ভিত্তিক বণ্ঢগসাইটগুলোতেও হানা দেয়া শুর করেছে। কারণ আমরা জানি পুঁজি একবার শক্তিশালী হয়ে উঠলে মুনাফার জন্য সে সব ধরনের বাধাকে গুড়িয়ে দেয়। তাই বণ্ঢগসাইটগুলোর জনপ্রিয়তা দেখে সে এগুলোকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে এটা আরো আগেই শুর হয়েছে। বাংলাদেশেও এ প্রক্রিয়া শুর হয়েছে। *প্রথম আলো বণ্ঢগ* তার একটি বড় প্রমাণ। *প্রথম আলো* পত্রিকার মূল প্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম গ্র প দৈনিক, সাপ্তাহিকী এবং রেডিও চ্যানেলের পর এবার বণ্ঢগ সাইটও চালু করেছে। বণ্ঢগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও সম্ভাবনা দেখেই যে তারা এ খাতেও নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখার জন্য এটি করেছে তা বুঝাই যায়। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। বণ্ঢগে স্বাধীনভাবে লিখতে পারার যে বৈশিষ্ট্য তা এ বণ্ঢগে একেবারেই অনুপস্থিত বলে বণ্ঢগাররা অভিযোগ করে যাচ্ছেন। নিজেদের স্বার্থবিরোধী লেখাগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু নির্বাচিত লেখাগুলোই এ বণ্ঢগসাইটে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর (গ্রামীণফোন, একটেল ইত্যাদি) বিজ্ঞাপন আজ বাংলাদেশের বণ্ঢগসাইটগুলোতে শোভা পাচ্ছে। আমরা জানি, বিজ্ঞাপনের লোভে মূলধারার মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থবিরোধী সংবাদ এড়িয়ে যায়। ফলে একটা প্রশ্ন এসেই যায়। বণ্ঢগসাইটগুলোতে যেসব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন শোভা পাচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠানবিরোধী কোন লেখা কি সেখানে প্রকাশিত হবে? বণ্ঢগসাইটগুলোতে এখনই মডারেশনের ব্যাপারে যে হারে অভিযোগ পাওয়া যায় তাতে এ প্রশ্নের উত্তর নিকট ভবিষ্যতে নাবোধক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বাংলা বণ্ঢগসাইটগুলোর আরেকটি সমস্যা এই মডারেশন। *প্রথম আলো* ও *সচলায়তন* বণ্ঢগে এই মডারেশন এতটাই যে অনেক স্বাধীনচেতা বণ্ঢগার এ বণ্ঢগসাইট দুটো ত্যাগ করেছেন। অনেকে আবার এই অভিযোগে এ দুটোকে বণ্ঢগ বলেও মানতে চান না। মডারেশনের জন্য অনেক লেখাই আলোর মুখ দেখতে পায় না। তাছাড়া বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অভিযোগে

বণ্ঢগারদের বণ্ঢগসাইটটিতে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাও নিয়মিত ঘটছে।

বাঙালি জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা প্রসঙ্গে অনেকে মানসিকতার কথা বলে থাকেন। বণ্ঢগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য বলে ধরা যায়। গুর ত্বপূর্ণ আলোচনা বাদ দিয়ে অনেক বণ্ঢগারই হালকা ও চটুল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। ফলে দেখা যায় খুব বেশি পরিচিত না হলে কেউ গুর ত্বপূর্ণ কোন পোস্ট দিলেও তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অনেকেই নিছক সময় কাটানোর জন্য বণ্ঢগে আসেন। আবার অনেকে আছেন যারা নিজেরা কোন পোস্ট না দিয়ে শুধু ছোটোখাটো কমেন্ট কিংবা পণ্ঢাস-মাইনাস দিয়ে সময় কাটান। আবার অগুর ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলার ঘটনাও বিরল নয়। এক্ষেত্রে *সামহোয়ারইন...বণ্ঢগ*-এ দীর্ঘদিন ধরে চলা কিছু বিতর্কের বিষয়ের কথা বলা যায়। বণ্ঢগ সাইটটিতে আলোচনার একটি সাধারণ বিষয় হলো ধর্ম। ধর্মকেন্দ্রিক পোস্ট এবং তা নিয়ে আস্ড়িক-নাস্ড়িকদের তর্ক-বিতর্ক এখানে নিয়মিত ঘটনা। কিছুদিন আগে বণ্ঢগ সাইটটিতে টিপাইমুখ বাধ নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে। অথচ এ বিষয়টিকে বিতর্কের উর্দ্ধে রেখে সবারই এ প্রক্রিয়ার বিরোধীতা করা উচিত ছিল। বিতর্কের বিষয়ের আরো কিছু উদাহরণ হলো: 'স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লাখ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হওয়ার কথা পুরোপুরি বানোয়াট', 'জামায়াতে ইসলামী একাত্তরে পাকিস্তানিদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় লড়েছিল', 'মুক্তিযোদ্ধারা ছিল দেশদ্রোহী', 'মুহাম্মদ জাফর ইকবালের নানা রাজাকার, তাকে কেন দাম দিতে হবে' এবং 'আমার সোনার বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত নয়' ইত্যাদি। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে ২০১০ সালে বণ্ঢগ সাইটটিতে দীর্ঘদিন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল অভিনেত্রী প্রভা ও তার বাগদত্তা রাজীবের গোপন ভিডিওচিত্র। ধারণা করা হয়, সামহোয়ারইন বণ্ঢগেই প্রথম ভিডিওচিত্র দুটির লিংক প্রকাশ পায়। (ফাইভ, প্রাগুক্ত) এ জাতীয় অনেক অগুর ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতে অনেক বণ্ঢগারেরই আগ্রহ দেখা যায়। ফলে জনগুর ত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় আসার সুযোগ খুব কমই পায়।

মুক্তি মিলবে কোন পথে?

মিডিয়া বিশেষজ্ঞ রবার্ট ডবিণ্ঢউ ম্যাকচেজনির মতে,

> প্রকৃত সাংবাদিকতা চর্চার জন্য বণ্ঢগারদের প্রয়োজন ভাল বেতন, প্রশিক্ষণ, একটি সংবাদকক্ষ ও প্রচুর সময়।... অফিস ও বাসায় সারাদিন কাজ করার পর রাত ১১টার দিকে বণ্ঢগে বসলে কারো দ্বারাই উলেণ্ঢখযোগ্য কিছু করা সম্ভব নয়। ... কেউ কোনো বিষয়ে আগ্রহী হলে সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব পড়াশুনা করে বণ্ঢগে লিখতে পারেন এবং মিডিয়া বিতর্কে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন (বর্তমান বইয়ে 'রবার্ট ডবিণ্ঢউ ম্যাকচেজনি-র সাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)।

বাংলা বণ্ঢগের বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য সমস্যা কাটিয়ে একে কার্যকর বিকল্প মিডিয়া হিসেবে গড়ে তোলার উপায় এর সমস্যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যেমন, সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বেশিরভাগ মানুষের কারিগরী দক্ষতা ও অর্থনৈতিক অক্ষমতার কথা বলেছি। এ সমস্যা কাটানোর জন্য মানুষকে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহারকে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকেই পালন করতে হবে মূল ভূমিকা। আশার কথা হলো সরকার ইতোমধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের প্রতিশ্র"তি দিয়েছে। এই প্রতিশ্র"তির বাস্ড়বায়ন কখন হবে না হবে সে বিতর্কে না গিয়ে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সরকার দেরিতে হলেও তথ্যপ্রযুক্তির গুর"ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ব্যাক্তিক পর্যায়ে ৩২% এবং ব্যবসায়িক পর্যায়ে ৬৬% মানুষের ইন্টারনেটে অভিগম্যতা তৈরি হবে। (Star, 2010)

কর্পোরেটাইজেশনের এই যুগে মূলধারার মিডিয়াকে টেক্কা দিয়ে বিকল্প মিডিয়ার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে বণ্ঢগ শক্তভাবে টিকে থাকতে পারবে কিনা তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ আগেই বলেছি কর্পোরেট মিডিয়া তা কখনোই চাইবে না। তারা যেকোনভাবে এর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আর এর ফলে বণ্ঢগ কমিউনিটিগুলোতে মডারেশনের পরিমাণও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হবে। কর্পোরেট বিরোধী কোন লেখা পোস্ট করাও হয়ে যাবে কঠিন। বর্তমানে যেহেতু খুব কম মানুষেরই ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও অনেকটা সহজ। তবে যখন বেশিরভাগ মানুষের কাছে ইন্টারনেট সুবিধা পৌছে যাবে এবং তারা বণ্ঢগ ব্যবহার করার মতো কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন হবে তখন একটা সম্ভাবনা অবশ্যই তৈরি হবে। তখন বণ্ঢগ কমিউনিটিগুলো নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও ব্যক্তিগত বণ্ঢগগুলোর ক্ষেত্রে তা এতটা সহজ হবে না। তবে সেক্ষেত্রে বণ্ঢগকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য বণ্ঢগারদের সচেতন হতে হবে। হালকা ও চটুল বিষয় বাদ দিয়ে জনগুর"ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

এছাড়া শক্তিশালী বিকল্প মিডিয়া হিসেবে বণ্ঢগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকার ও মডারেটরদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে উদার হতে হবে। কারণ বণ্ঢগের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো এখানে লেখক স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত উপস্থাপন করতে পারেন।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে বণ্ঢগের দ্বারা মূলধারার মিডিয়ার জায়গা দখল করার সম্ভাবনা এখনো অনেক দূরের পথ। এটি বরং মূলধারার মিডিয়াকে গণবান্ধব করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রেশার গ্র"প হিসেবে কাজ করতে পারে।

ম্যাকচেজনি যেমনটা বলেছেন, 'আমি বণ্ঢগস্ফেয়ার (খ"কালীন বা ভলান্টিয়ার সিটিজেন জার্নালিস্ট) বলতে বুঝি একদল মিউজিশিয়ান, যারা সাংবাদিকদের তৈরি মেলোডি উচ্চারণ করে এবং তাতে সুর তোলে। কিন্তু সাংবাদিকতা ছাড়া তা বিশৃঙ্খল হবে। বণ্ঢগিং যে বিশৃঙ্খলা নয়, বরং একটি সুন্দর সঙ্গীত তা নিশ্চিত করার জন্য সাংবাদিকতা জর"রি'। (বর্তমান বইয়ে 'রবার্ট ডবিণ্ঢউ ম্যাকচেজনি-র সাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য)

শেষ কথা

সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুর" থেকেই বিকল্প মিডিয়ার উপস্থিতি ছিল। শুর" থেকেই বড়লোক শ্রেণীর ভাবনা সর্বস্ব পত্রপত্রিকার বিকল্প হিসেবে নানা ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। তবে মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত শ্রমজীবী শ্রেণীর পত্রিকাকে বিকল্প মিডিয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসেবে বিশেণ্ঢষকরা হাজির করে থাকেন। প্রকাশনা প্রযুক্তি সস্ড়া থাকায় তখন শ্রমজীবী মানুষদের পক্ষেও পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল। এসব পত্রপত্রিকা তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়ও ছিল। পরবর্তীতে নতুন ও ব্যয়বহুল প্রযুক্তি আসার সাথে সাথে এদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে থাকে। কারণ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের ছিল না। তবে মূলধারার মিডিয়ার বিপরীতে বিকল্প মিডিয়া চর্চা কখনোই থেমে থাকেনি। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে যার সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো বণ্ঢগ।

যুগে যুগে মনীষীরা মানুষের অসম্ভব সম্ভাবনার জয়গান গেয়েছেন। অভিযোজন ক্ষমতার বলে যেকোন প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা দেখেই যে তাঁদের মধ্যে এ বোধ আসতে পারে তা বলা যায়। সেই অভিযোজন ক্ষমতার বলেই মানুষ এখন চেষ্টা করছে মিডিয়াসৃষ্ট প্রতিকূলতা কাটানোর। উদ্ভাবন করেছে বণ্ঢগ। সেন্সরশীপ এবং গোঁড়ামি না থাকায় পশ্চিমা সমাজে বণ্ঢগ খুব সহজে শক্তিশালী মিডিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। নিজস্ব বণ্ঢগসাইট ছাড়া যে সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই তা সে সমাজের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিরা বুঝে গেছেন। সহজভাবে বলতে গেলে বণ্ঢগ সমাজে স্বচ্ছতা ও প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চার জন্য জনগণের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করতে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বেশিরভাগ মানুষই কোন ঘটনার প্রকৃত স্থিরচিত্র ও সচলচিত্র দেখার জন্য এখন 'ইউটিউব' এবং 'বণ্ঢগার'-†কই বিশ্বস্ত মনে করেন। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থেকে মূলধারার মিডিয়া কোন ঘটনাকে সাদামাটাভাবে উপস্থাপন করে বলে তারা মনে করেন। পশ্চিমা সমাজের মতো আমাদের এখানে যাদের ইন্টারনেট সুবিধা আছে তাদের বেশিরভাগেরই বোধ আজ এ জায়গায় এসে পৌছে গেছে। ভবিষ্যতে যতবেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করবে ততই এই সংখ্যাটা বাড়বে তা বলাই যায়।

কিন্তু সে সময় কর্পোরেটাইজেশন ও রাষ্ট্রের চাপে বণ্ঢগের পক্ষে মূলধারার মিডিয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা তা এখনো প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু সচেতন বণ্ঢগারদের হাত ধরে মূলধারার মিডিয়ার পাশে বণ্ঢগ শক্তিশালী বিকল্প মিডিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে তা বলাই যায়। সুতরাং তর"ণ প্রজন্মসহ যতবেশি মানুষ বাংলা ভাষাভিত্তিক এ বণ্ঢগিংয়ে যুক্ত হবে, বণ্ঢগিংয়ের অদৃশ্য সম্ভবনাগুলো তত বেশিই আবি"কৃত হবে। সে আবিষ্কারের নেশাটা তৈরি হওয়ার ওপরই অনেকখানি নির্ভর করছে বাংলা বণ্ঢগের ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র

হক, ফাহমিদুল (২০১০)। 'সাইবার পরিসরে বিকল্প মাধ্যমের খোঁজে', মিডিয়াওয়াচ, খালেদ মুহিউদ্দিন সম্পাদিত, সংখ্যা ৪২।

গুরাক ও অন্যান্য (২০০৪)। 'ইন্ট্রোডাকশন: ওয়েবলগ, রেটোরিক, কমিউনিটি এ্যান্ড কালচার'। http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/introduction.html (Retrieved on 29 January 2011)

ফেরদৌস, রোবায়েত (২০০৬)। 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জনমানুষের তথ্য-অধিকার', ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে প্রকাশনা, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা

Star, The Daily (2008). Campus, 7 September 2008

হক, ফাহমদুিল (২০১১)। 'বাংলা বণ্ঢগ কমিউনিটি : মতপ্রকাশ, ভার্চুয়াল প্রতিরোধ অথবা বিচ্ছিন্ন মানুষের কমিউনিটি গড়ার ক্ষুধা', যোগাযোগ, ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন সম্পাদিত, সংখ্যা ১০।

ফাইভ, ফিউশন (২০১০)। 'ফিরে দেখা ২০১০ : বছরজুড়ে সামহোয়্যারইন বণ্ঢগে যা কিছু আলোচিত-সমালোচিত...'। http://www.somewhereinblog.net/blog/Fusion5/29298416 (Retrieved on 28 January 2011)

রাসেল (২০০৯)। 'গণমাধ্যমের ভূমিকা...' http://www.somewhereinblog.net/blog/jontronablog/28978218 (Retrieved on 28 January 2011)

শামীম, মুনীর উদ্দিন (২০০৮)। 'বাংলা বণ্ঢগ : ভাষা, সংস্কৃতি চর্চা ও এক্টিভিজমের নতুন পাটাতন', http://www.somewhereinblog.net/blog/slate/28863928 (Retrieved on 28 January 2011)

Star, The Daily (2010). 22 January 2010

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক নিও লিবারাল যুগের সম্পর্কের নেটওয়ার্ক

বাধন অধিকারী

Facebook helps you connect and share with the people in your life— ভাষ্যটা ফেসবুকের নিজেরই দেয়া। বলে নেয়াটা সঙ্গত হবে যে কিছুদিন আগে ফেসবুককে যখন আমরা বন্ধুরা গ্রহণ করেছি ভালোভাবেই সেই সময়, পার্থ প্রতীম দাস এবং বাধন আহমেদ গল্পচ্ছলে একটি নোট দেন ফেসবুকে। আর তা নিয়ে বিস্ড়র আলাপ ওঠে। সেই আলাপে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-বন্ধু সেলিম রেজা নিউটন এবং আমি পরস্পরের সাথে ভীষণ তর্কে মাতি। তর্কটা কেমন, কে ঠিক কে ভুল তার কোনো মীমাংসা নেই। সেই আলাপ আজ আর জর"রিও না। জর"রি হলো, ঐ আলাপের সময় সেলিম রেজা নিউটনের বলা একটি কথা। "ফেসবুকের সবটা বুঝে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আর সবকিছু বুঝে ফেলে তারপর ভালোলাগা-না লাগা নির্ধারণ করে না মানুষ।" বলেছিলেন তিনি, "ফেসবুক 'পুরোটা' দেখার পর সে সম্পর্কে ভালো লাগা জানাতে হলে, এ জীবনে তা আর সম্ভব হবে না। পুরোটা জানার বাসনা কোত্থেকে আসে? এর সাথে মহাতত্ত্ব-নির্মাণ-প্রবণতার সম্পর্ক আছে। জানার অহঙ্কারের অর্থ কী আসলে? সারা দুনিয়ার কোনো কিছুই বলতে গেলে আমরা পুরোটা জানি না। অথচ আমাদের ভালোলাগা খারাপলাগা থেমে থাকে না।" তার এই কথাগুলোর সাথে আমি একমত ছিলাম। কিন্তু ভালোলাগা খারাপ লাগাই শেষ কথা হয় না। নিজের পরিসরে, নিজের-নিজেদের মাঝে, সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমকে নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে চিনে নিতে হয়। সেটা মহাতত্ত্ব নির্মাণের ঝোঁক, কিংবা ফেসবুককে পুরোটা বুঝে নেবার বাসনা নয়, নিজের পরিসরে তাকে চিনতে চেষ্টা করা। এই আলাপ সেই চেষ্টারই বাস্ড়ব অনুশীলন।

সেলিম রেজা নিউটনের সাথে পরিপূর্ণ ঐকমত্য রেখে বলতে চাই, ফেসবুকের সবটা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। সেটা খুবই ঠিক কথা। যাই হোক, ফেসবুকের প্রাযুক্তিক দিক, নেটওয়ার্ক হিসেবে তার সামাজিক পরিসরও আমার আলোচ্য না। কিন্তু আমার চোখের সামনে ফেসবুকের যে আদল, আমার সাথে যাদের সম্পর্কের নেটওয়ার্ক, তাদের মাঝে এই নয়া প্রযুক্তির প্রভাব এবং নয়া প্রযুক্তিকে ঘিরে সেই মানুষগুলোর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারলে একটা নির্দিষ্ট পরিসরে ফেসবুক নামের সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমকে চিনে নেয়া

যাবে। এই লেখাটা সেই জন্যই তৈরি করতে বসা। যতটুকু যা দেখতে পাই, তার একটা ছোট্ট বর্ণনা হাজির করবার বাসনায়।

ফেসবুক যেন বাস্ড়ব জগতের খ"িত প্রদর্শনযন্ত্র

সব পাওয়া যায় ফেসবুকে। মান-অভিমান-বন্ধুত্ব-শত্র"তা-ইগো-সেক্স-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অঙ্গীকার-যন্ত্রণা-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-লটারি-জন্মদিন সব। বলে নেয়াটা খুব জর"রি যে, ব্রাত্যজনের অধিকার যেহেতু এখনও অর্জিত হয়নি নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তিতে, তাই সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যম ফেসবুকেও আমরা উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্তকে পাই। এই মাধ্যম তাই আজও একটি এলিটীয় মাধ্যম, এইটুকু বলে না নিলে অন্যায় হয়। উচ্চবিত্তের সময় নেই, টাকার পেছনে ছুটতেই তার সবটা সময় যায়। তাই ফেসবুকে তাদের খুব বেশি দেখা মেলে না, বিশেষত পুর"ষদের ক্ষেত্রে এটা বেশি সত্য, পুর"ষের সাথে পুঁজির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণেই। মধ্যবিত্ত টাকার পেছনে ছুটতে নাভিশ্বাস তুলে ফেললেও তার সময় আছে। তাই ফেসবুক মূলত আমাদের এই বাংলাদেশের বাস্ড়বতায় মধ্যবিত্তেরই যোগাযোগ মাধ্যম। আর প্রবাসীরা তো আছেই। দেশের সাথে, মাটির সাথে, মমতার সাথে তার সংযোগ ঘটাবার জন্য এই মাধ্যম এখন একটি অতুলনীয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। যাই হোক, আমার বছর খানেকের অভিজ্ঞতায় ফেসবুককে যেমনটা চিনলাম, তারই একটি বিবরণ হাজির করছি।

একাকিত্বের যন্ত্রণাময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ফেসবুকের স্ট্যাটাসগুলো খেয়াল করলেই একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়। আসলে কেউ ভালো নেই। একাকিত্ব আর অস্থিরতা, মন খারাপ আর যন্ত্রণা, বিবর্ণতা আর বিষণ্নতা যতটা পাওয়া যায় ফেসবুকের স্ট্যাটাসে ততটা পাওয়া যায় না আনন্দের খবর। খুশির খবর। যায় না কেননা ফেসবুকও এই যুগযন্ত্রণার বাইরের কিছু নয়। নিও লিবারাল বাস্ড়বতায় বাজারি লেনদেন আর বেচাকেনার যুগে আমরা কেউ যে ভালো নেই। একটুও ভালো নেই। ভালো নেই বলে ফেসবুকও ভালো নেই। এই একাকিত্ব ঘোচাতে অনেক অনেক তর"ণ তর"ণী রাতভর বসে থাকে ফেসবুকে। কী যেন খোঁজে। কী যেন খোঁজে। আসলে একাকিত্ব ঘোচানোর উপায় খোঁজে। যন্ত্রণা ভুলে থাকবার রাস্ড়া খোঁজে। কিন্তু শেষাবধি খুঁজে পায় না। পায় না বলেই পরদিনও ফেসবুকে একই সেই যন্ত্রণা আর একাকিত্বের খোঁজ পাওয়া যায়। যুগের যন্ত্রণা আর যুগের একাকিত্ব। এভাবে রাতের পর রাত কেটে যায়, নতুন সকাল আসে, কিন্তু একাকিত্ব আর যন্ত্রণা ঘোচে না।

যন্ত্রযুগে যান্ত্রিক মানুষ : মোবাইল ফোন/ল্যাপটপ/নোটপ্যাডের সাথে ফেসবুকে বসবাস

খুব কাছের বন্ধুদেরও দেখি, যেন ঐ একাকিত্ব ঘোচাতেই এই যন্ত্রযুগে মানুষও হয়ে ওঠে চলমান যন্ত্র। দেখেছি নিজেরই অভিজ্ঞতায়, যে বন্ধুটি আমার সাথে হাঁটছে, কিংবা বসে আছে সে আসলে আমার সাথে নেই। ফেসবুকে আছে, মোবাইল ফোন দিয়ে। একাকিত্ব ভোলার চেষ্টায় আছে। কিংবা অন্যকোথাও, অন্যকিছুতে। এইযুগে মানুষ ক্রমশ চলমান যন্ত্র হয়ে উঠছে। ফেসবুক এই যন্ত্রমানবের আদল স্পষ্ট করছে। সুমনের গানের সেই সময়, শিকার যেখানে বসে থাকে শিকারীর খোঁজে সেই যুগ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

সম্পর্কের নেটওয়ার্ক : কখনও সামাজিক সংগঠন কখনওবা আবার বাজারি লেনদেন আর স্বার্থের নেটওয়ার্ক

ফেসবুককে বলা যায় সম্পর্কের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক কখনও বন্ধুতার, কখনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী লোলুপতার, কখনও ঐ পুনুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ-লিপ্সারও। তবে বেশিরভাগ সময়ই সম্পর্কের নেটওয়ার্কটা বাজারের ছক মেপে চলে। যার বাসনা কবি হবার, কবিরাই তার বন্ধু, যার বাসনা নায়িকা হবার, পরিচালকরা তার বন্ধু, যার বাসনা মডেল হবার নির্মাতারা তার বন্ধু। মানুষ কেমন সেটা বিবেচনা নয়। কেউ ফটোগ্রাফি করতে চায়, কেউ সিনেমা বানাতে চায়, কেউ লেখক হতে চায় আবার মডেলও হতে চায়। কেউবা আবার বুদ্ধিজীবীও হতে চায়, কেউ আবার একসাথে অনেক কিছুই হতে চায়। কে কেমন মানুষ সেই বিবেচনার উর্ধ্বে থাকে কে কতোটা প্রতিষ্ঠিত, কে কতোটা তারকাখচিত। আর এজন্যই যারা সুন্দর জীবনের প্রত্যাশী এমন অনেককে মারজুক রাসেলের মতো মানুষের বন্ধু তালিকায় পাওয়া যায়। আনু মুহম্মদের মতো সৎ বুদ্ধিজীবীর তালিকায় পাওয়া যায় মডেল হবার প্রত্যাশা জারি রাখা কোনো মেয়েকে। কারণ যুগটা তারকার। স্টারইজমের। নায়কত্বের। মানে পুঁজির যুগ মানুষকে তারকা বানিয়ে বিক্রি করে, ফেসবুক সেই দোকানদারির একটা জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। আনু মুহাম্মদ আর মারজুক রাসেলরা একই সবিশেষ স্টার পরিচয়ে বিক্রিত হতে থাকেন!

ভাষাগত আধিপত্য : উপনিবেশিত আমি আর ইংরেজি-ঢাকাইয়া আধিপত্য

ভাষাকে ক্ষমতা হিসেবে চিনতে শিখিয়েছেন এই যুগের চিন্ড়াবিদরা। ভাষার একটা রাজনীতি আছে এটা এখন আমরা সবাই কমবেশি জানি। ফেসবুক সেই ভাষার রাজনীতির বাইরে অবস্থান করতে পারে না সঙ্গত কারণেই। ভাষার দাপুটে আধিপত্য দৃশ্যায়িত হয়। আমাদের পরিসরে তার দুই রকমের চেহারা দৃশ্যমান হয়। কেউ কেউ নিজের ইংরেজি জ্ঞান যতটা আছে তার সবটা জাহির করতে চেষ্টা করে ফেসবুকের মধ্যে। স্ট্যাটাসে, কমেন্টে ঝরে ঝরে পড়ে ইংরেজি জ্ঞান। ঝরে পড়ে উপনিবেশিক দাসত্বের ভয়ঙ্কর বাস্ড়বতার সংস্কৃতি।

আবার কখনও কখনও আধিপত্যের হাতিয়ার হয়ে হাজির হয় ঢাকাইয়া ভাষা। আমি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিপক্ষে নই বরং সেটাকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কিন্তু রাজধানী ঢাকার ভাষা যখন কেউ আওড়াতে থাকে যে কিনা ঐ ভাষায় অভ্যস্ড় নয়, তখন টের পাই আধিপত্যের কবলে পড়েছে সে। সেন্ট্রালিজমের আধিপত্যে বিকৃত হতে থাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক।

মধ্যবিত্ত বৈপরীত্য : সবকিছু মিলে মিশে একাকার!

ফেসবুক প্রদর্শন করে মধ্যবিত্তের বৈপরীত্য। আমি এই বৈপরীত্যকে আমাদের বাস্ড়ব জগতের পরিসরে মধ্যবিত্তের বৈপরীত্য হিসেবেই পাঠ করতে পারি। পাঠ করি। ধর্মীয় অবস্থান হিসেবে যিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন নাস্ড়িক্যের সেই তিনিই আবার অংশ নিচ্ছেন ভাগ্য গণনার কুইজে। আবার ঐ ধর্মীয় অবস্থান হিসেবে যিনি ইসলামের কথা বলে রেখেছেন তাকে রাজনৈতিক বিশ্বাসে আবার দেখছি মুক্তিমুখীন সমাজতন্ত্রী হিসেবে। নারীবাদী হিসেবে যার দেখা মিলছে, দেখা মিলছে নৃতত্ত্বের তরুণ গবেষক হিসেবে সেই তাকে দেখছি ফেসবুক সরবরাহকৃত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে, সৌন্দর্যের একক-একমুখী-বৈচিত্র্যহীন-পিতৃতান্ত্রিক-বর্ণবাদী নির্মাণের মাঝে নিজেকে সঁপে দিতে। যে 'এবাউট মি' অপশনে নিজের সম্পর্কে লিখে রেখেছে স্বাধীনতাই তার জীবনের চূড়ান্ড় লক্ষ্য সেই আবার রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে লিখে রেখেছে এমন কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি অঙ্গীকারের কথা যে দলটি চরম কর্তৃত্বেরই চর্চা করে। এমনি করে কবিতায় বলছেন এক কথা, স্ট্যাটাসে বলছেন আরেক কথা, মন্ড়ব্য করছেন একরকম, নিজের সম্পর্কে লিখে রেখেছেন আরেক রকম—এমন বৈপরীত্যে ফেসবুক ভরপুর। এই বৈপরীত্য এই যুগেরই বৈপরীত্য। বাজারি লেনদেন আর স্বার্থের যুগের এক স্বাভাবিক-সাধারণ প্রক্রিয়া। আমি নিজেও কি কখনওই এই বৈপরীত্যের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করিনি! এমনটাও মনে করিনা। কেননা আমিও এই যুগেরই মানুষ!

প্রদর্শনের রাজনীতি : দেখনদারির যুগে দেখনদারীর দোকানদারী

ফেসবুকের নারী এবং কামুক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক-ফটোগ্রাফার-এ্যাক্টিভিস্টরা!

কেনা-বেচার এই ঐতিহাসিক যুগপর্বে আমরা সবাই বেশ্যা। কেউ শারীরিক শ্রম বেচি, কেউ প্রবন্ধ বেচি, কেউ গান বেচি, কেউ বিক্রি করি প্রতিরোধ। কেউবা আবার গতর বিক্রি করে। বিক্রি করে শরীর। আর এই পুরুষতান্ত্রিক পুঁজির যুগ, নিতান্ড়ই বাধ্য হয়ে শরীর বিক্রি করা মেয়েদের বেশ্যা হিসেবে এককভাবে নির্মাণ করে। আড়াল করে বেশ্যা-যুগের অন্যান্য বেশ্যামো। ফেসবুকও সেই বেশ্যাবৃত্তির এবং বেশ্যাবৃত্তি আড়ালের একটা পরিসর। এখানেও হরদম দর হাকানো হয়, জারি রাখা হয় প্রদর্শনের রাজনীতি। ফটোগ্রাফার ছবি প্রদর্শন

করে, প্রাবন্ধিক প্রবন্ধ প্রদর্শন করে, কবি প্রদর্শন করে কবিতা। আর একমুখী সৌন্দর্যের যুগে 'সুন্দরী'রা প্রদর্শন করে সুন্দর সুন্দর ছবি। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধ প্রদর্শন করে বাহবা কুড়োয়, কবি কবিতা প্রদর্শন করে বাহবা কুড়োয়, 'সুন্দরী'রা ছবি প্রদর্শন করে প্রশংসা কুড়োয়। বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-মডেল হবার প্রত্যাশী-সেক্স-প্রতিরোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যে কবি নিজেকে বন্ধুত্বের আহ্বান পাঠাবার সুযোগ থেকে অন্যদের বঞ্চিত করে রেখেছে সেই কবিকেই দেখি বিভিন্ন 'সুন্দরী' নারীদের ওয়ালে গিয়ে ছবি পোস্ট করে আসছে। কেউ কেউ নোট লিখে এমনভাবে শুধুই মেয়েদের ট্যাগ করে রাখে যেন ফেসবুকের সমস্ড় ছেলেরা অক্ষর-বঞ্চিত। বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুখ্যাত-স্বল্পখ্যাত অনেককে দেখি, যার সঙ্গে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না, সেই বুদ্ধিজীবীই হিন্দি সিনেমার গল্প করে যায় নিরন্ড়র, কোনো 'সুন্দরী' মেয়েকে পেলে। বিপরীতে স্টার-সুখ্যাত-স্পল্পখ্যাত পুর"ষদের প্রতি মেয়েদের একইরকম পুর"ষতান্ত্রিক আগ্রহও পাওয়া যায়। অনেক তারকাখচিত বুদ্ধিজীবী-বিবৃতিজীবী কিংবা বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-লেখক হয়ে উঠবার প্রচেষ্টারত পুর"ষ তাদের ইন্টারেস্ট হিসেবে শুধুই মেয়েদের কথা জানান দিয়ে রেখেছে প্রোফাইল ইনফরমেশনে। যেন নারী জীবনের রহস্য উন্মোচন করলেই গোটা দুনিয়াটাকে জানা যাবে। পুর"ষের কোনো রহস্য নেই। তাকে বুঝবারও প্রয়োজন নেই। ফেসবুককে তাই আমাদের সমাজের মতোই পিতৃতান্ত্রিক-পুঁজিপ্রেষিত দেখনদারির, দোকানদারীর একটা পরিসর হিসেবে চিনে নিতে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

ঐ সুদূর প্রবাস থেকে ভেসে আসে দেশ-বিষাদের ছন্দ

এতক্ষণ যা যা বললাম, ফেসবুক শুধু তাই নয়। আরও অনেক কিছু। কে যেন সুদূর কানাডায় বসে বিষাদ সৌন্দর্য্যের কাব্য রচে যায় আর ভোরবেলায় তার পুনঃ পুনঃ পাঠপর্ব শেষ করে সুন্দরে আবগাহন করি। ফেসবুকের মেসেজ হয়ে ভেসে আসে প্রতিরোধের খবর। প্রবাসে থাকা প্রতিরোধীরা শুনিয়ে যান আমাদের অর্জনের গল্প, তাদের প্রচেষ্টার গল্প। দেশে এশিয়া এনার্জির অন্যায্যতার বির"দ্ধে প্রতিরোধ জারি রেখে কীভাবে তারা বৃটিশ পার্লামেন্ট-বৃটিশ আইনজীবীদের মাধ্যমে এটাকে একটা আন্ড়র্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করতে সক্ষম হলেন সেই গল্প। আর কে যেন মেসেজে মেসেজে ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে দিয়ে সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা পাঠায়। রেমিট্যান্স বাড়ায় আর চায়, ভালো থাক দেশ (এই দেশ মানে কিন্তু রাষ্ট্র নয়, এই দেশ মানে মাটি আর মানুষ), ভালো থাক মা-মাটি-মমতা।

মুক্ত-সৃজনের মুক্ত পরিসর

কবিতা বলি, গান বলি, ছবি বলি, ফটোগ্রাফি বলি যেকোনো সৃষ্টিকর্মের কথাই বলি না কেন, ফেসবুক হলো সৃজনের এক মুক্ত পরিসর। কোনো মডারেশন নেই, সম্পাদনার কর্তৃত্ব নেই, বাজারের হিসেব নেই, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব সৃজনকর্মকে উপস্থাপন করতে পারেন অনায়াসে। তাই একদিকে ফেসবুককে যখন প্রদর্শনীর পরিসর বলেছি, তখন এটা না বলাটা খুব অন্যায্য হবে যে, একইসাথে ফেসবুক মুক্ত সৃজনের এমন এক পরিসর যেখানে আমরা সবাই রাজা। যা খুশি তাই লেখা যায়, যা খুশি তাই আঁকা যায়, যেমন ছবি খুশি তেমন ছবিই তোলা যায়, যেমন গান খুশি তেমন গান গেয়ে আপলোড করা যায়, ফেসবুক যেন আমাদের কর্তৃত্বশীল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের বির"দ্ধে এক চলমান জেহাদ। আর তাই কোথাও কোথাও ভেঙে যায় সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পের প্রবাহমান ডিসকোর্স। নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ফেসবুক বেয়ে কবিতার নাম করে, প্রকৃতির অপরূপ রহস্য টের পাইয়ে দেয় কার যেন তোলা ছবি, কে যেন এঁকে চলে রঙে-বেরঙে বিবর্ণ সময়... আধিপত্যশীল অক্ষর সভ্যতার মাঝে অক্ষর-মোকাবিলা হয় অক্ষরে অক্ষরে...

বন্ধুতা বৈরিতা ঐক্য আর ভেদ

বন্ধুতা বৈরিতা ঐক্য বিভেদ নিয়েই ফেসবুকে আছে অনেক অনেক মানুষ। বাহাস চালিয়ে যাবার এক অনন্য মাধ্যম এই ফেসবুক। চ্যাট করে কিংবা মেসেজে কিংবা কমেন্টে বাহাসের সংস্কৃতি সত্যিই গণতান্ত্রিকতার বোধকে শাণিত করে। (যদিও এই বাহাসে অনেকেই রাজি না এখনও, তবু এই বোধ শাণিত হচ্ছে বলেই মনে হয়।) স্পষ্ট হতে থাকে ঐক্য আর বিভেদের চিহ্নগুলো। আর এরই মাঝ দিয়ে বন্ধুতা তৈরি হয়, বৈরিতা তৈরি হয়। কতোটুকু মিললে ঠিক কতোটা বন্ধু হওয়া যায় তা বিবেচনার জন্য অনেক অনেক রাস্ড়া খোলা রেখেছে এই ফেসবুক। প্রোফাইলে দেয়া ইনফরমেশন, স্ট্যাটাসে বলা নিজের অনুভূতি, আর নিত্যদিনের ফেসবুক তৎপরতাই নির্ধারণ করে দেয় কার সাথে তার কতোটুকু কী লেনদেন হবে। আর তাই ফেসবুক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবে নিজের বিশিষ্টতা জারি রাখতে পারে। এখানে ঐক্য ঘটে প্রতিরোধীদের, কখনও নিছক গল্পকারীদের কখনও কবি-সাহিত্যিকদের, কখনও কামুক পুর"ষ-নারীদের। যার যার পরিসরে যার যার কাজ সে সে করে যায় তার তার মতো। এই যা খুশি করবার গণতান্ত্রিক অধিকার ভার্চুয়াল জগতকে ছাপিয়ে আমাদের চেনা-জানা বাস্ড়বেও অনুশীলনের সম্ভাবনা তৈরি হয়, সম্ভাবনা তৈরি হয় ঐ ভার্চুয়াল জগতের ফেসবুকেই।

প্রতিরোধের মুক্ত জমিন : বিশ্বায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভাবনা

তাই যে ফেসবুক বাজারের যুগের টুলস সেই ফেসবুকই আবার প্রতিরোধের মুক্ত জমিন। শুর"তেই বলে নিয়েছি যে কেবল মধ্যবিত্ত পরিসরে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ, তবুও প্রতিরোধ তৈরিতে এই ফেসবুক-এর মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোই উন্মোচন করেছে প্রতিরোধের নতুন দিগ"ড়। বিশ্বব্যাপী মুক্তিকামী প্রতিরোধ আন্দোলনের স্বাধীন কর্মীরা এই ফেসবুক ব্যবহার করে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে সত্যিকারের বিশ্বায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভাবনা। কজ-ইভেন্ট-গ্র"প-পিটিশন ব্যবহার করে দুনিয়াব্যাপী মানবধিকার হরণ, অন্যায্য বাণিজ্য চুক্তি, যুদ্ধবাজ অর্থনীতি, অমানবিকতা, অসাম্য, অন্যায্যতার বির"দ্ধে প্রতিরোধ জারি রেখেছে দুনিয়ার অনেক অনেক মুক্তিকামী মানুষ। ফেসবুক হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের এক অনন্য হাতিয়ার। সেই যে উনিশ শতকে মার্কস দুনিয়ার সমস্ড় মজদুরের এক হবার স্বপ্ন হাজির করেছিলেন কমিউনিস্ট ইশতেহারে, আজ ভিন্ন পরিসরে সেই বাসনা পূরণ হতে চলেছে দুনিয়ার সমস্ড় প্রতিরোধকামী মানুষের ঐক্যের সম্ভাবনার মাঝ দিয়ে। প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মী, বন্ধুজন, প্রিয়ভাজন নোম চমস্কির মাধ্যমে জেনেছিলাম, ১৮ শতকে শ্রমিকদের প্রেসকে ধ্বংস করা হয়েছিল ছাপা আর কাগজের দাম বাড়িয়ে। ইন্টারনেট সেই জায়গায় বয়ে নিয়ে এসেছে অভূতপূর্ব প্রাযুক্তিক কল্যাণ। হুম, প্রাযুক্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই একে বড়লোকের মাধ্যম করে রাখা যাচ্ছে না। গড়ে উঠছে সামজিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক, গড়ে উঠছে বিজ্ঞাপন আর বাণিজ্যের স্বার্থে, কিন্তু প্রতিরোধকামী মানুষ তাকে ব্যবহার করছে অন্য কাজে। প্রতিরোধের কাজে। বন্ধুতার কাজে। লেনদেনের বাইরে অন্য হিসেবের কাজে। দুনিয়াকে সুন্দর করবার কাজে। এখানেই আমাদের আশা। এখানেই আমাদের ভরসা। আর একেবারে সমাজের নিচুতলায় এই সামাজিক যোগযোগের মাধ্যমকে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকারও এখানেই। যেখান থেকে উত্থিত হয় মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন।

এই ফেসবুকে, কে জানি খুব নিভৃতে রাতভর আঁকতে থাকে ভালোবাসার রংধনু। কেউ খুব লুকিয়ে দেখতে থাকে কেমন আছে প্রিয়তম মানুষটি যার সাথে আর সংযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। কেউ খুব যত্নে দেখতে থাকে নীরবে, কেমন আছে বাস্ড়ব জগতের বন্ধুটি, অভিমানে যার সাথে অনেক দিন যোগাযোগ নেই, কিন্তু ভার্চুয়াল পরিসরে যোগাযোগটা ঠিকই আছে। কেউ খুব হঠাৎ প্রচ" কষ্টভারাক্রান্ড় হয়ে একটি গান লিখে দেয় স্ট্যাটাসের ঘরে। কেউ লিখে দেয় প্রতিরোধের নোট। প্রতিরোধের স্ট্যাটাস। না মানার দৃপ্ত প্রত্যয়। ভালোবাসা আর প্রতিরোধ বাসনা নিয়ে এরা সবাই আধুনিক যুগের যন্ত্রণাসম্পন্ন মানুষ। বিশ্বায়নের যুগে এই ফেসবুক-এর মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম দিয়ে

যারা প্রতিশ্র"তি আর স্বপ্ন চালাচালি করে যাচ্ছে, বেদনা আর হাহাকার চালাচালি করে যাচ্ছে। এইসব মিলে, নিজেদের পরিসরে আমরা যদি চিনে নিতে পারি ফেসবুককে, ভার্চুয়াল বাস্ড়বতাকে উপেক্ষা করে, যন্ত্রমানব না হয়ে, ফেসবুক-পুর"ষ/ফেসবুক-নারী না হয়ে, মানে আমরা যদি সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমটির শিকারে পরিণত না হয়ে তাকে ব্যবহার করতে পারি যার যার জায়গা থেকে বুঝে নিয়ে, তাহলে বিশ্বায়িত পৃথিবীর স্বপ্ন-সম্ভাবনা সত্যিই এগিয়ে যাবে ফেসবুকের হাত ধরে। ফেসবুকের মতো অন্যান্য সামাজিক যোগযোগের মাধ্যমের হাত ধরে। সেখানেই আমাদের আশা।

শেষের পরে: নজরদারি, বিজ্ঞাপন, বিপণন, গোয়েন্দা তৎপরতা ইত্যকার প্রসঙ্গ

ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমাগত, বেড়েছে মাইস্পেস ও টুইটার ব্যবহারকারীর সংখ্যাও। বেনিয়ারা নাচছে, লাফাচ্ছে আনন্দে। অনলাইন শিল্প সবসময় নতুন প্রবণতা খোঁজে; তারা চটজলদি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মস্থ করে নিয়েছে। ইউটিউবের মতো সাইটও ব্যক্তিগত জীবনকথা (পারসোনাল প্রোফাইলিং) যোগ করেছে। এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের সাইটগুলো মানুষে-মানুষে ঐক্যের সুপ্ত বাসনা অথবা বন্ধুসুলভ দেখা-সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আর তারই বিপরীতে একটু একটু করে বাড়ে নজরদারি। এই নজরদারি মানুষের প্রতিরোধ বাসনা দমনের জন্য কখনও গোয়েন্দা নজরদারি, আবার কখনও বহুজাতিক বেনিয়াদের পণ্য বিকোবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্ড়বায়নের জন্য নজরদারি।

সুইডেনের কার্লস্টাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যম ও যোগাযোগ অধ্যয়নের শিক্ষক ড. মিয়াস ক্রিস্টেনসেন তথ্য দিচ্ছেন (৩ ডিসেম্বর ২০০৯ 'পরের হাতে কলকাঠি' শিরোনামে দৈনিক *প্রথম আলোয়* তাঁর লেখাটির ভাষাস্ড়র ছাপা হয়, সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি) : ফেসবুকে বাণিজ্যিক নজরদারির প্রকৃত ব্যাপ্তি এখনো ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। গোপনীয়তাবিধি অনুযায়ী, সদস্যদের সম্পর্কিত তথ্য সংবাদপত্র, তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরণ সেবাদাতা ও বণ্ঢগের মতো উৎস থেকে সংগ্রহ করার অধিকার ফেসবুকের আছে। ফেসবুক ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি সম্মতি জানান যে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো অথবা প্রক্রিয়াজাত করা যাবে। কখন, কীভাবে এসব উপাত্ত ব্যবহার করা হবে তা ব্যবহারকারীকে অবহিত করা হয় না। কানাডিয়ান ইন্টারনেট পলিসি অ্যান্ড পাবলিক ইন্টারেস্ট ক্লিনিক ২০০৮ সালে ফেসবুকের বির"দ্ধে কানাডার গোপনীয়তা আইন ২২ বার লঙ্ঘনের অভিযোগ করে। কানাডায় ফেসবুক ব্যবহারকারীদের অনেকের বয়স ১৪ থেকে ২৫ বছর। এ গোষ্ঠী তাদের নাজুকতার বিষয়টিও উত্থাপন করে। অধিকাংশ ব্যবহারকারী ফেসবুকের ডিফল্ট সেটিং মেনে নেয়, গোপনীয়তা ও উপাত্ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এগুলো কী অর্থ

বহন করে তা বিবেচনা না করেই। যেহেতু সম্মতির ভিত্তিতে ফেসবুকে ব্যবহারকারীর উপাত্ত অন্যের সঙ্গে ভাগ করা হয়, ফলে এমন উদ্বেগের ন্যায্যতা ফেসবুক অস্বীকার করে। কিন্তু কেউ যদি কঠোরতম প্রাইভেসি সেটিংও বেছে নেয়, তারপরও তার উপাত্ত ব্যাপক হারে অন্যের সঙ্গে ভাগ হওয়ার সুযোগ থেকেই যায়, যদি তার বন্ধুদের প্রাইভেসি সেটিংস নমনীয় হয়। এক জরিপ থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ শতাংশ চাকরিদাতা সম্ভাব্য চাকুরেদের জীবনকথা জানতে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের শরণাপন্ন হওয়ার কথা স্বীকার করেন। প্রকৃত সংখ্যা হয়তো আরো বেশি।

ইলেক্ট্রনিক প্রাইভেসি ইনফরমেশন সেন্টার (ইপিআইসি) এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশনে ফেসবুকের হালনাগাদ লাইসেন্সের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করার ঘোষণা দিয়েছিল। বণ্টগার ও ভোক্তা অধিকার গোষ্ঠীর সঙ্গে ৪০ হাজারের বেশি ফেসবুক ব্যবহারকারী মিলে ব্যবহারবিধিতে একটি পরিবর্তনের প্রতিবাদ জানায়! কিন্তু এই নজরদারির বির"দ্ধে প্রতিবাদেরও খবর দিয়েছেন ঐ ড. মিয়াস ক্রিস্টেনসেন।

তাই ফেসবুকের মধ্যে এই শক্তি আছে যা আমাদের অগণতান্ত্রিকতার বির"দ্ধে প্রতিরোধ জারি করবার উপায় থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। প্রতিরোধের পরিসরই তৈরি করেছে সে। যদি আমরা তা চাই। যার যার চাওয়াগুলো নিয়ে, তর্ক-বিতর্ক আর ঐক্য বিভেদের সূত্র গুলো নিয়ে মানুষ এগিয়ে যাবে ফেসবুককে সাথে নিয়েই। তাকে এড়িয়ে নয়, যতদিন অন্য কোনো আরও নিবিড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি হয়ে যায়। কেননা সমাজ গড়বার বাসনা মানুষের চির"ড়ন বাসনাই বটে! হোক না সেটা ভার্চুয়ালি!

রবার্ট ডবিণ্ডউ ম্যাকচেজনি'র সাক্ষাৎকার

মিডিয়া পুঁজিবাদ, রাষ্ট্র এবং একবিংশ শতকের মিডিয়া গণতন্ত্রের লড়াই

ভাষান্ড়র : সুদীপ্ত শর্মা ও এনায়েতুর রহমান

[প্রাক-বয়ান: মিডিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করছেন এমন মানুষদের কাছে একটি পরিচিত নাম রবার্ট ডবিণ্ডউ ম্যাকচেজনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েস অ্যাট আরবানা-ক্যাম্পেইন—এর এই অধ্যাপক মিডিয়া ও রাজনীতি নিয়ে লেখালেখি করেন নিয়মিত। এ বিষয়ে অনেক বই ছাড়াও তাঁর একাডেমিক ও ননএকাডেমিক প্রচুর প্রকাশনা রয়েছে। বাজারের যুগের সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে মিডিয়াকে তার গণমুখী নীতিতে ফিরিয়ে আনতে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। *মান্থলি রিভিউ* পত্রিকার সাবেক এই সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত মিডিয়া ও রাজনীতি বিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজে গণমাধ্যম কী ভূমিকা পালন করে তা খতিয়ে দেখাই তাঁর কাজের মূল জায়গা। প্রতিষ্ঠা করেছেন মিডিয়া সংস্কার বিষয়ক সংগঠন *ফ্রি প্রেস*। ম্যাকচেজনির এই সাক্ষাৎকারটি *রিলে* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির কালচারাল এডিটর ট্যানার মিরলিস সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। এখানে কর্পোরেট মিডিয়ার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা ছাড়াও এ থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক গুর"ত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটিতে মূলত মার্কিন মিডিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে কর্পোরেট মিডিয়ার মূলগত বৈশিষ্ট্য যেহেতু সব জায়গায়ই এক, তাই কথাগুলো বাংলাদেশি মিডিয়ার জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। মূল সাক্ষাৎকারটি পড়া যাবে http://www.zmag.org/znet/viewArticle/22273 এই ঠিকানায়।]

মিডিয়া, বামপন্থা এবং ক্ষমতা

মিরলিস : মিডিয়াকে চেনা এবং মিডিয়া গণতন্ত্রের লড়াইয়ে যোগ দেয়া প্রগতিশীলদের জন্য কেন জর"রি বলে আপনি মনে করেন?

ম্যাকচেজনি : মিডিয়া সমাজের এমন গুর"ত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে ক্ষমতা চর্চার পাশাপাশি এর মাধ্যমে ক্ষমতা বাড়ানো এবং ক্ষমতা নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এমন কোন সফল বাম রাজনৈতিক কর্মসূচি খুঁজে পাওয়া কঠিন যার কোন মিডিয়া পণ্ডাটফর্ম নেই। প্রথম দিকে বামপন্থীদের কাছে মিডিয়া রাজনৈতিকভাবে কোন গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। ঊনবিংশ শতকে একটি ভিন্ন ধরনের মিডিয়া ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। সে সময়কার সমাজতন্ত্রীরা 'নিউ ইয়র্ক

হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকাটির সমালোচনা করার খুব বেশি তাগিদ অনুভব করতো না। কারণ তারা এর পাঠকদের সংগঠিত করার কাজ করছিল না। বামপন্থীদের নিজস্ব মিডিয়া থাকা তখন খুবই সহজ ও সাধারণ বিষয় ছিল। শ্রমিকদেরও ছিল নিজস্ব পত্রিকা। তারা বাণিজ্যিক মিডিয়ার ব্যাপক উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা ছিল না। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুর" করে। পুঁজির পুঞ্জীভবন জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও যোগাযোগকে কম বেশি দখল করে নেয়। সমাজে তথ্য উৎপাদন ও প্রচারের ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। তারপর থেকে মিডিয়া রাজনীতির পাশাপাশি রাজনীতিমনস্ক ও রাজনীতিবিদ হতে আগ্রহী মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো বিদ্যমান মিডিয়াকে চেনা, ব্যবহার করা এবং পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করা।

মিরলিস : রাজনৈতিক লড়াইয়ে কর্পোরেট মিডিয়া গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলধারার মিডিয়ার ক্ষমতা বলয়ের বাইরে এখনো বামপন্থীদের নিজস্ব মিডিয়া নেটওয়ার্ক রয়েছে। তবে আমি উদ্বিগ্ন যে বামপন্থী এসব মিডিয়া মূলত সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের সাথে জড়িত কিংবা এর সাথে ঐতিহাসিক বোঝাপড়া আছে এমন লোকরাই পড়ে। আমরা কীভাবে নিজস্ব বামপন্থী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার পরিবর্তে বৃহত্তর মিডিয়া লড়াইয়ে যুক্ত হতে পারি?

ম্যাকচেজনি : আমার অভিজ্ঞতা এবং যারা মিডিয়া নিয়ে চিন্ড়াভাবনা করেন তাদের অভিজ্ঞতায় আমরা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বই লিখেছি, যেখানে কর্পোরেট মিডিয়ার বহু সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সেখানে মিডিয়ার সমালোচনা করেছি। অনেক বক্তব্যও দিয়েছি। এমন এক পর্যায়ে আমরা এসেছিলাম যেখানে অডিয়েন্সদের প্রশ্ন ছিল : "এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?" "মিডিয়ার এ সমস্যা নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?" গঁৎবাধা বামপন্থী একটা উত্তর সে সময় আমাদের হাতের কাছেই ছিল : "আমরা জানি মিডিয়া আলাদা কিছু নয়; বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে এটি একটি অপরিহার্য উপাদান। আমরা যখন বিপণ্ডব ঘটাব বা বিপণ্ডব যখনই ঘটবে তখনই মিডিয়ার এ সমস্যার সমাধান হবে।" এটা একটা সরল উত্তর। অবশ্য বামপন্থীদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই এভাবে সরলীকরণ করত। অনেকেই বুঝতে পেরেছিল মিডিয়ার সাথে যুদ্ধ কর্মক্ষেত্রে যুদ্ধের মতো, যার মাধ্যমে ক্ষমতার সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া যায়। সবচেয়ে জর"রি কাজ হলো মিডিয়া সম্পর্কে মানুষকে দ্র"ত সচেতন করে তোলা এবং স্বল্পতম সময়ে পরিবর্তনের লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। বিপণ্ডব কখন হবে তার জন্য বসে থাকা যাবে না। মিডিয়ার যুগান্ড়কারী কোনো পরিবর্তন ছাড়া বিপণ্ডব ঘটানো যে খুবই কঠিন কাজ হবে তা আমরা বুঝতে পেরেছি। মিডিয়া একক্ভাবে বিশ্বের সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ কোন বিষয় না হলেও এটি মূল

বিষয়গুলোর একটি। যেকোনো সফল বামপন্থী তৎপরতার কৌশলগত কর্মসূচিতে তাই মিডিয়াকে যুক্ত করা প্রয়োজন।

নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতা এবং পাবলিক ইন্টারনেটের জন্য লড়াই

মিরলিস : যুক্তরাষ্ট্রে মিডিয়া গণতন্ত্র লড়াইয়ের অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে উলেণ্টখযোগ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলো কী?

ম্যাকচেজনি : তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে মিডিয়া গণতন্ত্রের অ্যাক্টিভিজম পরিচালিত হচ্ছে। যার প্রথমটি ইন্টারনেট। এই ইন্টারনেটকে টেলিফোন ও ক্যাবল কোম্পানিগুলোর হাত থেকে রক্ষা করাই নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতা লড়াইয়ের লক্ষ্য। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে ইন্টারনেটের নিয়ন্ত্রণ এসব কোম্পানির হাতে চলে গেলে কিছু তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে তারা অন্যদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে। আমরা ইন্টারনেটকে উন্মুক্ত রাখতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র ও প্রত্যেক সমাজের জন্য আমরা এমন ইন্টারনেট চাই যা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বরং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য। আমরা এমন ইন্টারনেট চাই যেখানে পাসওয়ার্ডের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং যা বিনা খরচেই ব্যবহার করা যাবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করা আপনার অধিকার। পাবলিক ইন্টারনেটের উপকারিতা অপরিমেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান মারাত্মক ডিজিটাল ডিভাইড সমস্যা এর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হবে।

মিরলিস : নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি?

ম্যাকচেজনি : যে টেলিফোন ও ক্যাবল কোম্পানিগুলোকে রাষ্ট্র মনোপলি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিয়েছে সেসব কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব। রাজনীতিবিদদের কিনে নেয়া ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে এ কোম্পানিগুলোর হাত খুবই পাকা। অন্য কোম্পনিগুলোর সাথে এটিই তাদের "তুলনামূলক সুবিধা"। অথচ তাদের যে প্রকৃত ব্যবসা-টেলিযোগাযোগ সেবাদান, সেখানে তারা একেবারেই আনাড়ি। ইন্টারনেটের জগতে টেলিফোন ও ক্যাবল কোম্পানিগুলো পরজীবী ও নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তারা ইতিবাচক কোন কাজই করে না। এসব কোম্পানি যতটা দক্ষতার সঙ্গে ইন্টারনেটকে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে জনগণ থেকে ডাকাতের মতো অর্থ হাতিয়ে নিতে পারে তার ওপরই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মোবাইল কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দেশের সবচেয়ে ঘৃণিত পাঁচটি ইন্ডাস্ট্রির তালিকায় ব্যাংক ও অন্যান্য লুণ্ঠনকারী ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে এ প্রতিষ্ঠানগুলোও রয়েছে। ব্যাংক ও লুণ্ঠনকারী ঋণদাতাদের মতো তারা কতটা সফলভাবে রাজনীতিবিদদের কিনতে পারে তার ওপরই তাদের ক্ষমতা নির্ভর করে। টেলিফোন ও ক্যাবল প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থের বির"দ্ধে আমরা ইন্টারনেটকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য লড়াই করছি। তাই এটা খুব কঠিন লড়াই, কিন্তু খুব জর"রি।

মিরলিস : যুক্তরাষ্ট্রে নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতার এই লড়াইয়ে জনগণ কি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে? আমেরিকান নিওলিবারেল আদর্শ জনসম্পদগুলোকে 'বৃহৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ'-এর দৃষ্টিতে দেখে, যা 'মুক্ত' বাজারের জন্য হুমকিস্বরূপ । তারা বিশ্বাস করে মিডিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে মার্কিন সরকারের একটি সহজাত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু আপনার লেখায় নিওলিবারেল আদর্শের একটি বড় বৈপরীত্যের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যেসব বৃহৎ টেলিফোন ও ক্যাবল কোম্পানি মুক্তবাজারের ধোয়া তুলে ডিজিটাল যোগাযোগকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণের কথা বলছে তারা কীভাবে মার্কিন সরকারের নীতি ও নীতিমালার ওপর নিজেদের নির্ভরশীলতা ঢাকছে তা আপনি দেখিয়েছেন । মার্কিন সরকার কর্পোরেট মিডিয়া সিস্টেমকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কী পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ও বৈধতা যে দিয়ে আসছে সে ব্যাপারে মার্কিনীরা কি সচেতন?

ম্যাকচেজনি : তারা নিশ্চিতভাবেই সচেতন হবে যদি আমি যা লিখেছি তা পড়তে তাদেরকে বাধ্য করানো হয়। সৌভাগ্যবশত, মুক্ত সমাজ এবং দুর্ভাগ্যবশত, আমার বই বিক্রির পরিমাণ—এই দুই কারণে বেশিরভাগ লোকই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন না। স্পষ্টত, ফোন ও ক্যাবল কোম্পানিগুলো শেষ যে কাজটি করতে যাচ্ছে তাহলো নিজেদেরকে রাষ্ট্রসৃষ্ট মনোপলি এবং তাদের সমগ্র ব্যবসায়িক মডেল যে রাজনীতিবিদদের আত্তীকরণের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে তা প্রচার করা । তারা এমন একটি মিথ প্রচার করতে চায় যে তারা মুক্ত-বাজার প্রতিযোগিতায় বিজয়ের মুকুট পেয়ে গেছে। এ মিথটা ভেঙে দেয়া আমাদের জন্য জর"রি। সরকারি ভর্তুকি গ্রহণকারী রাষ্ট্র-নির্মিত এসব কর্পোরেট মনোপলির পিছনে জনগণের যে কী পরিমাণ মূল্য দিতে হচ্ছে তাও আমাদেরকে জানাতে হবে।

যাই হোক, নেট নিরপেক্ষতার লড়াইয়ে আমদের অনেক সাফল্য আছে। আমি আশা করি আগামী ১২ মাসের মধ্যে মার্কিন কংগ্রেস একটি আনুষ্ঠানিক আইন পাশ করবে, যাতে প্রেসিডেন্ট ওবামা স্বাক্ষর করবেন এবং যা ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন (এফসিসি)-এর সমর্থন পাবে। নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতা এ দেশে নতুন আইনে পরিণত হওয়ার পথে ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

মিরলিস : নেট নিরপেক্ষতা আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল পুঁজিবাদের আধিপত্যশীল কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থকে সহযোগিতা করার কোন ঝুঁকি রয়েছে কি? নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতা লড়াইয়ের মাধ্যমে টেলিফোন ও ক্যাবল কোম্পানির মতো পুরনো মিডিয়ার সঙ্গে গুগল, ই-বে, আমাজন ও মাইক্রোসফট-এর মতো নতুন মিডিয়ার স্বার্থগত দ্বন্দ্বও কি ফুটে ওঠছে?

ম্যাকচেজনি : অবশ্যই। আমাদের এ জয়ের পিছনে একটি কারণ হলো বেশিরভাগ নতুন ডিজিটাল ক্যাপিটাল কম্যুনিটি টেলিফোন ও ক্যাবল মনোপলি সমর্থন করে না। আমরা কিছু মিডিয়া কোম্পানির সাথে সখ্যতা গড়ার পাশাপাশি কিছু বিষয়ে তাদের সাথে চরম শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছি। বাম ঘরাণার অনেক লোকের দৃষ্টিতে এ স্বল্পমেয়াদী জোট গড়ে আমরা বড় ধরনের অপরাধ করেছি।

কিন্তু এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নির্দিষ্ট কিছু মিডিয়া লড়াইয়ে জড়িত থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে যুদ্ধ জয়ের জন্য সময় কম থাকলে মাঝে মাঝে কিছু কৌশলগত জোট গড়ে তোলা হয়। আপনি আপনার নীতিকে বিসর্জন দেন না এবং অন্য কারো অচল রাজনৈতিক এজেন্ডাকেও গ্রহণ করেন না। জনগণের আস্থা অর্জন এবং যুগোপযোগী ও প্রভাববিস্তারি মিডিয়া এজেন্ডাকে সামনে এগিয়ে নিতে চাইলে আপনি তা করেন। এটাই রাজনীতির নিয়ম। আজকের বেশিরভাগ প্রগতিশীল লোকই এটা বুঝেন। কিন্তু তারপরও এমন লোক আছেন যারা সবসময় বলেন : "এখানে সাতশ বিষয়ের একটা চেকলিস্ট আছে, যাতে আজকের বামপন্থীদের আদর্শিক ভিত্তি প্রতিফলিত হয় বলে আমরা মনে করি। এবং আমরা যাদের সাথে কাজ করি তাদের প্রত্যেককে হয় এই সাতশ বিষয়ের সবগুলোকেই মেনে নিতে হবে অন্যথায় শত্রু বলে পরিগণিত হতে হবে।" রাজনীতির এই পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি এখন অচল হয়ে যাচ্ছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে আপনি কখনোই কোনো লড়াইয়ে জয়ী হতে পারবেন না। এজন্য বলতে হচ্ছে, আমাদেরকে এখনো অনেক দূর যেতে হবে। এই মুহূর্তে নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষতার যুদ্ধ টেলিফোন ও ক্যাবল কোম্পানিগুলোকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার জন্য নয়। আমরা এখনো সে জায়গায় পৌঁছিনি। কিন্তু ফোন ও ক্যাবল কোম্পানিগুলোকে মিডিয়া পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্ত করে তাদের নিয়ন্ত্রণ দূর করাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সংবাদ সংকট এবং সাংবাদিকতার ভবিষ্যতের জন্য লড়াই

মিরলিস : "দ্য ডেথ অ্যান্ড লাইফ অব গ্রেট আমেরিকান নিউজপেপারস" শীর্ষক আপনার ও জন নিকোলস-এর একটি লেখা সম্প্রতি দি নেশন পত্রিকায় (৬ এপ্রিল, ২০০৯ সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আপনারা মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাঙন সবিস্তারে বর্ণনা করার পাশাপশি বর্তমান সাংবাদিকতা কীভাবে সংকটে আছে তা তুলে ধরেছেন। সংবাদপত্রের কার্যক্রম বন্ধ ও সীমিত হওয়া—সাংবাদিকতার এই সংকটের সাথে কি নতুন মিডিয়া প্রযুক্তি এবং আধিপত্যশীল তথ্যউৎস হিসেবে ইন্টারনেটের উত্থানের কোনো সম্পর্ক আছে? মূলধারার সংবাদপত্রের সংকট এবং অনলাইনে বিকল্প তথ্য উৎসের উত্থানের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে?

ম্যাকচেজনি : সংবাদ সাংবাদিকতার অবস্থান নড়বড়ে করার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু এটিই একমাত্র নয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর; তবে এটিও একমাত্র নয়। কিন্তু ইন্টারনেট ও অর্থনৈতিক মন্দা সাংবাদিকতার এই সংকটকে ঘনীভূত করতে সহায়তা করেছে। এ সংকটের ঐতিহাসিক মূল আরো গভীরে প্রোথিত। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আবিষ্কৃত হওয়ার কয়েক দশক পূর্বে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বর্তমান অবস্থায় আসার অনেক আগেই সাংবাদিকতা সমস্যার মুখে পড়ে। বিজ্ঞাপনলব্ধ আয় কমে যাওয়ার আগে এই সংকট শুরু হয়েছে। সাংবাদিকতায় কর্পোরেট রাজত্ব ও মনোপলি নিয়ন্ত্রণই হলো মূল সমস্যা। যা ষাটের দশকের শেষদিকে শুরু হয়ে সত্তর দশকে বিস্তার লাভ করেছে। অতিমাত্রায় লাভজনক মনোপলিস্টিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো (সংবাদপত্র ও নেটওয়ার্ক ব্রডকাস্টার), মিডিয়া মালিকরা অধিক লাভের পিছনে ছুটতে থাকে। ফলে তারা একদিকে সংবাদকর্মী ছাটাই এবং সংবাদমূল্যকে বাণিজ্যিকীকরণ করতে শুরু করে। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে মার্কিন সংবাদ সাংবাদিকতা গভীর সংকটে পড়ে। বাণিজ্যিক চাপ সাংবাদিকদের কাজ নির্ধারণ করে দেয়ায় সাংবাদিকরা হাল ছেড়ে দেয়। ইন্টারনেট এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সাংবাদিকতার এই গভীর সংকটকে কেবল আরো শক্তিশালী করেছে।

তবে এর একটি আলাদা দিকও আছে। অনেকে বলতে পারেন যে ১৯৬০-এর দশকের সাংবাদিকতার জন্য নস্টালজিক হয়ে আমি কেবল সাংবাদিকতায় কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের সেই সুন্দর দিনগুলিতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করছি। আমি তা করছি না। ষাটের দশকেও আমেরিকান পেশাদার সাংবাদিকতায় ব্যাপক ত্রুটি ছিল। সংবাদপত্রের মনোপলির প্রেক্ষিতে প্রায় একশ বছর আগে "পেশাদার সাংবাদিকতা' ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। মনোপলিস্টিক মিডিয়া মালিকরা পেশাদার সাংবাদিকতা ধারণাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণমূলক সাংবাদিকতা হিসেবে প্রচার করে। সাংবাদিকতায় মিডিয়া মালিকদের অবাধ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জনগণের নজরদারিকে প্রতিহত করার জন্যই এটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পেশাদারী সাংবাদিকতার ধারণা মতে : "প্রত্যেক সাংবাদিকই যেহেতু পেশাদারিত্ব অর্জন করেছে সেহেতু মিডিয়ার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না; সাংবাদিকরাই শেষ পর্যন্ত সংবাদের প্রকৃতি ও আধেয় নির্ধারণ করে।" এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদার সাংবাদিকতা সবসময় কার্পোরেট মালিকানা, বিজ্ঞাপন নির্ভরতা এবং বিদ্যমান অবস্থায় স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। পেশাদার সাংবাদিকতার ধারণা খুবই গঁৎবাধা একটি চিন্তা। এটি সাংবাদিকদের এমন কল্পনায় ডুবিয়ে রাখে যে, রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তারা খুব সৎ, সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ থাকে। প্রকৃতঅর্থে, সাংবাদিকরা

পেশাদারিত্বের যে নীতি অনুসরণ করে তা সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এসব মূল্যবোধ অনেকটা অসচেতনভাবে তাদের নির্ধারিত পথে থাকতে বাধ্য করে। এটা ষাটের দশকের জন্য যেমন সত্যি তেমনি আজকের জন্যও সমানভাবে সত্যি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। কারণ সংবাদকক্ষের অবস্থা খুব করুণ। পেশাদার সাংবাদিকের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। এই অল্প সংখ্যক সাংবাদিকরাই যত বেশি সম্ভব সংবাদ কভার করার চেষ্টা করছেন।

মিরলিস : মিডিয়ার কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ এবং সাংবাদিকতার বর্তমান সংকটের ব্যাপারে কী করা যেতে পারে?

ম্যাকচেজনি : আমরা এ প্রক্রিয়ার একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে আছি। যুক্তরাষ্ট্রে "মুক্ত সাংবাদিকতা" ধারণাটির সাথে এক ধরনের ধর্মবোধ জড়িত; যার মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে রাষ্ট্রের এক্ষেত্রে আসলে কোনো ভূমিকা নেই। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকান মুক্ত সাংবাদিকতা সরকারের ভর্তুকির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ার প্রথম তিন প্রজন্মে মিডিয়া পরিচালনায় সরকারি ডাক ভর্তুকি, মুদ্রণ ভর্তুকি ও মনোপলি লাইসেন্স চালু করা হয়েছিল। এই মূল বিষয়টিকে আলোচনার মঞ্চে নিয়ে আসা এবং মার্কিন মিডিয়ার প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশই আমাদের লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনাবিন্দু। বেশিরভাগ বামপন্থীরাই এ সংকট মোকাবেলায় অক্ষম। কারণ তারা মেনে নিয়েছেন যে ব্যক্তিপুঁজিই সাংবাদিকতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যদি তারা তা না করে তবে আপনি এটি পাবেন না। মূলধারার বক্তব্যও একই রকম। কিন্তু দুটোই ভুল। যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া ব্যবস্থায় ভর্তুকি, মনোপলি ক্ষমতা ও সরকার যে বৃহৎ ভূমিকা পালন করে তা আমাদের সমর্থন করতে হবে। যদিও কর্পোরেট স্বার্থকে সহায়তা করার জন্যই সরকারি নীতি প্রণয়ন করা হয়। মনোপলিস্টিক স্বার্থকে সহায়তা দিতে অধিকাংশ ভর্তুকি কর্পোরেশনগুলোর পক্ষে যায়। রাষ্ট্র ও মিডিয়ার সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে তা যতদিন পর্যন্ত জনগণ বুঝতে পারবে না ততদিন বর্তমান সমস্যার কোনো রাজনৈতিক সমাধান নেই বলেই মনে হচ্ছে। সাংবাদিকতার জন্য প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের শোকগাঁথা লিখবেন, কারণ মিডিয়া মালিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা পত্রিকা বিক্রি করে মুনাফা করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে কিছু করতে পারি। আমরা গণতান্ত্রিক ও প্রাণবন্ত সাংবাদিকতা চালুর জন্য নীতি-নির্ধারনী প্রক্রিয়াটিকে হাতে নিয়ে আসতে পারি। নিজেরা নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করতে চাইলে আমাদের মানসম্মত সাংবাদিকতার প্রয়োজন।

যাই হোক, সবশেষে আমরা পুরনো মিডিয়া ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাই। আমরা এক নতুন ধরনের সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে চলেছি।

আমরা এমন সাংবাদিকতার জন্য লড়াই করছি যা নতুন মিডিয়া প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে পাবলিক তথ্য ব্যবস্থাকে ব্যাপক মাত্রায় গণতান্ত্রিক, উদার এবং আরো জবাবদিহিমূলক করে তুলবে। সম্পদহীন মানুষেরা যাতে মিডিয়া ও রাজনৈতিক জীবনে বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে পারেন সেজন্য আমরা মিডিয়া ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ন চাই। আমার দৃষ্টিতে এ ধরনের গণতন্ত্রায়নের ফল হলো বামপন্থী রাজনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমি ভুলও বলতে পারি। হয়ত জনসংখ্যার বড় অংশটা চাইবে যে শতকরা এক বা দুই ভাগ জনগণই সবকিছুর মালিক হবে। কিন্তু যৌক্তিক বিচারে এমনটা ঘটবে বলে আমার মনে হয় না।

মিরলিস : আমারও মনে হয় না। কিন্তু নতুন গণতান্ত্রিক মিডিয়া নীতির জন্য প্রস্তাবনাটিকে নিওলিবারেল পন্ডিতরা সমালোচনা করেন। তারা প্রায়ই বলেন : "সাংবাদিকতাকে রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে দেওয়া হলে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে!", "মিডিয়ায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অগণতান্ত্রিক!", "মুক্ত সাংবাদিকতা হুমকির মুখে পড়বে।" এই ধরনের বক্তব্যের পক্ষে মূলধারার মিডিয়াও আওয়াজ তুলছে। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

ম্যাকচেজনি : আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে সরকার ও মিডিয়ার মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃত ইতিহাসের দিকে নজর দেন তাহলে আপনি যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হবেন তাহলো : থমাস জেফারসনই কি প্রথম স্ট্যালিন ছিলেন? জেমস ম্যাডিসন কি একজন হিটলার ছিলেন? না, "প্রতিষ্ঠাতা-জনকরা" মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য নয় বরং মিডিয়া ব্যবস্থাকে উন্নত করতে নিজ উদ্যোগে মিডিয়া ভর্তুকির প্রচলন করেছিলেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এসব ভর্তুকি দেয়া হতো। বলতে গেলে বিনা পয়সায় দূর-দূরান্তে সংবাদপত্র পাঠানোর জন্যই ডাক ভর্তুকি চালু করা হয়েছিল। রাজনৈতিক বিবেচনা ব্যতিরেকে এটি সব সংবাদপত্রের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। আমরা এই ধরনের ভর্তুকির কথাই বলছি। আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসে থাকা গুটিকয়েক এলিটকে এমন সুযোগ দিতে চাই না, যারা সংবাদকক্ষে গিয়ে প্রকাশককে বলবে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না।

বলা হচ্ছে, আমরা এমন বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে বিশ্বাস সমাজের সকল সাংবাদিকতাকে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসা হিসেবে রাখার কথা বলে। অনেকেই বলেন, মুনাফাকেন্দ্রিক কর্পোরেট সাংবাদিকতাই স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য সবেচেয়ে ভালো কাজ করতে পারে। তারা ভুল জায়গায় আছেন। সমস্যায় সদাজর্জরিত সাংবাদিকতার সঙ্গে পুঁজিবাদের ধারণা সম্পর্ক সবসময়ই অস্থিতিশীল। পুঁজিবাদ, সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক কখনোই নিশ্চিত কোনো বিষয় ছিল না। পুঁজিবাদই সাংবাদিকতাকে তত্ত্বাবধান করবে এটিই স্বাভাবিক, এবং একটি মুক্ত ও স্বশাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় পুঁজিবাদকে

ছেড়ে দেয়া উচিত-যুক্তরাষ্ট্রে এ ধারণা সাংবাদিকতার এমন একটি যুগকে নির্দেশ করে যার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকে। যখন মালিকরা বুঝতে পারল সাংবাদিকতাকে বৃহৎ ব্যবসায় রূপান্ড়র করে তারা প্রচুর আয় করতে পারবেন তখনই এ যুগের অবসান ঘটে। কর্পোরেশনগুলোর পক্ষে মানসম্মত সাংবাদিকতার চর্চা করা সম্ভব নয়। সংবাদ কোনো বাণিজ্যিক পণ্য নয়। এটি জনগণের সম্পদ, যা একটি স্বশাসিত সমাজের জন্য গুর"ত্বপূর্ণ। আমরা যদি এই ধারণা গ্রহণ করি তবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মিডিয়া নীতি ও ভর্তুকির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট? এগুলো কীভাবে বাস্ড়বায়ন করা যায়? আমরা এখন এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং এর ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা যদি কিছু না করে কেবল বসে বসে আশা করি যে কোন নতুন প্রযুক্তি যাদুমন্ত্রবলে এ সমস্যার সমাধান করবে, কিংবা জর্জ সোরোস-এর মতো কোনো মানবদরদী বিলিয়নিয়ার কেবল সব অর্থের যোগান দেবে তাহলে আমরা দিবাস্বপ্ন দেখছি। সাংবদিকতার ভবিষ্যৎ খুবই বড় মাপের একটি ইস্যু।

নতুন মিডিয়া, বণ্ঢগস্ফেয়ার এবং সিটিজেন জার্নালিজম

মিরলিস : কিছু মিডিয়া উদারপন্থীদের মতে, মূলধারার পুঁজিবাদী মিডিয়াকে সংস্কার করার প্রয়োজন নেই। এবং পুরনো ধারার সাংবাদিকতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নীতিমালারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে না। কারণ মিডিয়ায় কাজ করার পর্যাপ্ত দক্ষতা, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা ও অবসর সময় থাকলে যেকেউ নতুন মিডিয়া সামগ্রী (ডিজিটাল ক্যামেরা, ক্যামকর্ডারস, কম্পিউটার সফটওয়্যার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইউটিউব, গুগলভিডিও ইত্যাদি) ব্যবহার করে স্বাধীনভাবে মিডিয়ায় লেখালেখি এবং রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে। নতুন মিডিয়ার এই গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী?

ম্যাকচেজনি : এই ধারণা অনেকখানি সত্য এবং মানুষের বাস্ড়ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। নতুন মিডিয়া শুধু সাংবাদিকতায় নয়, সমাজের সমগ্র যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নাটকীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এখন আর জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশকে কেবল গুটিকয়েকের সরবরাহকৃত তথ্যের গ্রাহক হয়ে থাকতে হয় না। তবে এই যে বলা হচ্ছে, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যক্তিগত বণ্ঢগ ও ইউটিউব পোস্ট সাংবাদিকতার বিদ্যমান সমস্যা নিরসন করবে, সমস্যা সেখানেই। আর তা হল এই ধারণার মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছে, যে সাংবাদিকতাকে এতদিন ধরে আমরা চিনে এসেছি সে সাংবাদিকতার যে ইতি ঘটবে তাতে আমাদের মোটেও উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। তবে আসল কথা হল, সাংবাদিকতা স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিদের অবসরকালীন কৃতকর্ম নয়। বণ্ঢগিং ও ইউটিউবের মাধ্যমে সন্ড়োষজনক মাত্রার কাছাকাছি সাংবাদিকতাও কি সৃষ্টি করা

সম্ভব? আমি সত্যি সত্যি জানতে চাই মার্কিন সরকার যে আর্থিক খাতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার প্রদান করছে তা কোথায় যায়। আমি জানতে চাই রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে চুক্তিগুলো কীভাবে সম্পাদিত হয়। আমি এক হাজার আই.এফ. স্টোন চাই, যারা ওয়াশিংটন ও ওয়ালস্ট্রিটের চুলচেরা বিশেণ্ঢষণ করবেন, আর ক্ষমতায় যারা বসে আছেন তাদের বির"দ্ধে অনুসন্ধান চালাবেন।

মিরলিস : একজন বণ্ঢগার কি এই কাজ করতে পারেন?

ম্যাকচেজনি : ক্ষমতাশালীদের হাত থেকে দূরে থেকে এই কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে তাদের দিতে হবে ভাল বেতন, প্রশিক্ষণ ও একটি সংবাদকক্ষ। তাদের প্রচুর সময়েরও প্রয়োজন হবে। আমি যদি অফিসে বা কারখানায় সারাদিন কাজ করি, এরপর বাসায় যাই, বাচ্চাদের খাওয়াই এবং পরের দিনের দুপুরের খাবার তৈরি করি, ঘর পরিষ্কার করি, কাপড় ধুই এবং তারপর রাত ১১টার দিকে বণ্ঢগে বসি, তবে এটি কিছুতেই কাজের কাজ হবে না। এক্ষেত্রে যা করা যায় তা হল, কেউ যদি অর্থনীতি বিষয়ে কিছুটা পড়াশোনা করে এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেছেন, তিনি অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিকদের অসংখ্য লেখা খুঁজে সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। তিনি এসব লেখার সত্যতা ও সূত্র যাচাই এবং বিভিন্ন মতের মধ্যে তুলনা করতে পারেন। এরপর তিনি এসব বিষয়ের ওপর বণ্ঢগে লিখতে পারেন এবং মিডিয়া বিতর্কে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, প্রশিক্ষিত সাংবাদিকদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। আমি বণ্ঢগস্ফেয়ার (খ"কালীন বা ভলান্টিয়ার সিটিজেন জার্নালিস্ট) বলতে বুঝি একদল মিউজিশিয়ান, যারা সাংবাদিকদের তৈরি মেলডি উচ্চারণ করেন এবং তাতে সুর তোলেন। কিন্তু সাংবাদিকতা ছাড়া তা বিশৃঙ্খল হবে। বণ্ঢগিং যে বিশৃঙ্খলা নয়, বরং একটি সুন্দর সঙ্গীত তা নিশ্চিত করার জন্য সাংবাদিকতা জর"রি।

মিডিয়া রাজনীতি এবং সরকারি সূত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর লড়াই

মিরলিস : মিডিয়ার অর্থ যোগানের উৎস কীভাবে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা সীমিত করে সে সম্পর্কে আপনি বলেছেন। দেখা যাচ্ছে এই কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক শক্তি সাংবাদিকদের স্বাধীনতার জন্য একটি বড় হুমকি। অনেক সাংবাদিক সরকারি ও বেসরকারি উভয় মহলে জনমত ও ভাবমূর্তি সংগঠন প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। তাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সংবাদসংস্থা ও প্রতিষ্টান (থিঙ্কট্যাঙ্ক) থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য সরবরাহ করা হয়, যাতে তারা জনমত গঠনে অংশ নিতে পারেন।

ম্যাকচেজনি : হ্যাঁ, সমস্যা এখানেই। পেশাদার সাংবাদিকরা তথ্য পেতে গ্রহণযোগ্য বা সরকারি সূত্রের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্টিত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করেন। সাংবাদিকদের এই নির্ভরতার সুযোগে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা বিতর্কের

গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ, ইস্যু গঠন ও সাংবাদিকরা কী লিখবেন না লিখবেন তা ঠিক করে দেন। প্রকৃত সাংবাদিকতা যে রকম হওয়া উচিত তার সঙ্গে সাংবাদিকদের এই সরকারি সূত্র নির্ভরতা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সেরা মার্কিন সাংবাদিক হচ্ছেন আইএফ স্টোন, যিনি প্রায় পাঁচ দশক মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মার্কিন পেশাদার সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন স্টোনকে একজন মহাবীর হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু স্টোন জীবনের অধিকাংশ সময় সরকারি সূত্র নির্ভরকারীদের কড়া সমালোচনার শিকার হয়েছেন। স্টোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে নারাজ ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সম্পর্ক তার প্রকৃত সাংবাদিকতার গুণকে ক্ষতিগ্রস্ড় করবে। স্টোন জানতেন, সরকার কী করে এবং কাদের স্বার্থ রক্ষা করে সে বিষয়ে সত্য খবর বের করে আনতে তার যে ক্ষমতা তা এ ধরনের সম্পর্ক দ্বারা খর্বিত হবে।

স্টোন যে সাংবাদিকতার চর্চা করতেন, বর্তমান সময়ের পেশাদার সাংবাদিকরা তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সাংবাদিকতার চর্চা করেন। বর্তমানে পেশাদার সাংবাদিকতা হল রাজনৈতিক খবর সংগ্রহের লক্ষ্যে ক্ষমতাবানদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করা। কোন বিষয়ে, যেমন যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোন দেশে আক্রমণ চালানোর অধিকার রাখে কি রাখে না, সেক্ষেত্রে ক্ষমতাশালীরা যখন সম্পূর্ণ একমত হন তখন সাংবাদিকরা কোন প্রশ্ন তুলেন না। বরং এলিটদের ঐক্যমত্যকে তারা মিডিয়ায় তুলে ধরেন। সত্যি বলতে কি কোন সাংবাদিক যদি অন্য দেশ আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের বির"দ্ধে প্রশ্ন তুলেন, তবে সেই সাংবাদিক পেশাদার সাংবাদিক গোষ্ঠীর নিকট অপেশাদার হিসেবে গণ্য হবেন। মনে করা হবে, ওই সাংবাদিক ব্যক্তিগত আদর্শ কিংবা প্রয়োজনের কারণেই এই প্রশ্ন তুলছেন। কোন সাংবাদিক যদি ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেন তখন বলা হবে ওই সাংবাদিক নিউজ রিপোর্টিংয়ে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শকে ব্যবহার করছেন। আর ক্ষমতাসীনরা যা বলেন তার ভিত্তিতেই যদি সাংবাদিকরা রিপোর্ট করেন ও রিপোর্টিংয়ে কথাগুলো হুবহু তুলে ধরেন, কোনরূপ সমালোচনা না করেন তবে ঐসব সাংবাদিকদের পেশাদার, 'নিরপেক্ষ ও সুষম' বলে বিবেচনা করা হবে।

মিরলিস : যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া অডিয়েন্সরা তো রাষ্ট্র থেকে মিডিয়া ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পৃথকীকরণ চান। তবে কোন সাংবাদিক যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমালোচনা করেন, তখন সেই অডিয়েন্সরাই আবার উক্ত সমালোচনাকে আদর্শগত 'পক্ষপাতদুষ্ট' হিসেবে অভিহিত করেন। এটি বিস্ময়কর স্ববিরোধী অবস্থান। আমরা কীভাবে এটি ব্যাখ্যা করতে পারি?

ম্যাকচেজনি : মিডিয়ার ওপর পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে এ স্ববিরোধিতার জন্ম। একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ মানসম্মত সাংবাদিকতার অবনতির অন্যতম কারণ। আপনার যদি এক ঝাঁক সাংবাদিক থাকে যারা কখনো ক্ষমতাবানদের পিছু নেয় না, যারা আবার সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে শুর" করা যুদ্ধের অগ্রসেনা, আবার যারা গভীর সংকটে পতিত অর্থনীতিকেও সহায়তা করে, তবে দর্শকরা তো মুখ ফিরিয়ে নেবে। খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই জনগণ তখন বলবে এসব আবর্জনা আমার দরকার নেই। জীবনের মধ্যেই আমার পথ খুঁজে নিতে হবে এবং মিডিয়া আমার সহায়ক নয়।

মিরলিস : এর কারণ কি কর্পোরেট মিডিয়া শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার প্রতিফলন ঘটায় না এবং ঘটাতে পারে না?

ম্যাকচেজনি : জনগণ যে সমস্ড় বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ভাবে যেমন—যুদ্ধ ও শান্ড়ি, অর্থনীতি, পরিবেশ—সেসব বিষয় যদি মিডিয়ায় তুলে ধরা হয়, তখন একে ভুল হিসেবে মনে করা হয়। আমাদের দরকার নতুন কাঠামো যা একটি শক্তিশালী মিডিয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম, যে মিডিয়া হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিকেন্দ্রীভুত। আমরা একটি মুনাফামুক্ত মিডিয়া ব্যবস্থা চাই, যার সাংবাদিকতা পরিচালনার জন্য অবকাঠামো থাকবে এবং যে সাংবাদিকতা আমাদেরকে নাগরিক হিসেবে সম্পৃক্ত রাখবে যাতে আমরা সমাজের প্রকৃত অংশীদার হতে পারি। এটিই আসলে সেই সাংবাদিকতা যে সাংবাদিকতার জন্য আমরা লড়াই করছি। যারা গণতন্ত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন (বা যারা গণতন্ত্র ঘৃণা করে) তাদের প্রত্যেকের জন্য এটিই মূল লড়াই। গণতন্ত্রের স্বার্থ আর বামদের স্বার্থ অভিন্ন। উন্নত মিডিয়া ব্যবস্থা থাকলে আমাদের জয় হবে।

উচ্চ বাণিজ্যবাদ এবং ডিজিটাল নজরদারির বির"দ্ধে সংগ্রাম

ম্যাকচেজনি : যে চরম বিষয়টি আমাদের (এবং সারাবিশ্বে সবার) মোকাবেলা করতে হচ্ছে সে বিষয়টিকে আমি বলি উচ্চ বাণিজ্যবাদ (hyper-commercialism)। এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও মুহূর্তের রূপান্ড়র ঘটিয়ে কোন কিছুর বিক্রি, ব্র্যান্ডিং ও উন্নতি সাধন করছে। যুক্তরাষ্ট্রে এটি বিশাল সমস্যা। আমি যখন দেশের বাইরে যাই, তখনও দেখি এই উচ্চ বাণিজ্যবাদ সারাবিশ্বে সক্রিয়। ইন্টারনেটে যখন ক্রমবর্ধমান হারে উচ্চ বাণিজ্যিকীকরণ ঘটছে তখন আমরা বিজ্ঞাপনী বার্তার ২৪/৭ ইনজেকশনের কাছে সমস্ড় জীবন উন্মুক্ত করে দেই। উচ্চ বাণিজ্যবাদের বির"দ্ধে আমাদের সংগঠিত হতে হবে। বামদের জন্য এটি সহজ কাজ। আমরা জানি যে, দুনিয়ার সকল মানুষ বিজ্ঞাপন তৈরি বা প্রচার করে না, বরং তা ক্ষুদ্র একটি অংশের সৃষ্টি, যারা বহুজাতিক কোম্পানির হয়ে কাজ করে। বিজ্ঞাপন হচ্ছে বাণিজ্যিক প্রচারণা (commercial propaganda); অথবা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে ১৯৩০ সালে মহান

সমালোচক জেমস রটি বলেন, "বিজ্ঞাপন হচ্ছে প্রভুর কণ্ঠস্বর"। বিজ্ঞাপন পুঁজিবাদের কণ্ঠস্বর। এই পুঁজিবাদী প্রচারণাকে সীমিত, নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস এবং হয়ত সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা করতে হবে। ডিজিটাল কমিউনিকেশনের এই যুগে বাণিজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষভাবে ঘোষিত হচ্ছে।

মিরলিস : কীভাবে?

ম্যাকচেজনি : সমাজে মিডিয়া নেটওয়ার্ক জুড়ে কর্পোরেট নজরদারি বিস্তৃত। সফটওয়্যারের উন্নতি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমরা ইন্টারনেটে যেসব ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করি এবং টিভিতে যা দেখি তা থেকে কর্পোরেশনসমূহ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং বিজ্ঞাপনকে ব্যক্তিমুখীন করে তুলতে পারে। তারা আমাদের পর্যবেক্ষণ করে এবং অনলাইন ওয়েব পেজ ও টিভি অনুষ্টানে এসব ব্যক্তিনির্ভর বিজ্ঞাপন ছেড়ে দেয়। অসাধারণ ডিজিটাল আড়িপাতার (wiretapping) জন্ম হচ্ছে।

মিরলিস : হ্যাঁ, তবে ভোক্তাদের সুবিধার জন্য কর্পোরেশনগুলো এই ইন্টারনেট নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। এর সমর্থকদের বক্তব্য হচ্ছে এটি উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে আরো দক্ষ ও আন্তঃক্রিয়াশীল সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে এবং বাজার ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ন করছে। "এখন যেহেতু উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ সম্পর্কে অবগত সেহেতু তারা আমাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি এবং পণ্যপ্রাপ্তি বা ভোগকে আরো সহজ করে তুলতে পারে।" নজরদারির পক্ষে মূলধারার এই সাফাই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

ম্যাকচেজনি : মিডিয়া কর্পোরেশনগুলো বিশ্বমানের জনসংযোগের একটি রূপরেখো দিচ্ছে। তবে এ জনসংযোগের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, কীভাবে নতুন মিডিয়া নজরদারি ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে আর কিছু থাকবে না। এটি স্বাভাবিকভাবে আপনার মনে ক্ষোভের সঞ্চার করতে পারে।

কোন ওয়েবসাইটে আপনি যাচ্ছেন, কোন আইকনে ক্লিক করছেন, কোন টিভি শো দেখছেন এবং কোন বিজ্ঞাপন আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন আক্ষরিক অর্থে এর সবকিছুই কর্পোরেশন জানতে চায়। তারা এসব তথ্য সংগ্রহ ও বিক্রি করতে চায় এবং তারপর আপনি যাতে আরো বেশি অর্থ খরচ করেন তারা সে চেষ্টা করে। তারা যেভাবে চায় সেভাবেই এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। তাই এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমি এ লড়াইয়ের অপেক্ষায় আছি। আমি মনে করি আমরা এ লড়াইয়ে জয়ী হব। তবে এরপরও একটি সত্য স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সংস্কৃতি এখনো প্রবলভাবে উচ্চ

বাণিজ্যিকীকরণের শিকার। সম্পূর্ণ বাণিজ্যনির্ভর একটি বিশ্বব্যবস্থায় বাক্ ও চিন্তার সততার প্রশ্নে একটি মৌলিক সমস্যা থাকবে। আমরা এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আমাদের দরকার এর বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে নামা।

মিরলিস : এক্ষেত্রে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট আমাদের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

অর্থনৈতিক সংকট এবং বিশ্বব্যাপী মিডিয়া গণতন্ত্রের লড়াই

ম্যাকচেজনি : এই সময়টি যোগাযোগ ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে, কারণ সমাজের সর্বক্ষেত্রে মন্দা প্রভাব ফেলে। কর্পোরেশন শাসিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যর্থ হয়েছে। সারা বিশ্ব আজ এমন কিছুর জন্য লড়াই করছে, যা টেকসই ও মানবিক এবং যা মানুষকে শান্তি ও গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা দেয়। কয়েক বছর আগে যেসব বিষয়, প্রস্তাব, এবং মিডিয়া ও বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকে অস্বাভাবিক মনে করা হতো, তা পাঁচ কিংবা দশ বছরে খুব স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতে পারে। আমি যে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কথা উলেণ্টখ করেছি এটি হচ্ছে তার ধরন। প্রতি একশ বছরে এ ধরনের সময় দু'একবার আসে। এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা এখন আছি। তবে বর্তমান নিয়ে আমি কল্পনায় ডুবে থাকতে চাই না। আমরা যদি এ সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে না পারি, তবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। এখানে আমাদের লক্ষ্য পূরণের পথে অনেক বাধা রয়েছে।

মিরলিস : কানাডায়ও এ বাধা রয়েছে। সে দেশের মিডিয়া মনোপলি সংকটাপন্ন। কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন নিউ কনজারভেটিভ হার্পার প্রশাসনের নিয়মিত আক্রমণের শিকার হচ্ছে। কানাডার নব্য ডানরা বামদের বিরুদ্ধে মার্কিনি ধাঁচের সাংস্কৃতিক যুদ্ধ শুরু করেছে। তো আমরা কীভাবে মিডিয়া গণতন্ত্রের স্থানীয় লড়াইকে সমন্বিত আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে পরিণত করতে পারি?

ম্যাকচেজনি : আমার সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নেই। তবে আমি যা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তাহলো, প্রতিটি দেশের মূল সমস্যাগুলো অভিন্ন। কেবল স্থানীয় পরিবেশের কারণে গঠনগত ভিন্নতা রয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যম বিষয়ক আমার কাজের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মতো সারাবিশ্বের জনগণের কাছ থেকে আমি ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। মিডিয়া বর্তমান সময়ের মৌলিক বিষয়। তাই আমরা মিডিয়াকে কেন্দ্র করে মিডিয়ার মাধ্যমেই লড়াই করছি। সর্বত্র মানুষ নিজস্ব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।

Free Media, Democracy and Democratisation: Experiences from Developing Countries

Mohammad Sahid Ullah

Introduction

Democracy is an integral part of the political culture of Western nations and developed countries where democratic values and institutions are relatively stable and mature. Some form of free and independent media system has organically arisen in these democracies (Becker and McConnel: 2002). In contrast, democracy is treated only as part of the unfinished modernisation project in the developing countries. With democratic values and institutions in the making, democratisation can take an evolutionary or revolutionary path. Whatever forms democratic struggles may take, the configuration of media is always shaping, and being shaped by, the level of democratisation. This observation not only applies to the transitional societies but also to mature democracies (Chan; 2002). John Keane argued, "…The subject of democracy and the media must forever remain open and controversial" (Keane; 1991: xii). So the relationship between media and democracy is not a uniform and linear; rather it is a complex, critical and controversial issue in the contemporary global politics. Therefore, it is understood that democracy has no end state; it is always becoming. Besides, democratisation is an equitable reconstitution of the power structure. In the age of so-called monolithic globalisation, the pressure for more democracy and media equity is not only from within but also from without. To most of the developing world democratisation is transformed for self-aggrandisement. In spite of rapid spread of democracy in the 1990 on a global scale particularly in the Baltic States, some far-east Asian countries and Southern parts of Africa, it is too early to speak of the world having one unitary democratic system and sharing one democratic political culture. Because, democratisation is susceptible to influence of regional and global forces, it remains primarily a national project (Chan; 2002). As a national project media still in some extent could contribute to democratic progress of the Third World countries. From this perspective, analyses of the emergence of democratic political culture and appraisal of the mass media role in the process of democratic advancement through some examples[1] in the so-called Third World nations to understand the co-extensive relations between media, democracy and democratisation.

Democracy and Democratisation

Democracy is a contested term. Various authors have endowed it with asserted meaning 'a distinctive sets of political institutions and practices, a particular body of rights, a social and economic order, a system that ensures desirable results, or a unique process of making collective and binding decisions (Dahl; 1989:5). In the same way Larry Diamond, Juan Linz and Martin Lipset[2] (1998) said, democracy is a system of government, which meet three essential conditions; (a) Meaningful and extensive competitions among individuals and organised groups especially political parties for all effective positions of government power, at regular intervals and excluding the use of force. (b) A highly inclusive level of political participation in the selection of leaders and policies, at least through regular and fair elections, such that no major (adult) social group is excluded, and (c) A level of civil and political liberties freedom of expression, freedom of the press, freedom to form and join organisations-sufficient to ensure the integrity of the political competition and participation.

Therefore, democracy in general stands on the sovereignty of the people, government based upon consent of the governed, majority role, minority rights, guarantee of basic human rights, free and fair elections, equality before law, due process of the law, constitutional limits on government, social, economic and political pluralism, value of tolerance, pragmatism, cooperative and compromise, accountability, good governance and transparency and freedom of expression.

Democratisation to mean a process that involves the interplay of the interrelated spheres of politics, economics, the social and culture and communication towards more participatory decision processes and arrangements that satisfy the greater public. The process of democratisation does not always move in a single direction, rather diverse. Because the difference within and between western mature and eastern and third world democracies are so significant that the concept of multiple democracies is proposed in lieu of the general

[1] For particular examples from Bangladesh and Tanzania I use the country presentation class notes of Media Studies course of the International Summer School (ISS)-2003.

[2] Larry Diamond, Juan Linz and Martin Lipset (1998) following class lecture in the ISS.

assumption of universal democracy (Chan; 2002). Therefore, in the age of multiple democratic movements no consensus till is drawn on the role the media play in the democratic process. Countries move towards democracy in starts and stops, with regression at least somewhat common. According to Becker and McConnel (2002) there are four distinct phases that a country or territory goes through on the path to becoming a stable (or mature). They are, the pre-transition stage; focuses on societal conditions under the old regime while the transition stage is that historical moment when the ideals of democracy are accepted and adhered to, and then is considered stable when democracy functions over a period of time. This approach suggest that media tend to be most supportive of democracy in the early, often euphoric, period after the previous regime has fallen, when journalists as well as other citizens are enjoying new-found freedoms.

As the transition process moves toward consolidation, the media as well as the public can become more cynical, particularly in the face of continued political wrangling and the financial pressures of a market economy. The media in a stable democracy are considered the principal institutions from which members of the public can better understand their society. Ideally, the media contribute to the public sphere by providing citizens with information about their world, by fostering debate about various issues and by encouraging in which diverse positions are advanced, significant opinions are heard, interests and inner-workings are exposed, and input is received. These all contribute to public debate. The media are also expected to act as "watchdogs" on government and industry.

Democratisation and Media

Democratisation in western countries means a political struggle among and within the ruling elites and various socio-political forces. In the developing word, democratisation is also a process by which democracy is transculturated (Chan; 2002). As a rule, all the parties concerned in democratisation will try to seek the endorsement of the media in order to strengthen their positions at the expense of the opponents. The ways the media frame the issues and render their sympathy will affect the balance of power in a public debate. Essentially, the media represent resources that can be mobilised to demote or promote democracy. The democratic cause will be served if they can help spread democratic ideals, reflect the voices of contending parties, provide the public with quality and relevant information articulate the social choices, and facilitate public deliberation. Failing all these functions, democracy will be undermined. In such a case, the media will be maintaining the status quo by legitimating the power centre, marginalising the contending voices, diluting critical information, precluding genuine options, shortening public debates, and demobilising collective behaviours. What contributions mass media can make towards democratisation varies with a host of determinants such as the power structure, political culture, media configuration, market pressure, organisational constraints, ideology and personal inclinations. It is beyond the scope to give a comprehensive review of how all these determinants may interact in defining the roles of media. In this context the contention is that the power structure and the location of the media in it are the most important variables that account for various democratic media roles. Because role of the media in any society are very much embodied in its mode of media control situation and emergence of its traditions that varies mainly with its power structures and native political history.

Free Media and Democratisation: The Third World Perspectives

Democracy is a highly exacting creed in its expectations of mass media. It requires that the media perform and provide a number of functions and services for the political system. Generally media in a democratic society play some important roles, like information dissemination, agenda-setting, representative, watchdog, market place of ideas, platform for dialogue etc. Michael Gurevitch and Jay G. Blumler (1990:270) identified the significant media functions are:

1. Surveillance of the socio-political environment, reporting development likely to impinge, positively or negatively, on the welfare of citizens;
2. Meaningful agenda-setting, identifying the key issues of the day, including the forces that have formed and may resolve them;
3. Perform for an intelligible and illuminating advocacy by politicians and spoke persons of other causes and interest groups;
4. Dialogue across a diverse range of views, as well as between power holders (actual and prospective) and mass publics;
5. Mechanisms for holding officials to account for how they have exercised power;
6. Incentives for citizens to learn, choose and become involved rather than merely to follow and kibitz over the political processes;

7. A principled resistance to the efforts of forces outside the media to subvert their independence, integrity, and ability to serve the audience;
8. A sense of respect for the audience member, as potentially concerned and able to make sense of his or her political environment.

James Curran considers more conventional accounts of the democratic role of the media that are; the media as public watchdog, public representative (forth estate) and source of public information (Curran; 2000:83). These three roles cover all eight functions suggested by Michael Gurevitch and Jay G. Blumler. To explore the role of media in the democratisation process in the Third world countries the roles said here would be discuss.

Media think tanks most from western nations and some from the developing country's, who are generally enlighten themselves in western democratic values claimed that free press create chaos in the developing countries but the existence of a free press is not entirely rare in developing countries. A survey by Leonard R. Weaver in 1988 listed 30 Third World countries- as diverse as Colombia, India, Trinidad and Botswana- as enjoying a 'generally free' press. Freedom House survey 2005 revealed that 54 countries falls in 'partly free' categories of press freedom scale. Form Albania to Peru, Bangladesh to Fiji, Indonesia to Nigeria it listed name of the countries. Yet, such classifications are not clear-cut; the government of some countries, such as India considered enjoying a free press. Like USA, India considers media is a laissez-faire, which characterised by a low level of state inducements and a low level of constraints, as commonly found in liberal democracies whose power structure is in general more decentralised and pluralistic. However, the report stated that from 1999 to 2000 the standard of the freedom has declined in 0.5% of the countries and improved in 22% and from 2004 to 2005 only 0.95 % improved with no declined among 209 countries where as the condition remained same in elsewhere. It is remarkable the situation improved in most of the third world countries, like Bangladesh, Tanzania, Indonesia, Chile and even in South Africa, which actually experienced some democratic advancement during the last decades. Now the question arises, what kinds of role did the media play in these countries in the way to democracy?

Critical surveillance of government is clearly an important aspect of the democratic functioning of the media. Watergate in the USA, Bofors guns in Sweden and India or Nikiforovs's exposure of the local state corruption in Russia (formerly the USSR), Appointment of Supreme court Justice with fake certificates in Bangladesh or confrontation between Tony Blair and the BBC regarding the Iraq war involvement, are all heroic of the way in which the media performed a public service through investigating and stopping malpractice of the public officials and corrupt politicians there. Therefore, a free press is needed everywhere, no less in developing countries than advanced industrial societies. In any country where political institutions and oppositions are not yet, like Libya and Cuba –or are no longer–like Pakistan operating freely, a press is able to report and reflect popular discontent with the course of national policy or with the government of the moment can serve as an important warning light, identifying early problems that demand solution if political stability is to be maintained. Iran in Shah's regime and transition from Marcos to Aquino in the Philippines are the best example in this regard. In Iran, millions of people died as Shah was in quite dark about the consequence during the period, because there has no free expression in Iran to learn anything, on the other hand somewhat freer media of the Philippines made it possible for the inevitable Marcos-Aquino transition to occur with little violence. In Bangladesh, to honour public sentiment press created pressure to the leaders of three main rival political parties to sit together for chalking out the way of democratic transition after the fall of 15 years rule by barrack in 1991. Since the history of the first press appeared during the colonial rule, press stands against the repression by the rulers. Therefore, most media people and civil society members of Bangladesh believe that the history of political development and the advancement of media went parallel.

Similar example could be drawn from the Nobel laureate economist Amertya Sen (2000). In his book 'Development As Freedom' explained how free media or free flow of information helps in overcoming famine in India, whereas in China, only due to lack of information from the affected areas faced one millions people death in a similar famine. According to his observation if people in China by any chance could pass the information to the authority, somehow the authority then could act. Bangladesh experienced a three—month inundated devastating flood in 1998 that marooned more than 50 million people without any disaster to human lives. It is claimed that the government heavily depended on press to cross check the information from local administrations to initiate necessary actions. From these examples, it may be concluded that in future the governments in the Third world countries would value the free press

as a better source of information depending on secret police or intelligence agencies.

The media has also other helpful roles to play, which are implicit in, and flow from its role as an informer and educator of the people. The media can act as a channel between the people and the authorities. The grievances, the needs, the problems, the hopes and aspirations of the people may be conveyed by the media to the authorities and the responses of the authorities may in turn be conveyed to the people. The media thus facilitates the constant flow of information between the authorities and the mass. The media can thus make up the major deficiency of the indirect or representative democracy viz., the lack of a direct dialogue between people and the authorities.

Media performs essential political, social, economic and cultural functions in modern democracies. Because, in such a societies, no other means, only media are the principle source of political information and access to public debate and the key to an informed participating self-governing citizenry. Democracy require a media system that provide people with a wide range of opinion and analysis and debate on important issues, reflects the diversity of citizens, and promote public accountability of the powers that be and that want to be. The media must act as watchdogs against abuse of power. Actually, the media in democratic society must poster deliberation and diversity and ensure accountability both the party in power and bureaucrats in the administration.

According to Vicky Randell (1998), media play an important role in democracy and democratisation. In fact most of the media scholars have a general consensus that the media play an important role in modern societies. The media should act as conduit of vital political information providing guidance as to the interpretation of that information to enable citizens to participate in meaningful public life. This function gets its momentum during general elections. People can choose competent leaders from information received from media. For example in most African and Asian countries, where elections are usually free but not necessarily fair, the media during elections plays an enormous role for it has to educate the mass on their civil rights including the right to vote. The media in those countries where majority of the people are illiterate has to educate them on the voting procedures and the electoral process generally so that voters can make informed choices. Without free flow of information and independent media, people may captive into a cocoon and select wrong leaders to rule them. The media therefore, must constitute a means of expression for the full range of political interest which an

institutional framework and set of practices that encourage wide and inclusive public debate about issues of social political importance. The media thus can only perform the above functions effectively when is given them full freedom and that is not subjected to unnecessary restrictions by laws or government concerned. Myanmar, Belarus and Zimbabwe are such examples where editors and media people are subject to severe punishment for publishing stories against the government. In these states watchdog roles and making leaders accountable can hardly been ensured.

People put confident to media because media can perform the task of the watchdog of the people's interests. The acts of omission and commission, of corruption, waste, inefficiency and negligence on the part of the authorities, can be exposed by it. Through investigative journalism, scams and scandals can be unearthed, anti-social activities exposed and implementation of the policies and programmes monitored and pursued. The media can thus act as an Ombudsman on behalf of the people almost every day and keep those in authority, within the bounds of law and on the straight path. Thus the accountability to the people of all the authorities, individuals and institutions performing public duties, for their day-to-day acts and omissions, may be ensured through the media. It is the accountability of those in power, which distinguishes democracy form the other political systems, and to the extent the media acts as an instrumentality to ensure the day-to-day accountability, it helps; to make democracy real and effective.

This is not to say that the freedom of press is easy to be established in countries having little or no experience with democratic values and institutions. But press freedom is much more likely to be accepted than other democratic traditions in some nations like an institutionalised opposition party that might be seen as too much of a threat to existing regimes. Instead of functioning strictly as an adversary of the government, a free press can provide an effective forum for public debate, a mechanism for precious two-way communication between the people and their leaders. In this role, it can accomplish a great deal. Any country with a genuinely free press, for example, will have a hard time holding a large number of political prisoners without having to explain itself to the public. A free press may, in fact, be more effective than an opposition party in achieving changes in an oppressive system.

The media can also act as a day-to-day parliament of the people, which may be more effective than the parliament, itself. The media can provide an adequate forum for the people to debate and discuss

the prospects and constrains of the issues and problems confronting them. What is more important, through its forum, the media can act as an independent and constructive opposition to those in power. The political parties, which act as opposition, in many cases often have coloured views, and many times oppose for the sake of opposition to serve their own political interests. Some times, both the ruling as well as the opposition parties may avoid saying and doing certain things for fear of losing votes, although the debate and action on them may be in the larger national interests. Like the judiciary, the media have not any particular constituency. The nation as a whole is its constituency. The media can therefore act as an impartial, objective and constructive critic of the official policies and programmes, and protect the interests of the nation form the politicians' vote-centred actions and inactions.

Sanford J. Ungar (1990: 370) explained when media freedom once in place, it is an extraordinarily powerful catalysts for other democratic reforms. Glasnost (openness) and perestroika (restructuring) are the great example of such kind of reforms. The same was applied in most Third world countries where authoritarian media model were followed. Like many other countries, in Tanzania media was used as government mouthpiece till 1992. With the liberalisation of the government owned media, the situation was changed instantly. At least 40 private radio and television channels and more than 200 private owned newspapers started their missions and began to give more freedom to the public to give their views in regards of political, social and cultural development of the country. While it was impossible to criticise the government through media before 1992 today public are much more free to give their opinions and discuss different developmental issues in the media hence giving diversity of ideas. Today than ever before leaders are held accountable of their work through media. A good example was in 1998 when the then Deputy minister of Finance was held accountable of using ministers office for own benefits and had to resign following a corruption scandal reported in one of the newspaper in the country.

Similarly freedom of the expression, particularly press freedom was curbed in Bangladesh during the period of 1982-1990 when the country was under autocratic rule. 'Press advice' was applied during that period instead of press censorship. Press was chained in a new form. Which news item would go and which will not, in which page would it get treatment, even that the headline would be-all these things were set under government orders. A neutral *Caretaker Government*[3] that came to power following a mass upsurge in 1990 repealed clause nos. 16, 17 and 18 of the Special Powers Act- 1974. A mushrooming inception of the dailies named Bangladesh a country of newspapers after the repeal. Within three months of repealing the clauses a total of 114 dailies got declaration to publish in Bangladesh. During the immediate general election of 1991 Awami League (AL) and BNP, two major political force of Bangladesh in their respective election manifestoes were committed to realise the resolutions of '*Three-party Alliance Declaration*' including freedom of the media. Prior to the election held in 1996, AL had also committed in their election manifesto that it believes in free flow of information and full freedom of the press. They promised that the radio, television and state controlled news agency would be given the status of full autonomous body in order to free them from party influence. The government did a commendable job by going beyond its commitment in allowing and extending cooperation to establish the first private channel. On the other hand, no unwanted interference is visible in the affairs of the press. Press are free to inform the citizen any things that are concern people and development of the country. A new concept – Development Journalism emerged now to make people active in participating good governance in every sphere of activities. In same line after the victory of BNP in the 8th parliamentary elections, it allowed some 20 private televisions and a radio channel to incept broadcasting independently. Before the permission there was only one state-run radio and television along with a private television was in functioned. Bangladesh government after 18 year of its democratisation process promulgates the Right to Information Act in 2008 and waiting to democratise its broadcast sector through incepting Community Radio.

Again the media construct realities to make sense of the changing power dynamics. The mode of media control and its associated media functions may change as power is realigned. In the instance when a 'hard' authoritarianism is transformed into a 'soft' authoritarianism as a result of growing democratisation, the state may change its press control from incorporation to cooptation. This process was rendered visible when South Korea and Taiwan, where opposition parties and

[3]After Bangladesh returned to civilian leadership in 1991, following 15 years of mostly military rule, main political parties agreed that the incumbent party would step down a couple of months before every election. The government- 'Caretaker Government'- would briefly run the country and the election commission until a new government is elected.

grass-root groups gained solid legitimacy to challenge the ruling regime's monopoly in the late 1980s and 1990s. Vibrancy of market competition also served to reduce press reliance on the state and to loosen state coercion of the press. The relaxed control of media results in an expanded public sphere, which further reinforces democratisation. Recent Thai coup and shutdown of unlicensed community radio broadcasting can also be considered in this context.

Conclusion

The traditional argument commonly advanced by Third World representatives and by many of western scholars is that press freedom is a luxury that developing societies cannot afford. It is often explained that given the conditions of scarce resources, a colonial legacy, a poorly educated population, tribal and ethnic rivalries, and a subservient position in the world economic and information systems, a free press can too easily lead to an inability of government to function and to internal chaos in the Third World countries. With a lot of anomalies examples from both developed and developing countries particularly two small countries from Asia and Africa proved that a free, independent and pluralistic media is prerequisite for democracy, good governance and development in the Third World countries too. Free media will not create chaos only, rather has been playing an integral component of transparent, good and accountable governance in many countries of the world. Therefore, people from different walk of lives across the globe recognise that media has been developed as an inseparable institution of the society. Depending upon the audience the role of media nature and their functions may be varies from society to society and from time to time. But it is common that people would like to express their opinion; desire to say and write what they feel. And people start participating in activities of their everyday lives, their rights become into reality in some extent. A responsible and free media has the ability to uphold this reality of rights though the people of the Third world countries had to pay a high price in establishing their rights of free expression.

References

Becker, Lee B. and Patrick J. McConnell (2002), "Role of Media in Democratization" Paper presented in the 23rd IAMCR Conference, Political Communication Section, Session-I, Barcelona, 21-26 July 2002 at : http://www.portalcomunicacion.com/bcn2002/n_eng/programme/prog_ind/asp4.asp?id_pre=1461 04.08.03

Chan, Joseph Man (2002), "Media Democracy and Globalization: A comparative perspective", Media Development, WACC, London, Issue 1, 2002 at http://www.wacc.org.uk/publications/md/md2002-1/chan.html, 05.08.03

Curran, James (2000), "Rethinking media and democracy". In Curran, James and Michael Gurevitch (Eds.). Mass Media and Society. London: Arnold, pp.120-154.

Dahl, Robert A (1989), "Democracy and its critics" New Haven, Yale University Press Freedom House Survey, at http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2001/team.htm 04.08.03

http://www.freedomhouse.org/uploads/FIWrank7305.xls (access on 23.9.06) and http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=16 (Access on 23.09.06)

Gurevitch, Michael and Jay G. Blumler (1990), "Political communication systems and democratic values" in Lichtenberg, Judith (Eds) Democracy and the Mass Media Cambridge University press, UK. 1990.pp 269-289

Keane, John: (1991), "The Media and Democracy", Polity Press, USA.

Randall, Vicky (1998). "Democratization and the Mass Media". London Frank Class

Sen, Amertya (2000), "Development As Freedom", Oxford, UK

Ungar, Sanford J, (1990). "The role of a free press in strengthening democracy" in Lichtenberg, Judith (Eds) "Democracy and the Mass Media", Cambridge University press, UK. 1990. pp 368-398.

Winners and Losers when the TV-Monopoly was dissolved in Sweden

Lars-Åke Engblom

In Sweden, as in several other North European countries (and Bangladesh), radio and television was developed as a public service-system with the British BBC as a model. From the mid 1980's it was complemented with and subjected to competition from commercial radio-and tv-companies. Technological innovations and political deregulations broke the broadcast monopolies in northern Europe. Twenty years later the traditional public service-companies are competing with the commercial companies for viewers and listeners as well as revenues, but also about getting as good political conditions as possible. The technological development is further sharpening this competition. What conclusions can be drawn after two decades of competition? Which winners and losers can be identified? And in what way is the audience winner or loser? These are the questions addressed in this paper, based on results from an ongoing project about the competition between Public Service and Commercial radio and tv in Sweden.

Background

Until 1987 just two public service tv-channels existed in Sweden (SVT1 and SVT2 both within Swedish Television Corporation), but in December 1987 the privately owned commercial channel TV3 started transmissions by satellite from London. Four years later the Swedish parliament accepted a commercial channel in the terrestrial system. A new "commercial public-service-company" TV4, got the license after "a beauty contest". Another purely commercial satellite channel, "Kanal 5", was established 1989. These channels have dominated the TV landscape in Sweden since 1990. Together they have more than 80% of the Audience (of which the SVT Channels 35%). A lot of new niche channels have appeared the last years, partly connected to the leading channels. This process has been stimulated after the switch from analogue to digital terrestrial tv, which was completed in 2008.

The competition between the public service companies and the commercial companies takes place in different arenas. In the political arena, the companies try to obtain as favourable regulation as possible. In a technological arena, they try to maximize their possibilities for distribution. In the economic arena, they compete for advertising and audience revenue. The most visible competition, however, is for viewers and listeners.

The Competition on the Political Arena

In Sweden, the public service companies Sveriges Radio (SR) and Sveriges Television (SVT) where given a monopoly on radio and television broadcasts respectively. As long as the available frequencies were limited, for technological reasons, this system was never questioned. Simultaneously, media policy has experienced increasing ideological differences. A clear line can be drawn between those that want to protect and develop the public service system and those that want a more market oriented system with a limited role for public service. Apart from trying to directly influence regulation, the competition in the political arena has also concerned winning the support and confidence, both of the audience and of the political parties and other organisations in order to exercise indirect influence over regulation.

The public service television company, SVT, has done well in the political arena. The company's most important demands have been met by the political system. SVT has been granted broadcasting permit with less detailed regulation and a permission to develop niche-channels for children and educational programmes. SVT has also granted continued financing through licence fees. The only setback SVT has suffered by the hands of the politicians in the past decades has been not to grant the company's request to start its own pay-tv channels.

The commercial public-service channel TV4 has also been successful in the political arena. In particular, the channel has managed to get its broadcasting permit renewed three times, despite not having fulfilled all the promises of a broad programming given at the initial beauty contest. Further, the channel has managed to change the regulation of advertising in a desired direction. Since 2002, it is allowed to insert commercial breaks into longer programmes, such as films. Overall, TV4 has been successful in the balance act of portraying itself as a commercial quality channel. It has received a lot of criticism for being too commercial, but at the same time managed to gain the confidence of the Swedish viewers. It does not rank as high on trust as SVT, but are well ahead of the commercial channels TV3 and Kanal 5.

TV3 and its founder, magnate Jan Stenbeck, succeeded in their most important aim, to break the Swedish television monopoly, thus earning the channel and Mr Stenbeck a place in the Swedish media history. TV3 paved the political and legal way for a fast diffusion of cable and satellite television in Sweden. Already from the start, TV3 has been a typical commercial entertainment channel.

Kanal 5 is a pure entertainment channel, even more so than TV3. Kanal 5's most important aim has been to become established as one of the five main national tv-channels. Due to its content, the channel is not held in high regard by the establishment and policy makers. Like TV3, Kanal 5 is broadcasted via satellite from the United Kingdom and subjected to OFCOM regulation.

The success of the television companies in the political arena can be measured in several ways. Compared to the times of the monopoly, SVT is the big loser, as it has lost its monopoly on national television broadcasts. But the regulatory framework still grants SVT a strong position and it is still the largest of the four big broadcasting companies in Sweden. All these companies–SVT, TV4, MTG and Kanal 5–have been given conditions that have allowed them to develop, even if all their aims have not been fulfilled.

The real losers in the political arena have been the actors which have not been given the conditions that they had hoped for: different local channels, a commercial educational television channel and channels from the other Nordic countries. Channels like these where all used as examples of how diversity would increase with the introduction of cable-tv in the 1980s. Expectations were high, not at least concerning Nordsat, the Nordic tv-satellite. The regulatory framework and its subsequent implementation have instead favoured the big national and international broadcasting companies.

The Economic Arena

The turnover in the television market has increased sharply over the past two decades. The audience's expenditure for receiving programmes has increased significantly–either directly through licence fees, subscriptions or pay-tv, or indirectly through advertising on radio and television. Many new actors have joined the different value chains of the business, but at the same time, the high cost for establishing and running a business has limited the number of broadcasters.

An important characteristic of the Swedish radio and television markets is that privately owned enterprises exist side-by-side with a public-service sector, the one financed by commercial revenue, the other through licence fees established in law.

The strategies of the companies differ according to their strategic goals. TV3's parent company, MTG, has a very clear commercial purpose: "Anything we do must generate money", the managing director has declared. MTG's strategy amounts to control the whole chain from programme production to distribution. Shortly, since TV3 broke the Swedish tv-monopoly, the TV3 group of companies established a programme production company, a pay-tv-channel, advertising sales and home-shopping companies. After a few years they also started a distribution platform of their own, Viasat. MTG/TV3 also entered the radio market.

TV3 became a paying company four years after establishment. In recent years MTG has focused more and more on the satellite platform Viasat and TV3 has been an important part of this concept. MTG has also launched a lot of new channels with the intention of strengthening the Viasat platform as well as MTG's cable distribution company, Tele2/Kabelvision. Another cornerstone in the MTG media house is internationalization. MTG/TV3 has from the beginning even transmitted the channel to Denmark and Norway partly for widening the market, partly for getting round the national legislation. The geographic expansion has mainly taken place in Eastern Europe, especially in the Baltic countries, Russia and Hungary.

Kanal 5, the other big purely commercial channel besides TV3, has no interests in the distribution market. Kanal 5 wants to be represented on so many platforms as possible. Kanal 5 became 1995 a part of the international media conglomerate SBS Broadcasting, but is since 2007 owned by ProSiebenSat. It is a typical low-cost channel based on popular American series, films, reality shows and sports. The staff is minimal, about 100 employees. Kanal 5 has succeeded in their efforts to attract a young public with great purchasing power. It has also been a very profitable tv-channel.

The commercial public service-channel TV4 has also been a great economic success, especially when the channel started in the beginning of the 1990s. There was great demand for tv-advertising in Sweden and TV4 could charge rather high prices. At the same time TV4 paid a high licence fee to the state for the advertising tv-monopoly in the terrestrial an analogue net. This was abolished when the analogue was switched off in 2008. The last few years TV4 has focused on finding new income sources beside the ordinary commercials. TV4 has for example established a lot of new pay-tv-

channels and a special corporation with the aim to increase the side revenues from programmes and internet services.

SVT is almost totally financed by licence fees. The parliament decides every year the size of the licence fee. SVT supports the licence-fee-system, as it guarantees the corporation a secure economy. About 90% of the Swedish TV-households pay 2009 their licence fee, a very high rate. Public Service TV and radio is financed in the same way in all Scandinavia besides Iceland, where the Public Service-company is financed by a special tax (and advertisments) since summer 2009. SVT also tries to get extra money, for example from sponsoring. Despite the fact that sponsoring gives SVT just one percent of their income, SVT strongly tries to defend their sponsoring rights towards competitors and critics meaning that SVT ought to be clean of advertisement. SVT means that the sponsoring income is necessary to guarantee that attractive and international sport events will be available for the whole Swedish tv-public.

Sponsoring is thus the only field where there exists real economic competition between public service and commercial tv-corporations. The latter corporations also compete with each other, especially in the tv-advertising market. The tv-sector has taken a large part of the total advertising market. The losers in this aspect are the daily press.

All leading tv-corporations in Sweden have got their share of the expanding tv-market. There has not been any hard confrontation between public service and commercial corporations; they have all had rather good economic conditions; the audience has been willing to pay more and more for the programming content and the advertisers have shifted a great deal of their investments from the paper market to the tv-market.

In 2009 the four big tv-corporations in Sweden turn over about 20 billion Swedish crowns (2 billion Euro), divided on pay-tv (about 50 percent, commercials (25 percent) and public service licence fees (25 percent). The population in Sweden is 9 million.

The Competition for Viewers

The competitions for the audience take place in different levels. The public service companies are anxious to reach as many people as possible, while the commercial tv-channels want to reach an as (commercial) attractive audience as possible.

When the monopoly was dissolved the managing director of SVT declared an audience goal for the new age: to keep 50 percent of the general public. SVT succeeded to reach this goal in some years, but have later abandoned this quantitative ambition. TV4 aimed from the beginning to become the biggest separate channel and has also been successful in this respect, though they have a hard fight against SVT's main channel. TV3 and Kanal 5 have increasingly emphasized the entertainment programmes and have particularly tried to catch the young viewers with spectacular reality shows.

One arena where all tv-channels compete hard with each other is sport. The price for sport rights has risen dramatically since the end of the eighties. Attractive sport events have also been used for launching new channels. TV 3 for example bought the exclusive rights for the World Championship in Ice Hockey 1989. At this moment a lot of Swedish realized that a new tv-era was coming. The commercial channels have primarily invested in soccer- and icehockey-rights. SVT and TV4 have, in cooperation with other EBU members, secured the great international events as the Olympic Games and the soccer World Championship. But the price for these events has also risen quickly as the commercialisation and internationalisation of sports.

The Distribution Competition

A new rapidly growing competition arena is the distribution sector. The competition has been intensified since the tv-digitalisation has started. Which channels will be available in the distribution nets is partly decided by the private owned distribution companies, partly by the government.

The SVT-channels have been guaranteed space (must carry-status) in the digital terrestrial net with almost 100 percent penetration. Even TV4 is available for all viewers with no extra charge. TV3 and Kanal 5 are offered as pay-tv-channels in the digital terrestrial net and by the cable-, satellite- and broadband distributors. The dominant cable distributor is Comhem (former state-owned Telia Cable-TV) with more than 80 percent of the cable-tv-market; the leading satellite-platforms are Canal Digital, partly owned by the Norwegian state, while the partly state-owned company Teracom is responsible for transmissions in the digital terrestrial system.

The distribution companies have got an important gatekeeper-role. It is very difficult to establish a new tv-channel in Sweden today if the channel is not offered in Comhems cable-tv-net or in Teracoms digital terrestrial net. The distribution companies have even become still more profitable.

Conclusion

The public service-and commercial corporations have developed side by side. They are financed in different ways and have seldom been in

conflict with each other. One reason for this is that the media business has expanded so quickly. The hardest fight between the public service and the commercial systems has dealt with programme rights, especially sport rights.

There has also been an obvious concentration to fewer and stronger programmes and distribution companies. The big companies have become even bigger; political rules and high introduction costs have limited the space for new channels and new actors. The four leading tv-corporations control 80 percent of the audience, almost 90 percent if their affiliated channels are included.

Both the public service and the big commercial corporations can be regarded as winners. Though SVT have lost their monopoly they still have a very strong position and a strong trust among both politicians and the general public. TV4 has been successful in balancing their public service and commercial roles in the political and economic arenas and has also enjoyed audience popularity. TV3 and Kanal 5 have reached their most important goals: to become profitable by focusing strategic audience groups. The vertical integration and the international expansion have also been fortunate for MTG/TV3.

The losers are the new channels and companies who have failed to get into the strongly centralised market. It is today almost impossible to establish a new national tv-channel in Sweden.

The development in Sweden does not differ so much from other Scandinavian and north European countries, where similar deregulations of the radio-and tv-market have been effected. The concentration tendencies in the radio-and tv-market are also similar in all countries in north-western Europe.

And finally, what about the audience? In one sense, the audience is of course a big winner since the monopoly was abolished. The assortment of programmes is today much wider. It is possible for every Swedish to receive more than 40 channels. In spite of that people does not consume more tv-programmes than before. In average, the Swedish are viewing tv about two hours a day, almost the same amount as twenty years ago, when they just had access to two public service-tv-channels. But they pay much more for their tv-consuming today. In 1989 the Swedes paid 3 billion crowns as licence fees, but in 2009 they are paying about 15 billion crowns for pay-tv and licence fees. In that way the audience must be seen as a loser.

REFERENCES

Engblom, L-Å, Wormbs N. (2007), Radio och TV efter monopolet. Etermedierna i Sverige / Ekerlids förlag, Stockholm.

Ewertsson, L. (2001), The Triumph of Technology Over Politics? Linköping: Department of Technology and Social Change, Linköpings universitet.

Furhammar, L. (2006), Sex, såpor och svenska krusbär–Television i konkurrens. Etermedierna i Sverige / Ekerlids förlag, Stockholm.

Hadenius, S. (1998), Kampen om monopolet. Sveriges radio och TV under 1900-talet. Etermedierna i Sverige /Prisma, Stockholm.

Media Development (2009). The Swedish Radio and TV Authority (www.rtvv.se)

Nordicom (2008), The Nordic Media Market. Media Companies and Business Activities. Göteborg University (www.Nordicom.gu.se)

Annual reports 1992-2008 from SVT, TV 4, Kanal 5, MTG

লেখক পরিচিতি
(বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো)

আ. আল মামুন

সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্পাদক, *যোগাযোগ* পত্রিকা। ইমেইল: almamun.ru@gmail.com

এনায়েতুর রহমান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। বর্তমানে একটি জাতীয় দৈনিকে কাজ করছেন। ই-মেইল: anayatcu@yahoo.co.uk

কাবেরী গায়েন

সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল : kgayenbd@yahoo.com

জামশেদুল করিম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী। একই বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংগঠন *কমিউনিয়া*র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। ইমেইল: jamshed1638@gmail.com

ফাহমিদুল হক

সহকারী অধাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্পাদক, *যোগাযোগ* পত্রিকা।
ই-মেইল : fahmidul.haq@gmail.com

বাধন অধিকারী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী। প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মী।
ই-মেইল : badhan_adhikari@yahoo.com

রোবায়েত ফেরদৌস

সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল : robaet.ferdous@gmail.com

সেলিম রেজা নিউটন

সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। *মানুষ* পত্রিকা ও *অ্যাড্‌কম্‌সো জার্নাল*-এর সম্পাদক এবং *মানুষ নেটওয়ার্ক*-এর সংগঠক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের সহজ পুস্‌ড়ক (বাংলা একাডেমী, ২০০৯) এবং বিদ্রোহের সপ্তস্বর (যেহেতু বর্ষা, ২০১০)। ই-মেইল : salimrezanewton@gmail.com

সুদীপ্ত শর্মা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। একই বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংগঠন *কমিউনিয়া*-র সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। স্টাফ করেসপন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন একটি জাতীয় দৈনিকে। পাশাপাশি জড়িত আছেন মিডিয়া ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকা *বাহাস* সম্পাদনার সাথে। ই-মেইল: shudiptasharma@gmail.com

Lars-Åke Engblom

Professor in Media and Communication, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden. He is the leader of a Swedish national research project analyzing the competition between public service and commercial radio and TV media since the state monopoly on broadcasting was abolished in Sweden. He studies the media development in all Scandinavian countries and has written several books and articles about media in Scandinavia. E-mail: lars-ake.engblom@hlk.hj.se

Mohammad Sahid Ullah

Associate Professor, Department of Communication and Journalism, Chittagong University. E-mail: focus_bangladesh@yahoo.com